সমর বোস

—প্রণীত—

নিখিল বংগীয় শরীর-চর্চা সমিতির অবৈতনিক সম্পাদক
ও সিংহল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক

ডক্টর হেমচন্দ্র রায়

এম্-এ (ক্যাল্), পি-আর্-এস্, পি এইচ্-ডি, ডি-লিট্ (লণ্ডন)
এফ-এ-এস্-বি, লিখিত মুখবন্ধ সম্বলিত

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট · কলিকাতা — ৬

যে পুরুষ-সিংহ দৈহিক বলে আদর্শ স্থানীয় হয়েও সর্বদা ছিলেন নিরহংকার ও প্রচার-বিমুখ, যিনি ছিলেন আমার ব্যায়াম-জীবনের দীক্ষা-গুরু এবং যাঁর অনতিক্রমনীয় ব্যক্তিত্ব ও প্রেরণা আমার মধ্যে এনেছে ব্যায়ামের প্রতি অভাবনীয় উন্মাদনা, যাঁর দৃষ্টিতে মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ ছিল না এবং যাঁর অনাবিল ভালোবাসায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ ছিল মুগ্ধ,— সেই মানব-দরদী, উদার-হৃদয় এবং সর্বত্যাগী, কাল-কবলিত আমার সন্ন্যাসী পিতার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে

—এই পুস্তক উৎসর্গ করলাম—

আটখানা হাফ্‌টোন ফটো সমন্বিত

প্রচ্ছদপট পরিচয়

মাটিতে লড়তে অভ্যস্থ হলেও ভারতীয়দের বিদেশে লড়তে হোত বিদেশী প্রথায় নরম গদীর ওপর। বিদেশ অভিযানকালে ১৯১১ অব্দে আহমদ বখ্‌শ্‌ লণ্ডনে তাঁর এক সংগীর সংগে বিলাতী কুস্তির মহড়া দিচ্ছেন।

মুখবন্ধ

নিখিল বঙ্গীয় শরীর-চর্চ্চা সমিতির (All Bengal Physical Culture Association) প্রতিষ্ঠাকালে যে কয়েকজন উদ্যোগী এবং উৎসাহী যুবকের সংস্পর্শে আমি এসেছিলাম, শ্রীযুক্ত সমর বোস তাঁদের মধ্যে একজন। বর্ত্তমানে তিনি এই শরীর-চর্চ্চা সমিতির একজন বিশেষ সদস্য।

শ্রীযুক্ত বোস বাংলাদেশের এক উল্লেখযোগ্য শরীর-চর্চ্চাবিদ্ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং বহুদিন যাবৎ শরীর-চর্চ্চার বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে আমি তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ লক্ষ্য করে আসছি। দেশে ও বিদেশে মল্লবিদ্যা সম্বন্ধে যে সমস্ত চমকপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক ঘটনার বিবরণী পাওয়া যায়, শ্রীযুক্ত বোস সেগুলি বহু পরিশ্রম সহকারে ও সযত্নে সংগ্রহ করে তার কিছু অংশ পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়েছেন। এই উদ্যম যে প্রশংসনীয়, তাতে সন্দেহ নেই। ডি-এম্ লাইব্রেরীর সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত গোপালদাস মজুমদার মহাশয় এই পুস্তকটি প্রকাশনে যে সহযোগিতা ও সাহায্য করেছেন, সেজন্য তিনি ব্যায়ামবিদ্ ও শরীর-চর্চ্চা বিষয়ে অনুরাগী ব্যক্তিগণের ধন্যবাদার্হ।

আমি আশা করি যে, শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই পুস্তকটি বাংলাদেশের বিভিন্ন স্কুল কলেজের পাঠাগারের জন্য

অনুমোদন করবেন এবং আমার বোধ হয়, এই পুস্তকের একটি হিন্দী সংস্করণ হলে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও এই পুস্তকটি বিশেষ সমাদর লাভ করবে।

লেখক শ্রীযুক্ত সমর বোস এবং প্রকাশক শ্রীযুক্ত গোপালদাস মজুমদার মহাশয়ের নিকট আমার অনুরোধ, তাঁরা যেন শরীর-চর্চ্চার বিভিন্ন দিক আলোচনা করে সরল বাংলা ভাষায় এরূপ আরো পুস্তক প্রকাশ করে শরীর-চর্চ্চা সম্পর্কে জনসাধারণের মনে উৎসাহ ও অনুরাগ বর্দ্ধন করেন। ইতি—

হেমচন্দ্র রায়
নিখিল বঙ্গীয় শরীর-চর্চ্চা সমিতির
অবৈতনিক সম্পাদক
এবং
সিংহল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের
ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক

সমর বোস

কৈফিয়ৎ

দুর্ভাগা-দরদী রবীন্দ্রনাথ সোবিয়েৎ রাশিয়ায় যাবার আগে যা ভাবতেন, 'রাশিয়ার চিঠি'র সুরুতেই সে সম্পর্কে লিখেছিলেন, "সভ্যতার সমস্ত শ্রেষ্ঠ ফসল অবকাশের ক্ষেত্রে ফলেছে। মানুষের সভ্যতায় এক অংশে অবকাশ রক্ষা করার দরকার আছে। * * * অথচ অধিকাংশ মানুষকে তলিয়ে রেখে, অমানুষ করে রেখে তবেই সভ্যতা সমুচ্চ থাকবে একথা অনিবার্য বলে মেনে নিতে গেলে মনে ধিক্‌কার আসে।" রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে অনেক কথাই ভেবেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজেই আবার এ সম্পর্কে বলেছিলেন, "যাই হোক, আমি ভালো করে কিছুই ভেবে পাই নি।" শেষে রাশিয়া দেখার পরে তাঁর ধারণা হয়েছিল, সমাজে সেই রকম সামঞ্জস্য বিধান সত্য সত্যই সম্ভব। তাই অভিভূত হয়ে রাশিয়াকে তিনি 'তীর্থস্থান' বলে অভিনন্দিত করেছিলেন।

কিন্তু আমাদের দেশ রাশিয়া নয়, ভারতবর্ষ, এবং রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "রোগতপ্ত অভুক্ত হতভাগ্য নিরুপায় ভারতবর্ষ।" এক সময়ে ভারতবর্ষের চেয়েও রাশিয়ার সামাজিক দুর্দশা ছিল অনেক বেশী; তবু, সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে মাত্র ৩৯ বছরে সেখানে যে বিস্ময়কর আমূল পরিবর্তন এসেছে, আমাদের কাছে স্বভাবতই তা অবিশ্বাস্য মনে হয়। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ওপর অন্য রাষ্ট্রের অগ্রগতি নির্ভর করে না। সুতরাং রাশিয়া এগিয়েছে, নয়া চীন এগুচ্ছে এবং পূর্ব ইওরোপের আরো কয়েকটি রাষ্ট্র এগুচ্ছে। আর, আমরা চলেছি উল্টো পথে অন্ধকার ভাগাড়ের দিকে! কারণ, এখনো পর্যন্ত আমাদের দেশে ধনতান্ত্রিক অক্টোপাস সহস্র নলে মানুষের রক্ত শুষে খাচ্ছে।

ধনতান্ত্রিক শোষণের অবশ্যম্ভাবী পরিণামে এ-দেশের মুষ্টিমেয় লোক যখন ধনৈশ্বর্যের ভোগ-বিলাসে মত্ত, তখন দেশের বাকি সবাই কঠিন জীবন সংগ্রামে হয়ে পড়েছে বিপর্যস্ত, জরাজীর্ণ এবং পংগু। জীবিকার তাগিদে তাদের করতে হয় নিশিদিন কঠিন পরিশ্রম; তাই তাদের জীবনে থাকে না সুখ, থাকে না অবকাশ। আমি নিজেও অবকাশহীন সেই কোটি কোটি দুর্ভাগা মানুষেরই একজন। কেননা, জীবনের অনিবার্য প্রয়োজনে আমাকে আপাতত কাজ করতে হয় একটা দোকানে অন্তত ১১ ঘণ্টা, সেখানে যাওয়া-আসার পথে যায় ৩ ঘণ্টা এবং স্নানাহার ও সারা দিনের অত্যাবশ্যকীয় অন্যান্য প্রয়োজনে যায় ৩ ঘণ্টা,—মোট ১৭ ঘণ্টার পরে বাকি থাকে ৭ ঘণ্টা। কিন্তু সারাদিনের পরিশ্রান্ত দেহে রাত্রি ১১ টার পরে কতক্ষণই বা লেখা-পড়ার জন্য ব্যয় করা যায়? বিশেষত যে ধরনের লেখার জন্য দেশ-বিদেশের শত-সহস্র বই-পত্রিকা ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয়, তার কতটাই বা তখন সম্ভব হতে পারে? অতএব হাজার চেষ্টায়ও আমার দ্বারা শ্রেষ্ঠ ফসল দূরে থাক, হয়তো ভালো ফসলও ফলবে না। তবু, এই প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও, এ ধরনের কাজে আমার হাত দেবার একমাত্র কারণ, এই বিষয়ে আমার আশৈশব নেশা বা বাতিকগ্রস্ততা। আমাকে এই নেশায় প্রথম অনুপ্রাণিত করেছিলেন আমারই বাবা; দাদারও অবশ্য এতে খুবই উৎসাহ ছিল।

অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়ে যখন আত্মীয়-পরিজন সকলেই আমাকে ডন-কুস্তির জন্য ঘৃণার চোখে দেখতে লাগলেন, তখনো বাবা আমাকে এ-বিষয়ে নিরন্তর প্রশ্রয় ও উৎসাহ দিতেন। এর ফলে আমার এই নেশা শুধু আমার নিজের শরীরটাকে নিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি; দেশ-বিদেশের বলী ও পালোয়ানদের সম্পর্কেও আমার অসামান্য অনুসন্ধিৎসা জন্মেছিল। দাদার অনুকরণে আমারও প্রবন্ধাদি লেখার ঝোঁক এসেছিল বাল্যকাল

থেকেই। কিন্তু কী আশ্চর্য! আত্মীয়-পরিজনেরা আমার সেই প্রবন্ধ লেখার অভ্যাসকেও নিন্দা করতেন সর্বক্ষণ। কারণ, তাঁরা স্থায়ীভাবেই বুঝেছিলেন, ডন-কুস্তিওয়ালারা লিখতে গিয়ে কলমই শুধু ভাংতে পারে, লিখতে পারেনা কখনো। বিদ্যালয় জীবনেও নানা কারণে আমি ধিকৃকৃত হয়েছিলাম প্রায় সকলের কাছে; কিন্তু লেখার ব্যাপারে উৎসাহ পেয়ে ছিলাম মাত্র দুজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের কাছে। তাঁরা ছিলেন শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রকিশোর পাল। তাঁরা দুজনই সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। শিক্ষক বলতে আমরা সচরাচর যাঁদের দেখি, এঁরা সেই দলেরও ছিলেন না। এঁরা ছিলেন ছাত্র-দরদী এবং ছাত্র-বন্ধু, অতএব প্রকৃত শিক্ষক। তাই আমি আজ তাঁদেরকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

এবার এই বইয়ের ক্ষুদ্র ইতিহাসটুকু সংক্ষেপে বলা দরকার এবং এই প্রসংগে আমার দু একটি ব্যক্তিগত কথাও বলতে হবে।

১৯৩২ অব্দে 'কুস্তির ইতিহাস' নামে আমার একটি বড়ো রকমের বই লিখবার ইচ্ছা হয়, এবং সেই বিরাট পুস্তকের দশটি অধ্যায়ের একটি অধ্যায়ে ভারতীয় পালোয়ানদের দিগ্বিজয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস থাক দরকার মনে করে 'মল্লযুদ্ধে ভারতবর্ষ' নামে একটি প্রবন্ধের মাত্র কয়েক পৃষ্ঠা লিখি। একদিন আমার এক বন্ধু, শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র দত্ত, পড়বার জন্য সেই ক্ষুদ্র অংশটুকু নিয়ে যান। মাসখানেক বাদে হঠাৎ একদিন তিনি এসে আমাকে একখানা মাসিক পত্রিকা এবং এক টুকরা প্রুফ দিয়ে বললেন, "শীগ্‌গির বাকিটুকু লিখে দিন; প্রেসের কাজ বন্ধ আছে!' আমি সবিস্ময়ে দেখলাম, কাগজখানা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী সম্পাদিত 'সংহতি' (১৩৩৯ বংগাব্দের কার্তিক সংখ্যা) এবং প্রুফটি আমার সেই লেখারই বাকি একটু অংশ পরবর্তী অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিতব্য।

বুঝলাম, ঐটুকু লেখায় চলতে পারে না এবং অগ্রহায়ণের জন্যই আরো একটু লেখা দেওয়া দরকার। কিন্তু এধরনের লেখা কি তখুনি হয়? তবু বন্ধুটি নাছোড়বান্দা, বসে থেকে আমাকে দিয়ে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে কিছু লিখিয়ে নিলেন। আমার বিনানুমতিতে এবং সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে পত্রিকায় লেখা ছেপে দিয়ে বন্ধুটি হঠাৎ আমাকে এই অপ্রত্যাশিত বিপদে ফেলার জন্য আমি তখন তাঁর ওপর মনে মনে খুবই বিরক্ত হয়েছিলাম। কারণ প্রবন্ধটিকে ঝটপট শেষ করবার উপায় ছিল না।

যা হোক। ভাবলাম, পরে মাসে মাসে আরো একটু বিস্তৃতভাবে প্রবন্ধটিকে লিখতে থাকবো। কিন্তু অকস্মাৎ আমার জীবিকা-জীবনে ঘটে গেল এক মহা বিপর্যয়! সেই সময়ে দশ বছর পূর্ব থেকে আমি কলেজ ষ্ট্রীটের একটি ফটোগ্রাফিক প্রতিষ্ঠানের সংগে সংশ্লিষ্ট ছিলাম। শেষ সাত বছর মৌখিক প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমি অর্ধাংশের অংশীদার হিসাবে সেই প্রতিষ্ঠানটিকে চালনা করেছিলাম। কিন্তু সেই তরুণ বয়সে আমার একবারও মনে হয়নি যে, সত্ত্ব প্রমাণোপযোগী কাগজ-পত্র না থাকলে স্বার্থপর ব্যক্তিরা ইচ্ছা করলেই কাকেও উৎখাত করতে পারে। 'মৌখিক প্রতিশ্রুতি' যে স্বার্থপর ব্যক্তি যে-কোনো মুহূর্তেই ভাংতে পারে, এ-ধারণাই তখন আমার ছিল না। তাই প্রথম অবস্থায় 'টিউশনি' করে এবং অন্যান্য উপায়ে আমি আমার অন্ন সংস্থান করতাম, আর 'ক্যানভাস' করে স্টুডিওর কাজ বাড়াতাম। স্টুডিওর আয়ের টাকা সম্পূর্ণটাই আমার বয়োজ্যেষ্ঠ 'পরমাত্মীয়' অংশীদারের ব্যক্তিগত নামে ব্যাংকে জমা হোত। ভাবতাম, পরে ঐ টাকায় স্টুডিওকে আরো বড় করা যাবে।

এরপরে সুরু হোল বিশ্ব-যুদ্ধ; স্টুডিওর কাজ বাড়তে লাগল, আয়ও বাড়তে লাগল। আমার সময় গেল কমে, 'টিউশনি' ছেড়ে দিলাম।

'পাইস হোটেলে' খাওয়ার জন্য দু বেলাই তখন অংশীদারের কাছ থেকে পয়সা চেয়ে নিতে হয়। ক্রমে শুনতে লাগলাম, স্টুডিওর আয়ের তুলনায় ব্যয় অত্যন্ত বেশী, পয়সা-কড়ি নেই—ইত্যাদি ইত্যাদি। ক্রমশ হোটেলে খাওয়ার চার্জ বাড়তে লাগল, অথচ আমার দু বেলার খাওয়ার বরাদ্দ সেই 'এক সিকি'ই স্থায়ী হয়ে রইল! তদুপরি আমার বন্ধু-বান্ধবদের সামনে সুরু হোল তাঁর মনিবজনোচিত ব্যবহার; আরো পরে তাঁর কাছে আমি বিবেচিত হয়ে দাঁড়ালাম অনাহুত এবং অবাঞ্ছিত ভিক্ষুক! বাড়ী থেকে মা লিখলেন, "বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুজনের (অংশীদার) সংগে মনোমালিন্য কোরো না, তাঁকে মান্য করে চলো।" কিন্তু আমার তখন খাওয়া নিয়মিত হয় না, হলেও অর্ধাহারে দিন কাটে। সহ্য করা ক্রমশ অসম্ভব হয়ে পড়ল। শেষে ১৯৪২, ২৪ এ ডিসেম্বর চূড়ান্ত ঘটনা ঘটে! সেদিন দুপুরে যখন 'সংহৃতি'র জন্য সেই প্রবন্ধটি লিখছিলাম, তখন তাঁর ইতর জনোচিত ব্যবহারের হঠাৎ মৌখিক প্রতিবাদ করে বসি।

গায়ে ছিল তাঁর প্রচণ্ড শক্তি,—অন্তত আমার দেড়গুণ। আমি বুঝতে পারতাম, সেই জোরের ভরসায় তিনি অনেক অন্যায় ব্যবহার করতে সাহসী হতেন। আমার প্রতিবাদে ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি প্রথমত আমার কাগজ পত্র ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং শেষে আমাকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু আমি আমার প্রাপ্য আদায় না করে এক পা-ও নড়তে চাইলাম না, এবং বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও তাঁকে আমি 'শঠ, প্রবঞ্চক' এবং 'জানোয়ার' বলে গাল দিলাম। তিনি গেলেন আরো ক্ষেপে; একটি কাঠের ডাণ্ডা নিয়ে তিনি আমাকে আক্রমণ করলেন। তারপরে কি হোল, না বলাই ভালো। প্রথম কয়েক সেকেণ্ড আমি আত্মরক্ষা করেছিলাম মনে আছে এবং আমার নিজেরও অজ্ঞাতসারে শূন্য হাতেও এক সময়ে হঠাৎ আমি আক্রমণাত্মক হয়ে যাই। তার পরে কয়েক

মুহূর্তের ব্যাপার মাত্র! নিকটবর্তী ছয়টি বন্ধু যখন তাঁকে আমার কবলমুক্ত করলেন, তখন তাঁর সর্বদেহ রক্তাপ্লুত অবস্থায় দেখেছিলাম। আমার রাগ এবং ক্ষোভও সেদিন সেইখানেই ক্ষান্ত হয়েছিল।

পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে এই অপ্রত্যাশিত বিপর্যয় সংঘটিত হয়ে গেল! এরপরে একেবারে কপর্দকহীন অবস্থায় আমাকে এসে দাঁড়াতে হোল সোজা রাস্তার ওপরে। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে, এই প্রবঞ্চনালব্ধ সুখৈশ্বর্য তিনিও বেশীদিন ভোগ করতে পারেননি। স্টুডিও পরিচালনার যোগ্যতা না থাকায় কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর সব কিছু নষ্ট হতে থাকে এবং ক্রমশ তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। শেষে ১৮ মাসের স্টুডিও ভাড়া বাকি পড়ায় বাড়ীওয়ালা তাঁকে একদিন অকস্মাৎ কয়েক মিনিটের মধ্যেই উৎখাত করে দেন।

১৯৪২, ২৪এ ডিসেম্বর। কলিকাতার অবস্থা সাংঘাতিক, আমার অবস্থা আরো সাংঘাতিক। ২০ এ ডিসেম্বর থেকে কলিকাতার ওপর জাপানী বোমার আক্রমণ সুরু হয়েছিল। অগণিত লোকজন তখন কলিকাতা ছেড়ে পালাচ্ছে। দোকান-পশার ও হোটেল-রেস্টোরাণ্ট কতকগুলি ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়েছে, কতকগুলি অনিয়মিতভাবে খোলা হচ্ছিল। আমার বহুদিনের বহু কষ্টে সংগৃহীত বিশাল কাগজ-পত্রের স্তূপগুলিকে কলেজ রো'র একটা পুরোনো বাড়ীর একটা জীর্ণ ঘরে কোনো রকমে ফেলে রাখলাম, আর নিজে সেই রাত্রির বেশী সময় কাটিয়ে দিলাম কৈলাস বোস ষ্ট্রীটে বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা পুলিনবিহারী দাসের সংগে গল্পে গল্পে। সেই রাত্রিতে প্রথম ডালহৌসী স্কোয়ারে বোমা পড়েছিল এবং সেই রাত্রেই ৯টা থেকে ১২টা পর্যন্ত দীর্ঘতম সময় কলিকাতায় বোমা বর্ষিত হয়েছিল। রাত্রি ২টার পরে হেঁটে গিয়ে ভোর

বেলায় আমি ট্যালিগঞ্জের দিকে আমার এক আত্মীয়, শ্রীযুক্ত নিখিলচন্দ্র দাসের সংগে দেখা করি।

এরপরেও উপযুক্ত বাসস্থানের অভাবে আমাকে বহুদিন যেখানে-সেখানে, এমন কি, কলেজ স্কোয়ারের বেঞ্চিতে শুয়ে রাত কাটাতে হয়েছিল কিন্তু এই দুর্দৈবের মধ্যেও গুরুতর দায়িত্ববোধ আমাকে 'সংহতি'র জন্য লেখাটাকে শেষ করতে বাধ্য করেছিল। তবে পূর্ব পরিকল্পনা ছেড়ে আমাকে সংক্ষিপ্ত পথ ধরতে হয়েছিল একথা ঠিক এবং তার ফলে লেখাটা এগারো মাসের মধ্যেই ছাপা শেষ হয়ে গিয়েছিল। প্রধানত এইসব কারণে সেই লেখাটার মধ্যে কিছু কিছু ভুলও ঢুকে গিয়েছিল।

প্রায় সেই সময়ে আমার আর এক বন্ধু, 'পূর্বাশা' ও 'নিরুক্ত' কাগজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সঞ্জয় ভট্টাচার্য আমার 'কুস্তির ইতিহাস'এর বিবরণ শুনে বলেছিলেন যে, এই বিষয়ে পর্যালোচনামূলক এত বড় বিরাট বই এদেশের কোনো প্রকাশক ছাপতে চাইবে না, পাঠকরাও বিশেষ আগ্রহ নেবে না। আমার বরংচ উচিত, বইটাকে আরো সংক্ষিপ্ত করা এবং তাকে কয়েক ভাগে বিভিন্ন নামে ছাপার চেষ্টা করা। কিন্তু ছাপার চেষ্টা করবো কি? তখন থেকে তো জীবন-সংগ্রামের নিরন্তর ঘাত-প্রতিঘাত আমার জীবনকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেই চলেছে! অগত্যা 'সংহতি'র সেই পুরোনো লেখাটিকেই আবশ্যকমতো বাড়িয়ে-কমিয়ে এবং সংশোধন করে বর্তমান বই ছাপতে হোল। আজ সেই বন্ধু প্রতুল বাবুকে, যিনি এক সময়ে কৌশল করে আমার কাছ থেকে লেখা আদায় করেছিলেন, তাঁকে ধন্যবাদ জানাই; আর সেই সংগে 'সংহতি'-সম্পাদক সুরেনবাবুকেও ধন্যবাদ জানাই যদিও তাঁর সংগে আমার আজো পর্যন্ত তেমন পরিচয় ঘটেনি।

এখন অবশ্য মধ্যে মধ্যে আপশোষ হয় এই মনে করে যে, আরো কিছুকাল আগে বই প্রকাশ করা উচিত ছিল। কেননা, ১৯৩৬ অব্দে ইণ্ডিয়ান্ বুক সোসাইটি এবং ১৯৩৭ অব্দে আশুতোষ লাইব্রেরি আমার বই ছাপতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি তখন রাজী হইনি। আশুতোষ লাইব্রেরির সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত আশুতোষ ধর বিস্মিতভাবে এর কারণ জানতে চাইলে আমি বলেছিলাম, "আমার সংগৃহীত তথ্যাদি ভালোভাবে যাচাই না করে কোনো বই লিখবার ইচ্ছা নেই। তাছাড়া, আরো তথ্যাদি সংগ্রহ করে আরো বিরাট রকমের বই লিখতে চাই।" আমার কথা শুনে তিনি সেদিন হেসে ফেলেছিলেন; বলেছিলেন যে, আমার বয়স কম, তাই আকাংখা বড়ো, উদ্দেশ্য ভালো এবং উদ্যমও বেশী। তবে এই গোড়ামী আমাকে ফকীর করে ছাড়বে, আমার ভাত জুটবে না। কারণ, এদেশ আমার উদ্দেশ্যের মূল্য তো দেবেই না, বরং লোকে আমাকে নির্বোধ মনে করে উপহাস করবে। আশুবাবু বহুদর্শী এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি; তাঁর প্রত্যেকটা কথাই সত্য ছিল। তাই তাঁকেও আজ আমি আমার শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম জানাই।

কিন্তু আরো পূর্বে বই না ছাপার জন্য আপশোষ হবার কারণ ভিন্ন। অত্যন্ত তরুণ বয়স থেকেই আমার দেশ-বিদেশের বিবিধ সংবাদ জানবার আগ্রহ ছিল প্রবল এবং তখন থেকেই আমি নানা দেশের পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ করতে সুরু করেছিলাম। ১৯৪১-৪২ অব্দ পর্যন্ত তার পরিমাণ খুব সামান্যও ছিল না; তা দিয়ে নিঃসন্দেহে একটি মোটামুটি রকমের হোম-লাইব্রেরি তৈরী হতে পারত। কিন্তু সেই সংগ্রহের কিছুটা পড়ে রইল পূর্ব বংগে গ্রামের বাড়ীতে, নানা কারণে তা আনবার আর কোনো সুযোগই ঘটল না। বাকি সংগ্রহেরও বারো আনা পরিমাণ নষ্ট হয়েছে কলিকাতায়—জীবন-সংগ্রামে পদে পদে বিপর্যস্ত

হয়েছিলাম বলেই। একমাত্র জীর্ণ বাড়ীর জীর্ণ কোঠার 'ড্যাম্প' এবং উই আর ইঁদুরের কৃপায় অন্তত ২০ মণের ওপর বই-পত্রিকা নষ্ট হয়েছে, বন্ধু-বান্ধবরাও অবশ্য আমার ভার লাঘব করতে কম সাহায্য করেন নি! এইভাবে সত্য সত্যই আমি আজ সর্বরকমে 'ফকীর' হয়ে পড়েছি। এ-কথা আমার আত্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে না। আমি বলতে চাই যে, আমার এই দুরবস্থাও সম্ভব হয়েছিল আমার আর্থিক দৈন্যের কারণেই। পছন্দমতো বই-পত্রিকা সংগ্রহ এবং তাকে উপযুক্তভাবে রক্ষা করা আর্থিক সচ্ছলতা-সাপেক্ষ বই কি? যার খাওয়া-পরা ও থাকার স্থিরতা নেই, এ-দেশের বুকে বসে তার এই বাতিক দুঃসাহসিক নিশ্চয়ই। আমি তো তবু দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু কতো মানুষ যে এইভাবে একেবারে তলিয়ে গেছে, কে তার সন্ধান নেবে? আমার সমস্ত সংগ্রহ রক্ষা করবার ক্ষমতা থাকলে, আমার খুবই বিশ্বাস, আমি আমার দেশকে কিছু উপহার দিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু এখন আর সে সম্ভাবনা নেই। এখন আমাকে লিখতে হচ্ছে অবশিষ্ট যৎসামান্য সংগ্রহের ওপর নির্ভর করে, সময়ে স্মৃতি-শক্তিরও সহায়তা নিতে হয়। অতএব সতর্কতা নেওয়া সত্ত্বেও যদি তথ্যগত কোনো ভুল বইতে পাওয়া যায়, পাঠকরা দয়া করে তা জানালে আমি অনুগৃহীত ও বাধিত হবো।

অবশ্য আমার গোড়ামীর কারণে কিংবা বুদ্ধির দোষে যথাসময়ে বই প্রকাশ না করলেও আমার একমাত্র সান্ত্বনা যে, অল্প বয়সে নাম কামানোর জন্য আমি নিজেকে ফাঁকি দিইনি এবং অনেকটা দেরী হলেও ভারতবর্ষে আমিই প্রথম দেশের চির উপেক্ষিত একটা গৌরবময় অধ্যায়ের সামান্য পরিচয় পুস্তকাকারে দেশবাসীর সামনে উপস্থিত করলাম। এ সম্পর্কে পাঠকদের আগ্রহ বাড়লে অনুবর্তী উৎসাহীরা ২০।২৫ বছর থেকে ৫০।৫৫ বছর পূর্বেকার বিলাতী, অ্যামেরিকান এবং

অষ্ট্রেলিয়ান পত্র-পত্রিকাগুলি ঘাঁটাঘাঁটি করলে ভারতীয় পালোয়ানদের দিগ্বিজয়ের বহু চমকপ্রদ বিচিত্র উপকরণ সংগ্রহ করতে পারবেন এবং তার সাহায্যে অন্তত ৫ খণ্ডে ৫০০০ পৃষ্ঠার এক বিরাট, অবিস্মরণীয় এবং গৌরবময় ইতিহাস সৃষ্টি হবে।

বর্তমান বইখানা শেষ হয়েছিল ১৯৫৪, সেপ্টেম্বর মাসে। তারপরেই এটিকে পাঠাই শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামীর কাছে যদি 'যুগান্তর সাময়িকী'তে ধারাবাহিকভাবে ছাপা সম্ভব হয়, এই আশায়। কিন্তু দৈনিক পত্রিকায় এত বড় লেখা প্রকাশ করবার উপায় ছিল না। তারপরে দু একজন প্রকাশকের কাছেও গিয়েছিলাম। কিন্তু তাঁরা পাণ্ডুলিপি চোখে দেখতেও ইচ্ছুক ছিলেন না; এমন কি, তাঁরা আমার সংগে কথা বলাটাকেও বাহুল্য মনে করেছিলেন।

পরের বছর সিংহল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক অগ্রজপ্রতীম ডক্টর হেমচন্দ্র রায় গরমের ছুটিতে কলিকাতায় এলে তাঁকে আমি পাণ্ডুলিপিখানা দেখাই। এতদ্প্রসংগে বলা প্রয়োজন যে, ডক্টর রায় শুধুই ইতিহাসের পণ্ডিত নন, তিনি একজন সুযোগ্য শরীর-সাধক। একথা সত্য যে, দশ বছর থেকে আজ প্রায় ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর প্রাত্যহিক নিয়মিত ব্যায়ামে বিশেষ কোনো ছেদ পড়েনি। তাঁকে দেখতেও ৪০ বছরের বেশী মনে হয়না। বাংলা দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যায়াম প্রতিষ্ঠান 'অল বেংগল ফিজিক্যাল কালচার অ্যাসোসিয়েশন'এর তিনি অন্যতম প্রধান গঠনকর্তা এবং এর অবৈতনিক সম্পাদক। বিভিন্ন সময়ে তিনি আরো অনেকগুলি ব্যায়াম ও ক্রীড়া সংস্থার সংগে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। বিলাত ও কন্টিনেন্টে পরিভ্রমণ সময়েও তত্রত্য দেশের বহু বিশিষ্ট ব্যায়ামবিদের সংগে তাঁর শরীর-চর্চা সম্পর্কে বিস্তর আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। ১৯৩৯ অব্দে সুইডেনের অবিস্মরনীয়

ব্যায়াম-গুরু এবং 'সুইডিশ্ ড্রিলের' প্রবর্তক ফাদার লিংয়ের (১৭৭৫-১৮৩৯) মৃত্যুর শত-বার্ষিকী উপলক্ষে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হিসাবে ডক্টর রায় স্টকহোমে উপস্থিত হয়েছিলেন। সৌভাগ্য ক্রমে, দীর্ঘকাল যাবৎ আমার নানা রচনার সংগে তাঁর কিছু কিছু পরিচয় ছিল। তাই, তিনি আমাকে নিয়ে প্রায় তৎক্ষণাৎ বর্তমান প্রকাশক শ্রীযুক্ত গোপালদাস মজুমদারের সংগে পরিচয় করিয়ে দেন এবং নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই বইর 'মুখবন্ধ'ও লিখে দিয়েছেন। অতএব ডক্টর রায়কে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

কোনো কোনো বন্ধু বলেছেন, এই ধরনের তথ্যবহুল বইর 'ফুট নোটে' তথ্যগুলির সমর্থন জ্ঞাপক কথা রাখলে ভালো হোত। আমি নিজেও তা স্বীকার করি; 'সংহতি'তে প্রকাশিত রচনা সেইভাবেই সুরু হয়েছিল। নানা কারণে শেষের দিকে অবশ্য তা ছিল না। এই বইতে তা অবশ্যই করা চলতে পারত। কিন্তু 'ফুট নোট'গুলি মোটামুটিভাবে দিতে গেলেও বইর বিস্তার অন্তত দু তিন ফর্মা বেড়ে যেত এবং তাতে বইর দাম আরো বেশী হয়ে যেত। প্রয়োজন হলে পরবর্তী সংস্করণে তা নিশ্চয়ই করা হবে।

একজন অত্যন্ত শ্রদ্ধাস্পদ প্রবীণ বিপ্লবী বলেছেন যে, আমি বইর কয়েকটি জায়গায় 'রাজনীতি' সম্পর্কে কিছু বেশী কথা বলে ফেলেছি। এর ফলে কেউ কেউ বইখানাকে উদ্দেশ্যমূলক প্রচারকার্য মনে করে নিতে পারে। সে সম্ভাবনা আছে, আমিও বুঝি। কিন্তু আমি মনে করি, পূর্বকালের 'রাজনীতি' আর ইদানিং কালের 'রাজনীতি' এক নয়। যুগের তালে তালে সব কিছুই বদ্‌লে যাচ্ছে; রাজনীতির প্রয়োগ এবং প্রয়োজনও পরিবর্তিত হয়েছে। পূর্বে রাজনীতি ছিল শুধু শাসকবর্গের শাসন ব্যবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ—আর এখনকার রাজনীতি প্রত্যেক মানুষের

জীবন-সংগ্রামের প্রতি স্তরে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে, ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় আমরা সকলেই সর্বক্ষণ এই রাজনৈতিক জটিল আবর্তে পড়ে অসহায়ের মতো দিক-বিদিকে ভেসে চলেছি! নিজ নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতানুসারে সেকথা বলাটাই কি শুধু অপরাধের? তা যদি হয়, তবে আমি সে অপরাধ করার জন্য সর্বদাই উন্মুখ থাকব। কারণ নিজেকে ফাঁকি দেওয়া আমি চিরকালই ঘৃণা করি।

এবার বইয়ের ত্রুটী-বিচ্যুতি সম্পর্কে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজন।

আমি স্বভাবত ত্রুটী-বিচ্যুতি সম্পর্কে সচেতন। কিন্তু এই বইতে তার কোনো পরিচয়ই নেই। কারণ, এই বইর পাণ্ডুলিপি যখন গত বছর প্রকাশকের হাতে দেওয়া হয়, তখন এটি ছিল সাবেকী বানানে লেখা। পরে এর ভাষাকে আধুনিক বানানে রূপান্তরিত করবার ইচ্ছা হয়। এই উদ্দেশ্যে প্রকাশকের কাছে পাণ্ডুলিপিখানা বার কয়েক ফেরৎ চেয়েছিলাম। কিন্তু নানা কারণে তিনি তা দিতে পারেননি। এর পরেই গত এপ্রিল মাসের শেষ ভাগ থেকে আমার কাছে বইর প্রুফ আসতে থাকে। কিন্তু শুধু মধ্য রাত্রিতে বসে আমাকে তখন বইর আবশ্যকীয় পরিবর্তন করতে ও প্রুফ দেখতে হচ্ছিল। কেননা ভোর পাঁচটা থেকেই আবার আমাকে দোকানের জন্য প্রস্তুত হতে হোত। যে কোনো ব্যক্তি বুঝতে পারবেন, এই অবিশ্রাম পরিশ্রম কতো দুরূহ! এইভাবে দু সপ্তাহ কাটবার পরে আমি দোকান থেকে দু সপ্তাহের ছুটি নিই। ভেবেছিলাম, দু সপ্তাহ বইটির জন্য খাটলে সবই ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু অন্যান্য কাজের চাপে প্রেস আমাকে কখনোই উপযুক্ত পরিমাণ প্রুফ সরবরাহ করতে পারেনি। প্রেস কর্তৃপক্ষ সন্ধ্যার পরে যে দুএক

ফর্মা প্রুফ পাঠাতেন, তা রাত্রিতেই দেখে পরদিন সকালে দিয়ে দিতে হোত।

এর সংগে আমার আরো কয়েকটি গুরুতর অসুবিধা দাঁড়িয়েছিল। বছর দুই পূর্ব থেকে আমার চোখ হঠাৎ দ্রুত গতিতে খারাপ হতে থাকে। ইতিপূর্বেই আমাকে দুবার চশ্‌মা বদল করতে হয়েছিল। কার্যকালে শেষবারের চশ্‌মাকেও অকর্মণ্য মনে হতে লাগল। ইদানিং আমি সম্ভবপক্ষে 'ছোট পাইকা'র লেখা পত্র-পত্রিকা পড়া, বিশেষ করে রাত্রে পড়া, প্রায় বন্ধ করেই দিযেছিলাম। অথচ চশমা বদল করার সামর্থ্য না থাকায় দায়ে পড়ে আমাকে পুরোনো চশ্‌মার সাহায্যে এই বইর অধিকাংশ কাজ রাত্রিতেই করতে হয়েছে।

এ-ছাড়া আরো একটি ব্যাপার ছিল। মুদ্রণ সময়ে আমি ছাপাখানা কর্তৃপক্ষকে গুরুতর পরিশ্রম করিয়েছিলাম ঠিকই; তা সত্ত্বেও তাঁরা আমার সংগে যথেষ্ট বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করেছিলেন, আমার মর্জিমাফিক অনেক কাজও করে দিয়েছিলেন। তাঁদের কাছে আমি বাস্তবিকই কৃতজ্ঞ। কিন্তু যে-কারণেই হোক, একবারও তাঁরা আমাকে 'মেশিন প্রুফ' দিতে পারেননি। হাতে তোলা প্রুফ অস্পষ্ট থাকায় বহু সময়ে আমি তা বুঝে উঠতে পারিনি। এরূপ ক্ষেত্রে মেশিন প্রুফ আমাকে অনেকখানি সাহায্য করতে পারত।

এবার আমার ইচ্ছাকৃত বানানের কথা বলছি।

বানান বিষয়ে আমি কিছু ব্যক্তিগত অভিরুচি বা স্বাধীনতার সুযোগ নিয়েছি, একথা ঠিক। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আমি বাংলা ভাষার পণ্ডিতবর্গকে অশ্রদ্ধা করেছি। আমরা যখন কথাবার্তা বলি, তখন আমরা 'সাধারণতঃ, স্বভাবতঃ, কার্যতঃ, দৃশ্যতঃ, ক্রমশঃ' ইত্যাদি শব্দে বিসর্গ (:) উচ্চারণ করিনা; কিন্তু 'অতঃপর, বয়ঃক্রম, স্বতঃসিদ্ধ,

স্বতঃপ্রবৃত্ত' ইত্যাদি শব্দে করি। আমার বানানগুলি প্রায়শ এইরূপ উচ্চারণাশ্রয়ী।

এছাড়া, আধুনিক বানানেও 'ক' বর্গীয় অক্ষরগুলির সংগে 'ঙ' যুক্ত হয়ে কোথাও অনুস্বার (ং), আবার কোথাও বা যুক্তাক্ষরই লিখবার নিয়ম আছে। এই দুই নিয়মের ব্যতিক্রম মুষ্টিমেয় পণ্ডিত ভিন্ন আর সকলের কাছেই, এমন কি শিক্ষিত লোকের কাছেও দুর্বোধ্য। আমি পণ্ডিত নই, পরন্তু স্বল্প-শিক্ষিত বলেই বাংলা ভাষার এই দুর্দৈবকে ভয় করি; আর আমার মতো স্বল্প-শিক্ষিত লোকের সংখ্যাই যে বাংলা দেশে বেশী, এ-কথাই বা কে অস্বীকার করবেন? সুতরাং 'ক' বর্গীয় অক্ষরের সংগে যেখানেই 'ঙ' যুক্ত হয়েছে, সেখানেই আমি তাকে জ্ঞানত ভেংগে অনুস্বার (ং) বসিয়েছি। অন্যান্য ক্ষেত্রে আমি সাধারণত আধুনিক বানানের অনুসারী; সেসব ক্ষেত্রে বানান ব্যতিক্রমের জন্য আমার পূর্বোল্লেখিত অসহায় অবস্থাই দায়ী। আর নামবাচক বিদেশী বিশেষ্য পদ সম্পর্কে এবার আমি কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম পালন করিনি। পরবর্তী সংস্করণে এগুলি অবশ্যই সংশোধিত হবে।

ডেমোক্র্যাটিক্ ভ্যান্‌গার্ড
১৮, মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

—সমর বোস
১৫ই জুন, ১৯৫৬

বিষয় সূচী

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

জাগরণ

(১৮৭৯—১৯০০)

ভারতের প্রথম আন্তর্জাতিক মল্ল

কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস

আন্তর্জাতিক কুস্তির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ প্রথম শক্তির পরীক্ষা দিয়েছিল ১৮৭৯ অব্দে ইংল্যাণ্ডে এবং এই পরীক্ষায় ভারতবর্ষ যাঁর মাধ্যমে বিজয়ীর সম্মান পেয়েছিল, তিনি ছিলেন এক পিতৃত্যক্ত ও সমাজ-তাড়িত বাঙালী যুবক যিনি পরবর্তী সময়ে কর্ণেল সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস নামে দক্ষিণ অ্যামেরিকায় ব্রাজিলবাসীদের বিপুল শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে, অর্থাৎ ১৮৭৯ অব্দে তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর।

সুরেশচন্দ্র ছেলেবেলা থেকেই অত্যন্ত দুর্দমনীয় ও ডান্‌পিটে স্বভাবের ছিলেন ; দৌড়-ঝাঁপ, ডন-কুস্তি ইত্যাদি সর্ববিষয়েই তাঁর অসীম উৎসাহ ছিল। মাত্র ১৩ বছর বয়সে ১৮৭৪ অব্দে কলিকাতায় লণ্ডন মিশন কলেজের অধ্যক্ষ অ্যাস্টন সাহেব কর্তৃক ক্রিশ্চিয়ান ধর্মে দীক্ষিত হবার পরে তিনি পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হন। ফলে সুরেশচন্দ্র একান্ত নিঃসম্বল অবস্থায় ঘোরাফেরা করতে করতে একসময়ে রেংগুনে উপস্থিত হন ; তারপর একবার মান্দ্রাজেও গিয়েছিলেন। কিন্তু কোথাও কিছু সুবিধা করতে না পেরে তিনি ফের কলিকাতায়ই ফিরে আসেন। তবু দারিদ্র্য তাঁকে মুক্তি দিল না। তাঁর মনে হোল, সমস্ত দেশ ও সমাজ যেনো তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে ! তাই, ১৮৭৮ অব্দের প্রথম দিকে দেশ ও সমাজের প্রতি ধিক্কার দিয়ে অজ্ঞাত ভবিষ্যতের সংগে লড়াই করবার উদ্দেশ্যে বি-এস্‌-এন্‌ কম্পেনির একখানা জাহাজে সহকারী

স্টুয়ার্টের চাকরি নিয়ে তিনি চিরদিনের মতো কলিকাতার জেটি ত্যাগ করলেন এবং অচিরকাল মধ্যে লণ্ডন উপস্থিত হলেন।

লণ্ডনে গিয়ে প্রথমত তিনি কিছুদিন কুলিগিরি করেন; তারপরে করেন খবরের কাগজ ফেরি। এরপরে তিনি লণ্ডন থেকে রকমারি জিনিষপত্র কিনে দূর গ্রামাঞ্চলে বিক্রী ক'রে জীবিকা নির্বাহ করতে থাকেন। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে ১৮৭৯ অব্দের এক সন্ধ্যায় কেণ্ট্‌শায়ারের এক হোটেলে তিনি উঠলেন নৈশাহার ও রাত্রি যাপনের উদ্দেশ্যে। একটা ভ্রাম্যমান সার্কাস দলও তখন সেই সহরে খেলা দেখাচ্ছিল, এবং ঘটনাক্রমে সেই সার্কাসের কর্মাধ্যক্ষের সংগে সেই হোটেলেই সুরেশচন্দ্রের আলাপ হয়ে গেল। সার্কাসের নামে তাঁর চোখে-মুখে হঠাৎ যেনো আনন্দের ঝলক্ খেলে গেল! কিছুমাত্র দ্বিধা না ক'রেই সুরেশচন্দ্র ম্যানেজারের কাছে সার্কাসে ঢুকবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ম্যানেজার অবাক্ হ'য়ে তাকালেন, 'সে কি! এই টুকুন বাচ্চা কাফ্রা ছেলেটা বলে কি? সার্কাসের ও কী জানে? ওর গায়েই বা কী জোর আছে?' এক পলকেই চতুর সুরেশচন্দ্রও তাঁর সন্দিহান দৃষ্টির অর্থ বুঝ্‌লেন; বল্‌লেন, "বিশ্বাস না হয়, পরীক্ষা করুন। আমি ভারতীয়, কুস্তিতে আমি বড়োদেরও ফেলে দেব!"

পরদিন সার্কাসের প্রায় ছয় ফুট উঁচু সবচেয়ে জোয়ান লোকটির সংগে সুরেশচন্দ্রের কুস্তি হোল এবং প্রায় ১০ মিনিট লড়াইর পরেই তিনি তাঁকে গদীর ওপর চিৎ ক'রে ফেল্‌লেন। ম্যানেজার খুসী হয়ে পিঠ চাপড়ে দিয়ে সেইদিনই তাঁকে খাওয়া-পরা ছাড়াও সাপ্তাহিক ১৫ শিলিং বেতনে সার্কাসে চাকরি দিলেন।

প্রকৃতপক্ষে এটা পেশাদারি কুস্তি ছিলনা বা এতে কোনো রকম জাঁক-জমকও ছিলনা। এমন কি, সেই ইংরেজটি বলী ব্যক্তি হলেও

মল্ল নামের অধিকারী ছিলেননা; সুরেশচন্দ্রও অবশ্য দক্ষ মল্ল ছিলেন না। কিন্তু এর আগে আর কোনো ভারতীয় কোনো বৈদেশিকের সংগে কুস্তি প্রতিযোগিতায়ও অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন ব'লে কোনো ঐতিহাসিক উপাদান নেই। কাজেই, আন্তর্জাতিক কুস্তির ক্ষেত্রে সুরেশচন্দ্রকেই ভারতের প্রথম মল্ল হিসাবে উল্লেখ করা যুক্তিসংগত।

সুরেশচন্দ্রের পৈতৃকবাড়ী ছিল নদীয়া জেলার সদর সহর কৃষ্ণনগর থেকে ১৪ মাইল পশ্চিমে ইচ্ছামতী নদীর তীরে নাথপুর গ্রামে। কিন্তু তাঁর জন্ম হয়েছিল মামাবাড়ী রাণাঘাট সহরে ১৮৬১ অব্দে, এবং ১৯০৫, ২২এ সেপ্টেম্বর ব্রাজিলের রাজধানী রিওডি জানেইরো নগরে তিনি মারা যান।

ভারতে
প্রথম বিদেশী দিগ্বিজয়ী মল্লের পরাজয়

বিগত শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতবর্ষে খুব বড় বড় বহু মল্ল ছিলেন; কিন্তু তাঁরা গোড়া-ধর্মী ছিলেন বলেই সাধারণত বিদেশে যাওয়া পছন্দ করতেন না এবং বৈদেশিক পালোয়ানদের সংগে শক্তি পরীক্ষার সুযোগ না ঘটায় তাঁরা নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন না। তখনকার ভারতীয় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের মতো মল্লরাও অবশ্যই দিগ্বিজয়ে বেরুতেন, তবে সেই দিগ্বিজয় ছিল আন্তর্বিভাগীয়, কিংবা বড় জোর আন্তঃপ্রাদেশিক। কিন্তু এই বিষয়ে পশ্চিম এশিয়া এবং পশ্চিম মহাদেশের

বিভিন্ন জাতিগুলো ছিল ব্যতিক্রম। সেইসব দেশের মল্লরা বহু সময়ে শক্তি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে দেশের বাইরে চ'লে আসতেন। ১৮৮৬ অব্দের শেষভাগে জনৈক ইরানী পালোয়ান এইভাবে সর্বপ্রথম বাংলা দেশে পদার্পণ করেন ; তাঁর নাম ছিল শাহ্ নওয়াজ। তখন তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৪০ বছর। তাঁর মাথার খুলি এতই শক্ত ছিল যে, ২ ফুট লম্বা ৬ ইঞ্চি চওড়া এবং ১ ইঞ্চি মোটা শাল কাঠের তক্তা তিনি মাথায় ঠুকে ভেংগে ফেলতে পারতেন বলে প্রসিদ্ধি ছিল। আমাদের দেশে এই ধরণের ক্ষমতার পরিচয় বিশেষ কেউ দেননি ; একমাত্র ঢাকা জেলায় সোণারং গ্রামের তালেবর সর্দার এইভাবে মাথার ঢুঁসে তক্তা ফাটাতে পারতেন যিনি ইংরেজের গুপ্তচর সন্দেহে ১৯০৭ অব্দে তৎকালীন বাঙালী বিপ্লবীদের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন বলে শুনেছি।

শাহ্ নওয়াজ কিছুদিন ঢাকায় বসে রইলেন ; কিন্তু কোনো কুস্তির ব্যবস্থা হোল না। কারণ, তিনি ছিলেন পেশাদার ; টাকার বাজি না হ'লে কারু সংগেই তিনি লড়বেন না জানিয়েছিলেন। আবার, পরাজয়ের ভয়ে হোক, বা অন্য যে-কারণেই হোক, এ-দেশীয় মল্লরাও কেউ টাকার বাজিতে লড়তে প্রস্তুত হননি। নতুবা, সেই সময় পরেশনাথ ঘোষ, 'হাতী' রম্‌জান ইত্যাদির মতো উল্লেখযোগ্য মল্ল ঢাকায় উপস্থিত থেকেও কেন নীরব ছিলেন ? এরপরে শাহ্ নওয়াজ ১৮৮৭, জানুয়ারি মাসে ঢাকা থেকে ময়মনসিং উপস্থিত হন এবং সাড়ম্বরে ক্ষমতার আস্ফালন দেখাতে থাকেন। এমন কি, তিনি বাঙালী ও ভারতীয় জাতির উদ্দেশ্যে দুর্বল, ভীরু, কাপুরুষ ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করতে সুরু করলেন!

সেই সময়ে এদেশে এখনকার মতো কাগজ-পত্রিকার ছড়াছড়ি ছিল না ব'লেই শাহ্ নওয়াজের বিষয়ে সকলে সঠিক সংবাদ পান নি ; পেলে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মল্ল এদেশে কম জুটত বলে মনে হয় না। সে যাহোক,

সেই সময়ে প্রসিদ্ধ বাঙালী বলী ও মল্ল কৈলাস বাঘা ময়মনসিং পুলিস বিভাগে কাজ করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত আত্মমর্যাদাবোধী, জাতির অপমানে তিনি ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠলেন, এবং যে-কোনো ঝক্কি সাপেক্ষে তিনি তাঁর সংগে শক্তি পরীক্ষা দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ফলে ময়মনসিংয়ের তরুণ মহলে এক বিপুল সাড়া প'ড়ে গেল এবং শাহ্ নওয়াজের সর্তানুসারেই ময়মনসিংয়ের পুলিসগণ বাজির বাবদ চাঁদার সাহায্যে ৫০৲ টাকা তুললেন। শাহ্ নওয়াজ নিজেও তখন ৫০৲ টাকা গচ্ছিত রাখলেন। কথা রইল, বিজয়ীই সমুদয় টাকা পাবেন। কৈলাস বাঘা অ-পেশাদার মল্ল ছিলেন ব'লেই তিনি নিজে টাকা দেননি এবং জয়ী হ'লেও তিনি নিজে টাকা নেবেন না জানিয়েছিলেন। ১৮৮৭, ১৩ই ফেব্রুয়ারি ময়মনসিং সহরে পুলিস হেড্ কোয়ার্টার্সের সামনে খোলা মাঠে এই কুস্তি হ'য়েছিল।

তখনকার কুস্তিতে এখনকার মতো এমন মধ্যস্থ, বিচারক বা সময়-রক্ষকের ব্যবস্থা ছিল না। একজন মধ্যস্থ হিসাবে দাঁড়াতেন বটে, আর উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে কারু ঘড়ি থাকলে তা দিয়েই সময় দেখা হোত। তখন অনির্দিষ্ট কালের জন্য প্রতিযোগিতা চলত এবং যতক্ষণ না একজন পরাজিত হোত, ততক্ষণ কুস্তি প্রায়ই বন্ধ হোতনা। কুস্তি লড়তে লড়তে বহু সময় উভয়ের মধ্যে জেদ্ ও রেষারেষি বেড়ে যেত—এমন কি, সময়ে মারামারিও হোত। কখনো কখনো দুই দলের সমর্থকদের মধ্যেও ব্যাপক মারামারি সুরু হোত। দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে অন্যায় আঘাত-প্রত্যাঘাত তো হামেশাই ঘটত। এইরকমই এক বিশ্রী অবস্থার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম এই ঐতিহাসিক আন্তর্জাতিক কুস্তি সংঘটিত হয়। প্রথমত কৈলাস বাঘা মল্ল-ক্ষেত্রে উপস্থিত হ'লেন। তাঁর বয়স তখন মাত্র ২৩ বছর, তাঁর দৃঢ়বদ্ধ ও

পৈশিক দেহখানা দেখে অনেকেই খুসী হলেন। কিন্তু পর মুহূর্তে বৃহত্তর ও নিটোল দেহী প্রবীণ মল্ল শাহ্ নওয়াজকে দেখে অনেকের উৎসাহ যেনো হাওয়ায় মিলে গেল। মুখোমুখী দুজনকে দেখে অনেকরই ধারণা হয়েছিল, এই যুদ্ধে ইরাণীর জয় হবে।

লড়াই সুরু হোল।

মিনিট দশেক কুস্তি চলার পরে হঠাৎ ইরাণী নিজের মাথা দিয়ে কৈলাস বাঘার মাথায় প্রচণ্ড এক ঢুঁস দিয়ে বস্‌লেন যার ফলে কৈলাস বাঘার ভাষায়ই বলতে পারি, তিনি 'চোখে জোনাকী পোকা উড়তে' দেখেছিলেন! এই অবস্থায় আর একটু হ'লেই তাঁকে মাটিতেও পড়তে হোত। কিন্তু লোক-লজ্জা ও আত্মমর্যাদা-বোধ তাঁকে মুহূর্তে চাংগা ক'রে তুলল; তিনি কোনোক্রমে মাত্র আত্মরক্ষা ক'রে লড়তে লাগলেন। ফলে ইরাণীর জয়ের আশা বেড়ে গেল এবং তিনি বার বার অনুরূপ কায়দায় ঢুঁস দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কৈলাস বাঘা তখন উপস্থিত দর্শকদের কাছে অভিযোগ করতে লাগলেন। উপস্থিত অনেকেই ইরাণীকে এই বে-আইনী আঘাত দেওয়া থেকে বিরত হতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু উচ্ছৃংখল ইরাণী তাঁদের কথায় কোনো কর্ণপাতই করেন নি।

অতএব এইবার কৈলাস বাঘার পালা। ইরাণীর ব্যবহারে তিনিও ক্রমশ ক্ষেপে গেলেন এবং ইরাণীকে পাল্টা আঘাত দেবার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। প্রায় দু ঘণ্টা কুস্তির পরে যে-মুহূর্তে ইরাণী আর একবার ঢুঁস দেবার জন্য তীব্রবেগে ঝুঁকে পড়লেন, সেই মুহূর্তেই কৈলাস বাঘা 'দস্তি' প্যাচের জোরে বিদ্যুৎবেগে তাঁর পেছনে চ'লে গেলেন এবং সংগে সংগে 'কালাজং' ক'সে তাঁকে উপুর ক'রে ফেল্‌লেন। একেই উপযুক্ত সুযোগ মনে ক'রে তিনি সেই সময়েই নিজের বাঁ হাতের তর্জনী

কৈলাস বাঘা (৬৯ বছর বয়সে)

১৮৮৫—১৯০৫ অব্দ পর্যন্ত বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অ-পেশাদার মল্ল ও বলী। মল্ল হলেও তাঁর দেহ ছিল ইওরোপীয় ঢংয়ের পৈশিক ও দৃঢ়বদ্ধ, এ-ধরনের দৈহিক বৈশিষ্ট্য এ-দেশে একান্তই বিরল।

দিয়ে ইরাণীর বাঁ নাশা-রন্ধ্রটিকে ছিঁড়ে ফেল্‌লেন এবং সংগে সংগে ওপর থেকে দমকে দমকে প্রবল চাপ দিতে লাগলেন। এইভাবে আরো ১০।১৫ মিনিট কাটবার পরেই অতিরিক্ত রক্তস্রাবের ফলে ইরাণী ক্রমশ দুর্বল হ'য়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হ'লেন। পর দিন বে-পরোয়া অন্যায় আঘাতের পুরস্কার স্বরূপ ছিন্ন নাসিকা নিয়ে ইরাণীকে বাংলা দেশ ছাড়তে হ'য়েছিল এবং ভারতের কুত্রাপি আর তাঁর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি!

কৈলাস বাঘার এই জয়ে ময়মনসিংয়ে তখন এক বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা দিল এবং লোকের মুখেমুখে তাঁর বিজয় গৌরব ছড়িয়ে পড়্‌ল। ইরাণীর পরিত্যক্ত টাকা ও পুলিসদের সংগৃহীত টাকা দিয়ে অতঃপর এক বিরাট ভোজসভার আয়োজন হয়। বস্তুত, ভারতীয় কুস্তির ইতিহাসে এটি এক অবিস্ময়নীয় ঘটনা এবং ভারতীয় পেশাদার বা অ-পেশাদার পালোয়ানের হাতে বৈদেশিক দিগ্বিজয়ী পেশাদার মল্লের পরাজয় এটাই প্রথম যা ভারতীয় পালোয়ানদের আন্তর্জাতিক কুস্তিতে অবতীর্ণ হবার যথেষ্ট সাহস যুগিয়েছিল। হয়তো বাংলা দেশে বাঙালীর দ্বারা এই কীর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ব'লে বাঙালীরা নিজেদের গৌরবান্বিত বোধ করবেন।

কৈলাস বাঘার দেহ পূর্বাপরই বেশ সুগঠিত ছিল,—প্রায় ৭০ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর শরীর ভাংগেনি। তারপরে একবার গুরুতর অসুস্থ হ'য়ে পড়ায় তাঁর দেহের বাঁধুনী নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল। ১৮৯৮, জানুয়ারি মাসে ময়মনসিং সহরে প্রসিদ্ধ বলী শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কৈলাস বাঘার দৈহিক মাপ নিয়েছিলেন। সেটি এই :—

বয়স	৩৩ বছর
ভার	২১০ পাউণ্ড
দৈর্ঘ	৬৯ ইঞ্চি
গলা	১৭ ,,
বাহু (স্বাভাবিক)	১৫½ ,,
গোছা (স্বাভাবিক)	১৩ ,,
কব্জি	৮¼ ,,
বুক (স্বাভাবিক)	৫৭ ,,
বুক (প্রসারিত)	৪৯½ ,,
পাছা	৪১ ,,
কটি	৩২ ,,
উরু	২৬½ ,,
হাঁটু (সোজা ও শক্ত)	১৪⅞ ,,
মোচা (স্বাভাবিক)	১৫ ,,
মোচা (সংকুচিত)	১৬¼ ,,
নলি	৮¾ ,,

কৈলাস বাঘার পূর্ণ নাম কৈলাসচন্দ্র বসু ; কিন্তু ময়মনসিং জেলায় মির্জ্জাপুরের এক জংগলে বৈঠার আঘাতে একটি বাঘকে মেরে ফেলবার পরে তিনি সাধারণের কাছে 'কৈলাস বাঘা' নামেই পরিচিত হয়েছিলেন। বাড়ী ছিল তাঁর ফরিদপুর জেলার গয়ঘর গ্রামে। কিন্তু জীবনের বেশীর ভাগ সময় তিনি ময়মনসিং জেলায় কাটিয়েছিলেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল ফরিদপুর জেলার কমলাপুর গ্রামে মামাবাড়ীতে ১৮৬৪, ১লা নভেম্বর এবং মৃত্যু হয় ১৯৪০, ২৭এ জানুয়ারি ময়মনসিং জেলার ভুয়াজানি গ্রামের শ্বশুর বাড়ীতে।

টম্ ক্যাননের ভারত সফর

এরপরেই বিগত শতাব্দীর শেষ দশকের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হোল আইরিশ মল্ল-বীর (Irish Wrestling Champion) টম্ ক্যাননের ভারত সফর। সেই সময় তিনি ছিলেন সমগ্র গ্রেট্ বৃটেনের সর্বশ্রেষ্ঠ মল্লযোদ্ধা। ১৮৯০ অব্দে টম্ ক্যানন ও তাঁর বন্ধু অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রীক্ পালোয়ান আণ্টন্ পীড়ি তাঁদের পরিচিত এক নাবিক ক্যাপ্টেনের কাছে শুনলেন যে, পঞ্জাবে বহু বড বড় মল্ল আছে এবং তাদের হারাতে পারলে বিস্তর ধনরত্ন পাওয়া যায়। ক্যাপ্টেনের কথা শুনে দুই বন্ধুই প্রলুব্ধ হ'য়ে অচিরাৎ ভারতাভিমুখে যাত্রা করলেন।

আমাদের দেশে আজো পর্যন্ত এক জনশ্রুতি চালু আছে যে, টম্ ক্যানন্ এদেশে এসে বহু কুস্তি ল'ড়েছিলেন ; এমন কি, কোনো কোনো লেখক এই প্রবাদকেই অভ্রান্তরূপে গ্রহণ ক'রে সাড়ম্বরে লিখেছেন যে, ১৮৯২ অব্দে ক্যানন্ কুচ্‌বিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের মধ্যস্থতায় কলিকাতা নগরে পঞ্জাবের প্রসিদ্ধ পালোয়ান করিম বথ্‌শ্ পেহেল্‌রিওয়ালার কাছে অতি সহজেই পরাজিতও হ'য়েছিলেন। একজন আবার অভিমান ক'রে লিখেছিলেন যে, এত বড়ো পরাজয়ের কথাটাকেও ক্যানন তাঁর জীবনীতে উল্লেখ করেননি,—চতুরতার সহিত চেপে গিয়েছেন! কিন্তু এই কাহিনীর কিছুমাত্র সত্যতা নেই।

প্রকৃতপক্ষে, ক্যানন্ বা পীড়ি এদেশে এসে একটি কুস্তিও লড়েন নি। তাঁরা ভারতীয় পালোয়ানদের কুস্তি-রত বিশাল নগ্ন-দেহ এবং তাঁদের লড়বার ঢং ও কায়দা-কলাপ দেখেই মনে মনে স্তম্ভিত হয়েছিলেন ; এইজন্য তাঁরা একান্ত নীরবে, এমন কি, আত্ম-পরিচয় না দিয়েই এদেশ

থেকে চ'লে গিয়েছিলেন। তাঁদের এই ভারত-ভ্রমণ সম্পর্কে গ্রীক মল্ল আণ্টন্ পীড়ি অশুদ্ধ ইংরেজিতে যে চিত্তাকর্ষক বিবরণ দিয়েছিলেন, তা ও-দেশের কোনো একটি পত্রিকায় হুবহু প্রকাশিত হয়েছিল এবং তার বহু বছর পরে একখানা প্রসিদ্ধ অ্যামেরিকান ব্যায়াম মাসিকেও সেই লেখার অংশ-বিশেষ পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। এখানে আমি সেই রচনা থেকে প্রয়োজনীয় কয়েকটি কথা তুলে দিচ্ছি:—

"* * * We decide our reputation too big and Maharajah no bet against us. So we decide take other names to hide our reputations.

"We arrive in Punjab. We wait for Sunday and we go see big match in tournament. One Maharajah, he sit on a high gold chair. Another Maharajah, he sit on another big high very gold chair.

"Few minutes, two big wrestlers come on the big soft mat. Oh, how big and how heavy-muscled man! Never see such champion before! The match, he go about ten minutes. The show is over!

"Tom, he look at me and I look at him. We both look sad.

"I say, Tom, this is no place for us to win money. We go home. We go back to England.

"Tom, he never answer, but he come with me like a baby, and three days later we are again on

the boat and we begin our trip for home. We never say one word to the Wrestlers or to the Rajah. No use."

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, অতি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য টম্ ক্যানন্ ও পীড়ি ভারতে এসেছিলেন এবং তাঁরা কলিকাতায়, এমন কি, বাংলা দেশে পর্যন্ত পদার্পণ করেননি। অতএব, আমার মনে হয়, ১৮৯২ অব্দে করিম বখ্‌শের সংগে কলিকাতায় যদি কোনো ইওরোপীয় মল্লের কুস্তি হ'য়েও থাকে, তবে সে মল্ল কিছুতেই ক্যানন্ নন এবং সে ব্যক্তি এমন কেউ ছিলেন, যাঁর নাম এখন আর জানবার কোনো উপায় নেই।

তখনকার দিনে এমন ধরণের আরো দু একজন বিদেশী মল্ল এদেশে এসেছিলেন, যাঁদের নাম কেউ মনে রাখেনি। কারণ, আমাদের দেশে পূর্বে ইতিহাস রক্ষার একেবারেই রেওয়াজ ছিল না, এখনো অবশ্য নেই। এখন যাঁদেরকে এ-বিষয়ে একটু অগ্রণী দেখা যায়, তাঁরাও বহু সময়েই কিছু কিছু মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে অথবা সুবিধামত ঘটনাকে বাড়িয়ে-কমিয়ে প্রবন্ধ রচনা ক'রে থাকেন।

১৮৯৮, এপ্রিল মাসে এমনি আর একজন অজ্ঞাত-নামা ইংরেজ পালোয়ান এসেছিলেন বাংলা দেশে। ঢাকায় তাঁর সংগে কৈলাস বাঘার ভাই প্রসিদ্ধ বলী বোস ঠাকুরের কুস্তি হয়। এই কুস্তিতে বোস ঠাকুর তাঁকে সহজেই পর্যুদস্ত করেছিলেন। সম্ভবত মল্ল হিসাবে এই ইংরেজ পালোয়ানও উল্লেখযোগ্য ছিলেননা; নতুবা কুস্তিতে যথেষ্ট দক্ষ না হ'য়েও কি ক'রে বোস ঠাকুর তাঁকে হারিয়েছিলেন! আমি যতদূর শুনেছি, এই ইংরেজ মল্লটি সৈনিক বিভাগে কাজ করতেন এবং মুষ্টিযুদ্ধে খুবই দক্ষ ছিলেন। ভারতোলায়ও তাঁর বেশ কৃতিত্ব ছিল।

'পাঞ্জা-বীর' বোস ঠাকুর

কুস্তি প্রতিযোগিতার মতো পাঞ্জা-লড়াও আমাদের দেশে প্রাচীন সময় থেকেই চল্‌তি আছে। কিন্তু কুস্তির মতো পাঞ্জা এদেশে ততটা ব্যাপকতা লাভ করেনি। দু হাজার বা ততোধিক বছর আগে গ্রীস দেশেও পাঞ্জা প্রতিযোগিতা হোত; বোধ হয়, সেখানকার প্রসিদ্ধ 'সমান্তরাল কুস্তি' আধুনিক পাঞ্জা-লড়ারই নামান্তর ছিল। ইদানিং কালে পাঞ্জা-লড়া সমগ্র পশ্চিম জগতে 'রিস্ট্‌ টার্‌নিং' বা 'রিস্ট্‌ রেস্ট্‌লিং' নামে পরিচিত আছে।

পাঞ্জা-লড়ার অনেকগুলি প্রণালী আছে। তার মধ্যে অন্তত পাঁচটি প্রথা অনেকের কাছে সুবিদিত।

প্রথম নিয়মে দুজন প্রতিযোগী মাঝখানে একখানি টেব্‌ল্‌ রেখে মুখোমুখি দুখানা চেয়ারে উপবেশন করে। শেষে টেব্‌লে কনুই রেখে দুজনই দুজনের পাঞ্জা ধ'রে জোরের সংগে একে অপরের হাতখানাকে চিৎ করবার চেষ্টা করে।

দ্বিতীয় নিয়মে টেব্‌লের প্রয়োজন নেই। সেক্ষেত্রে মুখোমুখি দুখানা চেয়ারে ব'সে দুজনই একে অপরের আংগুলের ফাঁকে আংগুল দিয়ে পাঞ্জা ধরে এবং বুড়ো আংগুলকে প্রতিপক্ষের মুঠোর তলা দিয়ে উল্টো দিকে এনে নিজের মুঠোকে দৃঢ় ক'রে জোরের সহিত মুঠো ও হাত চেপে নিজ নিজ ডান দিকে ঘুরিয়ে অপরকে পরাস্ত করতে সচেষ্ট হয়।

তৃতীয় নিয়ম অনেকটা দ্বিতীয় নিয়মেরই মতো। তবে এই নিয়মে

বুড়ো আংগুলকে যথাস্থানে রেখেই অপরের পাঞ্জাকে শক্ত ক'রে ধরতে হয় এবং আংগুলের ডগায় জোর দিয়ে প্রতিপক্ষের পাঞ্জাকে একেবারে সোজাসুজি পিছনদিকে চেপে দুমড়ে দিতে হয়।

চতুর্থ নিয়মটি খুবই সহজ। এতেও মুখোমুখি ব'সে একজন খাড়াভাবে আর একজনের কব্জি ধরে; তখন প্রথম ব্যক্তি নিজের হাতে জোর দিয়ে নীচের দিকে এক চাপ সৃষ্টি ক'রে দ্বিতীয় ব্যক্তির কব্জি ধরবার চেষ্টা করে। বলা বাহুল্য, দ্বিতীয় ব্যক্তির শক্তি বেশী থাকলে স্বাভাবিকভাবেই প্রথম ব্যক্তির পক্ষে দ্বিতীয় ব্যক্তির কব্জি ধরা সম্ভব হয়না। এইভাবে আবার প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির কব্জি ধরলে দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির কব্জি ধরবার চেষ্টা করে। চতুর্থ নিয়মের এই পাঞ্জাটি এইভাবে পাল্টাপাল্টি দুবার পরীক্ষা হয়।

পঞ্চম নিয়মটি অনেকটা চতুর্থ নিয়মেরই অনুরূপ। এই নিয়মে খাড়াভাবে কব্জি না ধ'রে ধরতে হয় পাশ থেকে। তারপরে পাল্টাপাল্টিভাবে দুবার শক্তির পরীক্ষা হয়।

সমস্ত পাঞ্জারই একটি সাধারণ নিয়ম এই যে, ডান হাতে ডান হাত বা বাঁ হাতে বাঁ হাত দিয়ে লড়তে হয় এবং প্রতিযোগী কোন সময়েই আসন থেকে উঠবে না, বা ধরবার সুবিধার জন্য আসনে থেকেও নড়াচড়া করতে পারবে না। একথা সত্যি যে, পাঞ্জা-লড়ায় কখনো দেহের সামগ্রিক শক্তির প্রয়োজন হয়না। কারু বুকের পেক্টরালিস্ মেজর, কাঁধের ট্রাপিজিয়াস্, পার্শ্বের লাটিসিমাস্ ডরসাই, বাহুর ডেল্‌টয়েড্, ট্রাইসেপ্ ও বাইসেপ এবং গোছার ফ্লেক্সরস্ ও এক্স্‌টেন্সর্স্ শক্তিমান হ'লেই তার পক্ষে বহু প্রসিদ্ধ বড় বড় বলীকেও পাঞ্জায় পরাজিত করা সম্ভব হয়। আমাদের দেশে পাঞ্জা-বীর খুব বেশী না থাকলেও দু একজন এমন

মানুষ দেখা গেছে, যাঁরা এই বিষয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভের যোগ্য ছিলেন। কিন্তু এই বিষয়টি কুস্তি, মুষ্টি বা যুযুৎসুর মতো জমকালো নয়, এবং এ-দেশের পাঞ্জা-বীরগণ এই ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেননি ব'লেই তাঁরা অখ্যাত র'য়ে গেছেন।

আমাদের দেশের ক্ষমতাবান পাঞ্জা-বীরদের মধ্যে প্রথম যিনি বিদেশীর সংগে পাঞ্জা লড়েছিলেন, তিনি বোস ঠাকুর। ১৮৯৯, জানুয়ারি মাসে জনৈক বিপুল দেহী এবং প্রচণ্ড বলী কাবুলিওয়ালার সংগে তাঁর পূর্বোল্লিখিত দ্বিতীয় নিয়মে পাঞ্জার লড়াই হয় এবং প্রায় ১০।১২ সেকেণ্ডে বোস ঠাকুর কাবুলিওয়ালাকে পরাজিত করেছিলেন। এই শক্তির পরীক্ষাটি হ'য়েছিল পূর্বংগে নারায়ণগঞ্জ থেকে গোয়ালন্দগামী একটি স্টীমারের ডেকে পদ্মা নদীর বুকে।

প্রকৃতপক্ষে, বোস ঠাকুরের হাত ও পাঞ্জার শক্তি এ-দেশে অতুলনীয় ছিল। পাঞ্জা প্রতিযোগিতায় তিনি একরকম অজেয়ই ছিলেন। তাঁর শুধু মুঠোটি খুলতে পারবার মতো বলী পুরুষও এদেশে বেশী সংখ্যক ছিলেননা। এমন কি, অনেক জোয়ান ব'লে পরিচিত ব্যক্তি তাঁর হাতের অর্ধবক্র মধ্যমাংগুলীটিকেও দু হাতের চেষ্টায় সোজা করতে পারতেননা,—এই পরীক্ষা আমি নিজেও বহুবার দেখেছি।

১৯২৭ অব্দে যখন বোস ঠাকুরের ৫১ বছর বয়স, তখন তিনি শুধু ডান হাতের মাঝের আংগুলে প্রায় ৬২ পাউণ্ড ওজনের একটি মোংগরের কড়া ধ'রে হাতখানাকে সটান সামনের দিকে মাটির সংগে সমান্তরাল রেখায় তুলে ধরেছিলেন। আর ৩০০ পাউণ্ড ওজন এক আংগুলে টেনে ধ'রে তিনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আজো পর্যন্ত কোনো ভারতীয়ের দ্বারা এ দুটি কীর্তি সম্ভব হয়নি।

১৮৯৮, জানুয়ারি মাসে তাঁর দেহের মাপ ছিল এই রকম ঃ—

বয়স	২১ বছর
ভার	২০০ পাউণ্ড
দৈর্ঘ	৬৮১/৪ ইঞ্চি
গলা	১৭ ,,
বাহু (স্বাভাবিক)	১৫৩/৪ ,,
গোছা (স্বাভাবিক)	১৪১/৪ ,,
কব্জি	৮১/৪ ,,
বুক (স্বাভাবিক)	৪৬ ,,
বুক (প্রসারিত)	৫২১/২ ,,
কটি	৩০ ,,
উরু	২৬ ,,
হাঁটু	১৪১/২ ,,
মোচা (স্বাভাবিক)	১৩১/৪ ,,
নলি	৮৩/৮ ,,

বোস ঠাকুরের আসল নাম ছিল দেবেন্দ্রচন্দ্র বসু ; কিন্তু শেষের দিকে তিনি সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতেন ব'লেই স্বজন বন্ধুগণ তাঁকে 'বোস ঠাকুর' বলে ডাকতেন। ১৮৭৬, ১৫ই ডিসেম্বর ফরিদপুর জেলার গয়ঘর গ্রামে তাঁর জন্ম হয় এবং ১৯৩৩, ২০এ ডিসেম্বর ফরিদপুর জেলার পালং গ্রামে তাঁর মৃত্যু হয়।

গোলামের ইওরোপ বিজয়

ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এ-দেশের কোনো মল্লই দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্যে ভারতের বাইরে যাননি। কিন্তু ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম সে গৌরবের সম্পূর্ণ অধিকারী ছিলেন অমৃতসরের গোলাম পালোয়ান।

১৯০০ অব্দে প্যারিসে এক প্রসিদ্ধ প্রদর্শনী হয় এবং সেই উপলক্ষে এলাহাবাদের পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু গোলামকে সেখানে নেবার ব্যবস্থা ক'রেছিলেন। এই প্রদর্শনীতে শুধু গোলামই নন, ভারতের পক্ষ থেকে আরো জনকয়েক গুণী খেলোয়াড় ও শিল্পী উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে সার্কাস বিভাগে বেণীমাধব ঘোষ, কৃষ্ণলাল বসাক, পান্নালাল বর্ধন, দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ ইত্যাদির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ভারতীয় দলটি ১৯০০, ২৯এ এপ্রিল যাত্রা ক'রে ২৯এ মে প্যারিসে উপস্থিত হয় এবং ঐদিনই পণ্ডিত নেহেরু গোলামের পক্ষ থেকে ইওরোপ ও বিশ্বের সকল মল্লের উদ্দেশ্যে এক আহ্বান ঘোষণা করেন। এর ফলে দেখ্‌তে দেখ্‌তে সারা ইওরোপে এক ভীষণ আলোড়ন সৃষ্টি হয়। গোলামকে শুধু দেখবার জন্য প্রতিদিন অসম্ভব ভিড় হ'তে থাকে। তাঁর জনপ্রিয়তা তখন কিরূপ বেড়ে গিয়েছিল, আমেরিকার কুস্তি বিশেষজ্ঞ মিঃ জ্যাক্ কার্লীর লেখায় তার কিছুটা আন্দাজ করা যাবে। তিনি লিখেছিলেন :—

— "He filled the Follies Bergere in Paris by the mere announcement that he would occupy a box seat at the show. He stopped all traffic on the boulevards

when he appeared for his promenade, and the Champs Elysees crowds stood aghast when the turbaned, silk-robed Oriental hove in sight. Every drawing room was opened for him and Gulam became the man of the hour in Gay Paree."

ক্রমশ ছোট-বড় অনেক মল্ল এসে গোলামের কুস্তির মহড়া দেখে যেতে লাগল, কেউ কেউ বা তাঁর সংগে কুস্তি অভ্যাসও ক'রেছিল। অবিস্মরণীয় জার্মান বলী ইউজেন সাণ্ডো তখন প্যারিসেই ছিলেন; তিনিও একদিন গোলামের আখড়ায় এসে তাঁর সংগে আপোষে কুস্তি লড়েছিলেন যদিও মল্ল-ক্রীড়ায় তাঁর বিশেষ কোনো কৃতিত্ব ছিল না। বস্তুত তখন ও-দেশে বহু স্বনামখ্যাত মল্ল ছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, দীর্ঘ দিনেও কেউ গোলামের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এগুলেন না। শেষে ফ্রান্সের সুপ্রসিদ্ধ ব্যায়াম-গুরু প্রফেসর এড্‌মুণ্ড ডেস্‌বোনেটের চেষ্টায় তুরস্কের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ পালোয়ান কুর্দি আলীর সংগে গোলামের এক কুস্তি হয়।

এই কুস্তিতে গোলাম কুর্দি আলীকে মাদুরে চিৎ করেছিলেন বটে, কিন্তু 'যথানিয়মে চিৎ করা হয়নি'—দর্শকদের মধ্যে এই ধরণের একটা উচ্চ হট্টগোল সুরু হয়। ফলে মধ্যস্থও শেষ পর্যন্ত কুস্তিটাকে সমান বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু ইওরোপের বহু অভিজ্ঞ ব্যায়ামী ও মল্ল, এমন কি, প্রফেসর ডেস্‌বোনেট, যিনি স্বয়ং কুর্দি আলীকে গোলামের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দাঁড় করিয়েছিলেন, তিনিও গোলামকেই শ্রেষ্ঠতর মল্ল ব'লে মত প্রকাশ করেছিলেন। কারু কারু ধারণায় গোলাম তখন পৃথিবীতে 'অতুলনীয়' এবং 'অপ্রতিদ্বন্দ্বী' (unparallel and unrival) মল্ল ছিলেন।

গোলামের আহ্বান ১০ই আগষ্ট পর্যন্ত উন্মুক্ত ছিল এবং সেই পর্যন্ত আর কেউ তাঁর সম্মুখীন হননি।

গোলামের দেহের মাপ কবে কে কেমন করে নিয়েছিলেন, আমার জানা নেই। কিন্তু একবার 'প্রবাসী' পত্রিকায় তাঁর এ মাপটি ছাপা হয়েছিল :—

ভার	২৮৬১/২ পাউ
দৈর্ঘ	৬৮১/২ ইঞ্চি
গলা	২০১/২ ,,
বাহু (সংকুচিত ?	[illegible]
গোছা	[illegible]
বুক (প্রসারিত ?	৫৭৩/৪
উরু	[illegible] ,,
মোচা	১৮১/৮ ,,

১৯০০, ডিসেম্বর মাসে গোলাম পালোয়ান কলিকাতায় কলেরা [illegible] মারা যান।
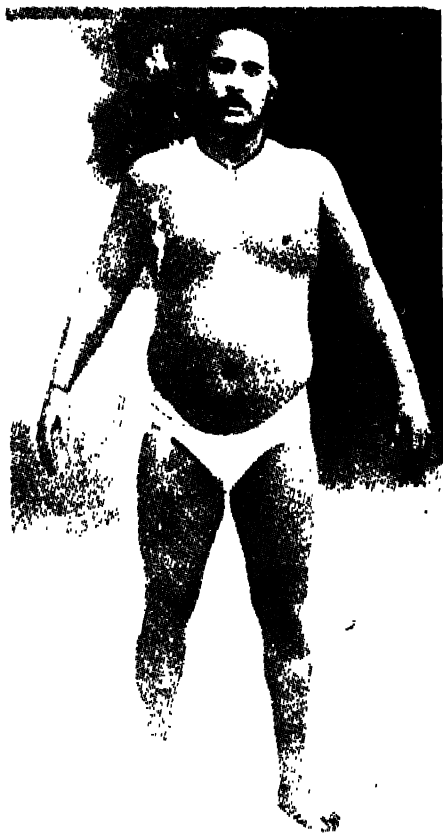
গোলাম পালোয়ান

১৮৮০ ১৯০০ অব্দ পর্যন্ত ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পেশাদার মল্ল এবং ভারতের প্রথম দিগ্বিজয়ী পালোয়ান। তাঁর সমসকার অন্যান্য প্রসিদ্ধ মল্লদের মধ্যে বুটা, কশিতা, কিক্কড় সিং, কাল্লু, গামু, মিরান বখ্শ্ ইত্যাদি প্রধান ছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অভিযান

(১৯০১—১৯১০)

সাণ্ডোর অভ্যুত্থান

একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, ব্যায়াম-জগতে জার্মান বলী ইউজেন সাণ্ডোর অভ্যুত্থান এক অবিস্মরণীয় ঘটনা এবং ব্যায়ামী হিসাবে পৃথিবীর বুকে আর কোনো মানুষই তাঁর মতো এত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেননি। ব্যায়ামী হিসাবে যেদিক থেকেই বিচার করা যাক্, তিনি নিঃসন্দেহে অতুলনীয় ছিলেন। ব্যায়াম-বিজ্ঞানেও তাঁর দান ছিল অসীম সন্দেহ নেই। 'স্প্রিং গ্রীপ্ ডাম্ব্-বেল' এবং 'ডেভেলপার্' তাঁরই আবিষ্কৃত যন্ত্র। শক্তি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বহু কায়দা তিনি আবিষ্কার ক'রে গেছেন। 'বেণ্ট্ প্রেস্'-এ তিনি অসামান্য প্রতিভাবান পুরুষ ছিলেন। আর সুসমঞ্জস দৈহিক সৌন্দর্যে তিনি আজো পর্যন্ত পৃথিবীতে আদর্শ ব্যায়ামী হিসাবে পূজিত হচ্ছেন। আজো পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের বহু ব্যায়ামী নিজেকে তত্রত্য দেশের 'সাণ্ডো' ব'লে পরিচয় দিয়ে গৌরবান্বিত বোধ ক'রছেন। কেউ কেউ নিজেকে সাণ্ডোর চেয়েও শ্রেষ্ঠতর ঘোষণা ক'রেছেন বটে, কিন্তু সাড়ম্বরে নিজেকে 'সাণ্ডো-সন্তান' (Son of Sandow) ব'লে পরিচয় দিয়ে আবার নিজেই অজ্ঞাতসারে প্রমাণ ক'রেছেন, সাণ্ডো কতো বড় ছিলেন! এমন কি, সাণ্ডোর জীবদ্দশায়ও কোনো কোনো ব্যায়ামী নিজেকে কৌশলে সাণ্ডো ব'লে পরিচয় দিয়ে স্বার্থ সাধন করেছিলেন। ১৮৯১ অব্দে ইংল্যাণ্ডের এক ব্যায়ামী, মণ্ট্গোমেরি আইর্ভিং, ক্যানাডায় এইভাবে ধরাও প'ড়ে গিয়েছিলেন! কিন্তু চতুরতার সহিত তিনি ইংরেজী 'সাণ্ডো' শব্দের শেষে একটি 'ই' অক্ষর বসিয়ে নামটাকে 'সাণ্ডোই' (Sandowe) ক'রে রেখেছিলেন ব'লে মামলায় নিষ্কৃতি পেয়ে যান। সে যাহোক, সাণ্ডো যে পৃথিবীতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যায়ামী ছিলেন, সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

১৮৬৭, ২রা এপ্রিল পূর্ব জার্মানির কোনিগস্‌বার্গ সহরে সাণ্ডোর জন্ম হয় এবং একটি সাধারণ সুস্থ বালক অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টা ও সাধনা দ্বারা কালক্রমে তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যায়ামী হ'য়েছিলেন।

সাণ্ডো যৌবনে কুস্তিও লড়তেন এবং ১৮৮৮-৮৯ অব্দে ইটালিতে অবস্থান সময়ে তিনি এ-বিষয়ে কিছু কিছু কৃতিত্বও দেখিয়েছিলেন। কিন্তু ব্যায়ামী হিসাবে তাঁর খ্যাতি দিক্‌বিদিকে ছড়িয়ে পড়ে ১৮৮৯, ২রা নভেম্বর সুপ্রসিদ্ধ রুশ-বলী চার্লস্‌ সাম্‌সন্‌কে লণ্ডন নগরে শক্তির কাজে হারিয়ে দেবার পরে। এরপরেই তিনি বিশ্ব-পরিক্রমায় বহির্গত হন এবং দেশ-বিদেশের বহু বহু ব্যায়ামী ও বলীর সংগে শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। অধিকাংশ জায়গায় তিনি জয়ী হ'লেও দু এক জায়গায় তিনি অপদস্থও হ'য়েছিলেন। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য যে, ১৯০২-০৩ অব্দে ভারতবর্ষে এসে সাণ্ডো কারু সংগেই শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোক এই বিষয়টিকে বরাবরই ভ্রান্তভাবে বোঝানোর চেষ্টা ক'রে থাকেন। তাঁরা ব'লে থাকেন, ভারতোলায় সাণ্ডোর চেয়ে ঢের বড় বড় বলী এ-দেশে বিদ্যমান ছিলেন ব'লেই সাণ্ডো সভয়ে শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা এড়িয়ে গিয়েছিলেন। আসলে সেকথা সত্যি নয়। আসল ব্যাপার এই যে, ভারোত্তোলন বিষয়ে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য প্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। ভারতীয় বলীরা সেই সময়ে 'নাল' নামীয় পাথরের ভারযন্ত্র তুলতে অভ্যস্থ ছিলেন বটে, কিন্তু সেই 'নাল' তোলার কায়দা পাশ্চাত্য বারদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল ; অল্প সময়ের মধ্যে সেই কায়দা বিদেশীদের পক্ষে শিক্ষা করাও সম্ভব ছিলনা। আবার আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত পাশ্চাত্য প্রণালীতে ভার তোলাও ভারতীয়দের কাছে তখন একরকম অপরিজ্ঞাত ছিল,—অল্প সময়ের মধ্যে তা-ও ভারতীয়দের

পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব ছিলনা। এইজন্যই সাণ্ডোর সংগে এই দেশীয় বলীদের কোনোরকম প্রতিযোগিতা সম্ভব হয়নি। তবে নিরপেক্ষ মন নিয়ে বিচার করলে স্বীকার করতেই হবে যে, ভারতোলার ব্যাপারে সাণ্ডোর সমকক্ষ বলী এদেশে বিশেষ কেউ ছিলেন না। কেননা বেণ্ট্‌ প্রেসে তিনি যে ভার তুলতেন, অর্ধ শতাব্দীর ব্যবধানে সে ভার তুলবার মত ব্যক্তি আজো পর্যন্ত এ-দেশে জন্মাননি। সাণ্ডো এক আংগুলের টানে যে ভার তুলতে পারতেন, সে ভারকে দু হাতে তুলবার মত আদমীইবা এ-দেশে ক'জন আছেন? সাণ্ডো যে ভার নিয়ে 'ক্রুসিফিক্স্‌' করতে পারতেন, তারইবা জোড়া কোথায়? শেষোক্ত দুইটি কাজ নিয়মিত অভ্যাস করলে হয়তো একমাত্র বোস ঠাকুর তাঁর কাছাকাছি যেতে পারতেন।

কুস্তিতে অবশ্য ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য ছিল। ব্যায়াম-বিজ্ঞান বিষয়ে অসাধারণ জ্ঞানী সাণ্ডো প্যারিসে গোলামকে দেখে এবং এ-দেশে এসেও অন্যান্য মল্লদের পর্যবেক্ষণ ক'রে পরিষ্কার বুঝেছিলেন, কুস্তিতে নেমে এ-দেশ থেকে বাহাদুরি নেওয়া বিদেশীদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। বিশেষত তিনি মল্লযোদ্ধা ছিলেনও না এবং নিজেকে তিনি মল্ল ব'লে পরিচয়ও দিতেন না। কাজেই নৈতিক দিক থেকেও সাণ্ডো বস্তুতই সাচ্চা ও বিরাট ছিলেন।

পূর্বেই ব'লেছি, সাণ্ডোর মত সুঠামদেহী ব্যায়ামী পৃথিবীতে আজো পর্যন্ত আর কেউ জন্মাননি। কাজেই তাঁর দৈহিক মাপ নিয়েও সমগ্র জগতে বহু আলোচনা এবং গবেষণা চ'লেছে। তাঁর বিভিন্ন বয়সে একাধিকবার দৈহিক মাপ গৃহীত হ'য়েছিল বটে, কিন্তু ইংরেজী মাপের ফিতা দ্বারা সে মাপ গৃহীত না হওয়ায় তা নিয়ে বহু গোলমাল সৃষ্টি হ'য়েছে। সবচেয়ে উন্নত দেহ যখন তাঁর ছিল, সেই সময়ে তাঁর যে মাপ নেওয়া

হ'য়েছিল, কোনো অন্ধ স্তুতিকার তার ইংরেজি হিসাব করতে গিয়ে অতিরঞ্জনজনিত মারাত্মক ভুল করেছিলেন এবং মনে হয়, সেই মারাত্মক ভুল মাপই অজ্ঞাতসারে সাণ্ডো তাঁর 'স্ট্রেংথ্ অ্যাণ্ড হাউ টু অব্টেন্ ইট্' পুস্তকে প্রকাশ ক'রেছিলেন। এই কারণে একদল লোক সাণ্ডোকে ছোট করবার চেষ্টাও যথেষ্ট ক'রেছেন যদিও কোনো অবস্থায়ই সাণ্ডোর খ্যাতি ক্ষুণ্ণ হবার নয়। অতএব, বিভিন্ন মাপ ও তৎসংক্রান্ত আলোচনার দিকে লক্ষ্য রেখে আমি এখানে সাণ্ডোর একটি গ্রহণযোগ্য মাপ উল্লেখ করছি :—

বয়স	৩৫ বছর
ভার	২০০ পাউণ্ড
দৈর্ঘ	৬৯¾ ইঞ্চি
গলা	১৭½ "
বাহু (সংকুচিত)	১৭½ "
গোছা (সংকুচিত)	১৫¾ "
কব্জি	৭½ "
বুক (স্বাভাবিক)	৪৬ "
বুক (প্রসারিত)	৫২ "
কটি	৩২ "
পাছা	৪২ "
উরু	২৬ "
হাঁটু (শক্ত ও সোজা)	১৪ "
মোচা (সংকুচিত)	১৭½ "
নলি	৮½

১৯২৫, ১৪ই অক্টোবর মস্তিষ্কের একটা রক্তকোষ হঠাৎ ফেটে যাওয়ায় লণ্ডন নগরে সাণ্ডোর মৃত্যু ঘটে।

ভুট্টান সিংয়ের অষ্ট্রেলিয়া ভ্রমণ

প্রকৃত পক্ষে প্যারিস প্রদর্শনী থেকে গোলামের ফিরে আসার পর থেকেই ভারতীয় পালোয়ানদের দৃষ্টি খুলে যায় এবং এদেশের অনেকেই পশ্চিম জগতে গিয়ে শক্তি পরীক্ষা দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। অবশ্য বাংলার প্রসিদ্ধ অ-পেশাদার মল্ল কৈলাস বাবা যে ১৯০১ অব্দে ব্রহ্মদেশে গিয়েছিলেন, তাতে তাঁর কোন দিগ্বিজয়ের সংকল্প ছিলনা। তবে বেড়ানোর উদ্দেশ্যে গিয়ে থাকলেও তিনি সেখানে স্থানীয় দু চারজন মল্লের সংগে কুস্তি লড়েছিলেন এবং সর্বত্রই জয়ীও হ'য়েছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁর হাতে পরাজিত ও-সব মল্লের নাম সংগ্রহ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কৈলাস বাবা ব'লেছিলেন যে, সেইসব পালোয়ানেরা গায়ের জোরে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য হ'লেও কুস্তি-বিজ্ঞানে নেহাৎ কাঁচা ছিলেন।

এর পরে দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্যে প্রথম যে দুজন ভারতীয় মল্ল স্বতঃ-প্রবৃত্ত হ'য়ে বিদেশে যাত্রা ক'রেছিলেন, তাঁদের নাম ভূট্টান সিং ও গংগা ব্রাহ্মণ। এঁদের মধ্যে ভুট্টান সিং শ্রেষ্ঠতর মল্ল ছিলেন ব'লে অনুমিত হয়। ১৯০৪ অব্দে এঁরা অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে কয়েকটি কুস্তিতে অবতীর্ণ হন এবং সমস্তগুলিতেই জয়ী হন। সেই সময় ক্লারেন্স্ উয়েবার ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মল্ল। তাঁর সংগেও ভুট্টানের যুদ্ধ হ'য়েছিল। কয়েক মিনিট কুস্তির পরেই ভুট্টান উয়েবারের ঘাড়ে এমন সাংঘাতিক এক প্যাঁচ কস্‌লেন যে, উয়েবার হতচৈতন্য হ'য়ে গেলেন। দেশের শ্রেষ্ঠ মল্লের এই শোচনীয় পরিনামে অস্ট্রেলিয়ানরা কিন্তু স্থির থাকতে পারলনা। তারা দলবদ্ধভাবে উন্মত্তের মতো ভুট্টানকে আক্রমণ করল

এবং এমন বীভৎভাবে আক্রমণ ক'রেছিল যে, পুলিস ও দমকলবাহিনা তাদের তখন না ঠেকালে সেবার হয়তো ভুট্টানের প্রাণ রক্ষা পেতনা। এরপর থেকে ভুট্টান ও গংগা অষ্ট্রেলিয়ায় অত্যন্ত আতংকিত মনেই কুস্তি ল'ড়েছিলেন।

সেই সময় বিশ্ববিশ্রুত রুশ-মল্ল জার্জ হাকেন্সমিথ্ অস্ট্রেলিয়ায় উপস্থিত হন। শীতের সময় একদিন একই সন্ধ্যায় তাঁর সংগে পর পর ভুট্টান সিং ও গংগা ব্রাহ্মণের লড়াই হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে, মাত্র ৯ মিনিটের মধ্যে তাঁরা উভয়েই হাকেন্সমিথের হাতে পরাজিত হন। তখন হাকেন্সমিথের বয়স ছিল প্রায় ২৭ বছর, আর ভুট্টানের বয়স ৪০ বছরের মত এবং গংগার বয়স ছিল ভুট্টানের চেয়ে কম।

প্রসংগক্রমে বলা প্রয়োজন যে, হাকেন্সমিথ্ বিশ্ব জয়ের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর নানা দেশের শ্রেষ্ঠ মল্লদের সহিত শক্তির পরীক্ষায় অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন, বহু দেশ পর্যটনও ক'রেছিলেন। কিন্তু তিনি ভারতবর্ষের দিকে কদাপি পা বাড়াননি। প্যারিসে যখন গোলাম পালোযান উপস্থিত ছিলেন, ইচ্ছা থাকলে হাকেন্সমিথ্ তখন তাঁর সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারতেন। কেননা, ১৯০০, জুন মাসে মস্কোর কুস্তির দংগলে তিনি প্রথম পেশাদার মল্ল হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং তাতে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বলেও স্বীকৃত হ'য়েছিলেন। ৪০ দিন ব্যাপী এই লড়াইর পরে গোলামের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে তাঁর কোনো বাধাই ছিলনা। তবু তিনি তা করেন নি; এমন কি, অন্য সময়ে অন্য কোনো ভারতীয় পালোয়ানের বিরুদ্ধেও তিনি শক্তির পরীক্ষা দেননি যদিও সেই সুযোগ তাঁর সর্বদা যথেষ্টই ছিল

কেউ কেউ বলেন, সেই সময়ে অর্থাৎ ১৯০৪ অব্দে প্রসিদ্ধ জার্মান ভারোত্তোলক আর্থার সাক্সন মান্দ্রাজে এসেছিলেন এবং গোটা কয়েক

ডক্টর রোলারের পরিণাম

ভারতীয় পালোয়ানরা যখন বিদেশে যেতেন, তখন তাঁদেরকে বিদেশী প্রণালীতেই কুস্তি লড়তে হোত। এর ফলে তাঁদেরকে স্বাভাবিক ভাবেই কতকগুলো অসুবিধা ভোগ করতে হোত। যেমন, পাশ্চাত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় কুস্তি 'ক্যাচ্চ্-অ্যাজ্ ক্যাচ্চ্-ক্যান্' প্রণালীতে পরিধেয় ধরা নিষেধ; অথচ, ভারতীয় প্রণালীতে পরিধেয় অর্থাৎ ল্যাংগট ধ'রে বহু রকমের প্যাঁচ লাগাতে হয়। কিন্তু পূর্বোক্ত প্রণালীতে লড়তে গিয়ে সেইসব প্যাঁচকে বাদ দিতে হোত। দ্বিতীয়ত, ভারতীয়রা আল্‌গা বা ঝুড়ো মাটিতে লড়তে অভ্যস্থ; অথচ পশ্চিমী নিয়মে তাঁদেরকে মোটা গদীর ওপর লড়তে হোত। তৃতীয়ত, ভারতীয়রা নগ্নপদে কুস্তিতে অবতীর্ণ হ'লেও পশ্চিমী মল্লরা সব সময়েই জুতো প'রে লড়তো। এতেও ভারতীয়দের যথেষ্ট অসুবিধা হোত। চতুর্থত, ভারতীয় নিয়মে দুজন মল্লের মধ্যে মাত্র একবার লড়াই হয় এবং তাতেই জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়। কিন্তু পশ্চিমা নিয়মে দুবার যুদ্ধ হয় এবং একজন দুবার জয়ী হ'লে তবেই তাকে জয়ী ঘোষণা করা হয়। আর যদি দুজন দুবার জয়ী হয়, তবে তৃতীয়বার লড়াইর ফলাফলের ওপর শেষ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পঞ্চমত, ভারতীয় নিয়মে একজনের দুটি স্কন্ধ এককালীন ভূমিস্পৃষ্ট হ'লে তাকে পরাজিত গণ্য করা হয়; আর পশ্চিমী নিয়মে মোটের ওপর কারু দুটি স্কন্ধ ও নিতম্বের একটি দিক ধরাতলবদ্ধ হ'লে পরাজিত গণ্য করা হয়। এসব ছাড়া, ছোটো-খাটো আরো কতকগুলো ব্যতিক্রম আছে, যা ততটা উল্লেখযোগ্য নয়।

গামা ও ডক্টর রোলারের কুস্তি হ'য়েছিল 'ক্যাচ্চ্-অ্যাজ্ ক্যাচ্চ্-ক্যান্' ঢংয়ে। ডক্টর রোলারের দেহ ছিল দৃঢ়বদ্ধ এবং পৈশিক, অথচ

গামার দেহ মেদবহুল নিটোল ছিল। কিন্তু গামার ধীর স্থির ও গাম্ভীর্যপূর্ণ চালচলনের মধ্যে তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল। কয়েক মিনিট কুস্তির পরেই দেখা গেল, ডক্টর রোলার নীচে প'ড়ে গেছেন এবং একটা অস্ফুট ধ্বনি করে চিৎ হ'য়ে গেছেন। মধ্যস্থ ও চিকিৎসকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন, তাঁর পাঁজরে চোট লেগেছে। দ্বিতীয় বারের যুদ্ধেও গামাই জয়ী হ'লেন। শ্বেতাংগ দর্শকরা ডক্টর রোলারের পরাজয়ে হতভম্ব হ'য়ে গেলেন! ডাক্তারি পরীক্ষায় পরে ধরা পড়ল, ডক্টর রোলারের দুখানা পাঁজরের হাড় ভেংগে গেছে!

২৭ এ অগাস্ট বোল্টন সহরে বৃটেনের খ্যাতনামা মল্ল জ্যাক্ উইন্‌রোকে দাঁড় করানো হ'য়েছিল ভুট্টান সিংয়ের বিরুদ্ধে। মধ্যস্থ হিসাবে দাঁড়িয়েছিলেন জ্যাক্ স্মিথ্, সুবিচারের জন্য যাঁর নাম প্রসিদ্ধ ছিল। কুস্তির সুরুতেই উইন্‌রো বুঝলেন, ভুট্টান সিং সাধারণ পাত্র নন, গায়ের জোরে এবং কুস্তি কৌশলে বাস্তবিকই তিনি অনেক বড়। কাজেই তাঁকে জব্দ করার জন্য ল্যাংকেস্টার-মল্ল প্রথম থেকেই যে অবৈধ ও অন্যায় মার-পিট সুরু করলেন, তাতে সাহেব দর্শকরা পর্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে উঠলেন। শেষে রদ্দা, পট্টি, যেস্তা, ঝাপড় ইত্যাদি ছেড়ে যখন তিনি কান ডলা, নাক ডলা এবং চুল ছেঁড়া সুরু করলেন, তখন মধ্যস্থ মিঃ স্মিথ্ ২ ঘণ্টা ৩৭ মিনিটে কুস্তি বন্ধ ক'রে ভুট্টানকে জয়ী ঘোষণা করলেন; আর সংগে সংগে সমগ্র জনতা সোল্লাসে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন।

গামা-বিস্কো কুস্তি প্রহসন

সেই সময় পোল্যাণ্ডের বিশ্ববিশ্রুত মল্ল স্টানিস্‌লস্‌ বিস্কো এলেন লণ্ডনে এবং 'স্পোর্টিং লাইফ্‌' কাগজের ব্যবস্থায় তিনি গামার সহিত কুস্তি লড়তে প্রস্তুত হ'লেন। ইংল্যাণ্ডের সর্বত্রই তখন একটা ভারত-ভীতির সূত্রপাত হ'য়েছে, বিস্কোর আবির্ভাবেও তা কাটলনা। এদিকে ডক্টর রোলার কিন্তু তাঁর পরাজয়কে সত্য ব'লে অস্বীকার করতে লাগলেন। তিনি বল্‌তে লাগলেন যে, তাঁর পরাজয়টা নেহাৎ আকস্মিকভাবে ঘটেছিল এবং ইচ্ছা করলেই পশ্চিমের বড় বড় মল্লরা ভারতীয়দের আশা-আকাংখার সমাধি ঘটাতে পারেন। তিনি গামা ও বিস্কোর তুলনামূলক আলোচনা প্রসংগে দৃঢ়ভাবে বল্‌লেন যে, তিনি নিজে ইতিপূর্বে বিস্কোর সংগে তিনবার এবং গামার সংগে একবার ল'ড়েছেন। কাজেই, তিনি হল্‌প্‌ ক'রে বল্‌তে পারেন যে, গামার সংগে যুদ্ধে বিস্কো নিশ্চিতই জিত্‌বেন। কেননা, দমের ক্ষমতায় বিস্কো গামার চেয়ে যদি শ্রেষ্ঠতর না-ও হ'য়ে থাকেন, অন্তত কুস্তি লড়ার জ্ঞানে তিনিই শ্রেষ্ঠতর। ডক্টর রোলারের এই ধরণের প্রচার কার্যের ফলে সমগ্র পশ্চিম জগত সেই আসন্ন ১০ই সেপ্টেম্বরের দিকে আশান্বিত হ'য়ে তাকিয়ে রইল যেদিন গামা ও বিস্কোর মধ্যে শক্তির পরীক্ষা হবে।

গামা ও বিস্কোর যুদ্ধে বাজি ছিল 'জন্‌ বুল্‌ প্রাধান্য পেটি' নামে সোনার একটি কোমরবন্ধ এবং নগদ ২৫০পাউণ্ড। এই দুইটি জিনিষই বিজয়ীর প্রাপ্য ব'লে স্থিরীকৃত ছিল। ১০ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে লণ্ডন নগরে আল্‌হাম্‌ব্রা টুর্ণামেণ্ট উপলক্ষে নির্মিত একটি বিরাট স্টাডিয়ামে এই প্রতিযোগিতা হয়। এইদিন কুস্তি সুরু হবার বহু পূর্ব থেকেই স্টাডিয়ামের

শেষ আসনটি পর্যন্ত লোকে পূর্ণ হ'য়ে গিয়েছিল। যথাসময়ে গামা ও বিস্কো আসরে নামলেন; দর্শকরা বিস্কোকে দেখে বাস্তবিকই খুসী হোল; কেননা, দৃশ্যত গামার তুলনায় বিস্কো বিরাটতর ছিলেন দৈর্ঘ ও প্রস্থ, দু দিক থেকেই। কিন্তু কুস্তি সুরু হবার সংগে সংগেই দর্শকরা আবার হতাশ হ'য়ে পড়ল। কেননা, তারা অবাক বিস্ময়ে দেখ্‌ল, গামার আক্রমণ এড়ানোর জন্য বিস্কো মঞ্চের ধারে ধারে ছুটছেন এবং শেষে দাঁড়িয়ে থাকা দুঃসাধ্য বিবেচনায় তিনি মাটিতে উপুর হ'য়ে পড়লেন। সেই অবস্থায় গামা তাঁর পিঠে চ'ড়ে তাঁকে ওল্টানোর জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে লাগলেন। বিস্কো তাঁর বিরাট দেহভারকে কেন্দ্রীভূত ক'রে এমনভাবে প'ড়ে রইলেন যে, গামার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'তে লাগল,—কিছুতেই তিনি তাঁকে চিৎ করতে পারলেন না! বিস্কোর এই 'কূর্মাবতারে' বিরক্ত হ'য়ে শেতাংগ দর্শকরা পর্যন্ত লজ্জিত ও বিরক্ত হ'য়ে চেঁচিয়ে বল্‌তে লাগলেন, "উঠে দাঁড়িয়ে মরদের মতো লড়ো! বেলুনের মতো প'ড়ে থেকে জাতির কংলক আর বাড়িও না।" কিন্তু কে কার কথা শোনে? বিস্কোর তখন 'কানে দিয়েছি তুলো, পিঠে বেঁধেছি কুলো' গোছের অবস্থা আর কি! তিনি ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন, আর একবার দাঁড়ালেই তাঁর পরাজয় অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে!

এদিকে ক্রমশই দিনের আলো নিষ্প্রভ হ'য়ে এলো; ফলে ২ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে এই কুস্তি সেদিনকার মতো বন্ধ করে পরবর্তী ১২ই সেপ্টেম্বর পুনরায় হবে বলে ঘোষণা করা হোল।

১২ই সেপ্টেম্বর গামা তো উপস্থিত হ'লেন; কিন্তু বিস্কো কোথায়? ডক্টর রোলারের আশা-আকাংখায় 'ছাই' ঢেলে দিয়ে বিস্কো তখন পালিয়েছেন! অগত্যা কর্তৃপক্ষ বিস্কোকে পরাজিত গণ্য ক'রে গামাকে বিজয়ীর প্রাপ্য সমস্ত পুরস্কার দিয়ে দিলেন। অবশ্য গামা

নিজে এই বিনা যুদ্ধে জয়ী হওয়ায় মনে মনে খুসী হ'তে পারেননি। শেষে এই ঘটনার আঠারো বছর পরে গামা দ্বিতীয়বারের যুদ্ধে বিস্কোকে বিনা ক্লেশে সম্পূর্ণরূপে চিৎ ক'রে তৃপ্ত হ'য়েছিলেন, সে-কথা পরে যথাসময়ে বলা হবে।

গামার 'এক ল্যাংগটি' আহ্বান

বড় বড় পালোয়ানদের মধ্যে 'এক ল্যাংগটি' আহ্বান একটা বিশেষ গৌরবের বিষয়। এই আহ্বানের অর্থ এই যে, আহ্বানকারী ল্যাংগট প'রে মল্লক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে থাকবেন এবং পর পর নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিযোগী এসে তাঁর সংগে লড়াই করবে। প্রতিযোগীদের সংগে লড়বার জন্য আহ্বানকারী তাঁর ল্যাংগট বদল করবেন না। এদেশে এই ধরনের যুদ্ধের নাম 'এক ল্যাংগটি' লড়াই—ইওরোপ ও অ্যামেরিকায় এই লড়াই 'নন্-স্টপ্ রেস্ট্লিং কন্টেস্ট' নামে পরিচিত। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বীরগণ শুধু এই ধরণের প্রতিযোগিতা করতে পারেন। নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি থেকে দেখা যায়, রুশ-মল্ল জর্জ্জ হাকেন্সমিথ্ পৃথিবীতে সর্বপ্রথম এই ধরণের লড়াই ক'রে জয়ী হ'য়েছিলেন। তবে তাঁর প্রতিপক্ষদের মধ্যে কেউ লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন না। জার্মান মল্ল ক্রেমারও এই ধরনের লড়াইয়ে জয়ী হ'য়েছিলেন; আর জাপানের প্রখ্যাতনামা যুযুৎসুবিদ্ রাকুও এইরূপ যুদ্ধে জয়ী হ'য়েছিলেন। গামা তাঁর জীবনে দুবার এরূপ আহ্বান জ্ঞাপন ক'রেছিলেন বটে, কিন্তু কোনোবারই তাঁর প্রতিপক্ষগণ লড়াইতে অবতীর্ণ হয়নি।

গামার দল যখন লণ্ডনে গিয়েছিলেন, তখন জাপানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যুযুৎসুবিদ্ তারো মিয়াকে ২৯জন যুযুৎসুবিদ নিয়ে লণ্ডনে উপস্থিত ছিলেন এবং কিছুদিন পূর্ব থেকেই তিনি স্থানীয় মল্লদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছিলেন। তাঁরও পূর্বে উকিও তানি এবং রাকুর কীর্তি দ্বারা প্রমাণিত হ'য়েছিল যে, কুস্তির চেয়ে বিদ্যা হিসাবে যুযুৎসুই শ্রেষ্ঠতর। তারো মিয়াকে এইজন্যই অতি সহজে লণ্ডনে এক বিশেষ সম্মানের অধিকারী হ'য়েছিলেন। কিন্তু বিদ্যা হিসাবে যুযুৎসু শ্রেষ্ঠতর হ'লেও যুযুৎসুবিদরা মল্লদের সংগে সব সময়েই লড়াইয়ে জয়ী হ'তে পারেন না। কারণ, কায়িক ভার ও শক্তিতে তারা অধিকাংশ সময়েই মল্লদের সমকক্ষ নন। অতএব গামা এই জ্ঞান এবং আত্ম-বিশ্বাসের ওপর নির্ভর ক'রে একদিন সদলবলে তাঁরো মিয়াকেকে 'এক ল্যাংগটি' আহ্বান করে ঘোষণা করলেন যে, তাঁদের এই ৩০ জনের দলকে তিনি এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে হারিয়ে দেবেন অর্থাৎ তিনি প্রত্যেককে পরাস্ত করবার জন্য গড়ে মাত্র দু মিনিট ক'রে সময় নিয়েছিলেন। এই সাংঘাতিক আহ্বানে মিয়াকে বাস্তবিকই প্রমাদ গুন্‌লেন এবং শেষে ভয়ে ভয়ে পিছিয়ে গেলেন।

গামার বৈশিষ্ট্য

গামার বাবা রহিম নুন কুস্তিতে খ্যাতি লাভ ক'রেছিলেন বটে, কিন্তু গামার কুস্তি শিক্ষা তাঁর হাতে হয়নি,—হ'য়েছিল প্রসিদ্ধ হিন্দু মল্ল 'মাধব সিংয়ের হাতে। একেবারে গোড়া থেকেই কুস্তিতে গামার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল এবং প্রথম থেকেই তিনি পর পর

সব প্রতিযোগিতায় জয়ী হ'য়ে আসছিলেন। প্রায় ২০ বছর বয়স থেকে তিনি ভারতবর্ষে প্রবীণ মল্লদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ; কিন্তু সেই সময়ে তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য মল্লরাও সাধারণ ছিলেন না। কাজেই এই তরুণ উদীয়মান মল্লদের মধ্যে কে শেষ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠতম ব'লে পরিগণিত হবেন, তা নিয়ে বহু জল্পনা-কল্পনা চল্‌তে থাকে।

আরো পরে পরস্পর শক্তি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তিনজন মাত্র শ্রেষ্ঠ মল্ল সকলের ঔৎসুক্যের বিষয় হ'য়ে দাঁড়ালেন ; এঁরা হ'লেন গামা, লাহোরের গোলাম মহিউদ্দিন এবং অমৃতসরের আহমদ্ বখ্‌শ্। এটা প্রায় ১৯০৫ অব্দের কথা। কিন্তু সেই সময়ে গামা ও আহমদ্ বখ্‌শ্ একই আখড়ার ছাত্র ব'লে পাঞ্জাবী পালোয়ানদের প্রচলিত রীতি অনুসারে তাঁদের মধ্যে কোনো কুস্তি প্রতিযোগিতা সম্ভব ছিল না। ফলত গামা ও গোলাম মহিউদ্দিনের মধ্যে একটা শক্তি পরীক্ষা করানোর জন্য প্রবীণ মল্লরা বিশেষ উৎসুক হ'য়ে ওঠেন। ১৯০৯ অব্দে এই লড়াই সংঘটিত হয় এবং তাতে গামা মহিউদ্দিনকে হারিয়ে দিয়ে শ্রেষ্ঠতর মল্ল ব'লে স্বীকৃত হন।

সব রকম যুদ্ধেই প্রধানত দুটি নীতি থাকে ; একটি আক্রমণাত্মক, অপরটি আত্মরক্ষাত্মক। কুস্তিতেও এর ব্যতিক্রম নেই। কুস্তির সব রকম মার-প্যাঁচ এবং কায়দা-কৌশল গামার আয়ত্তাধীন বটে, কিন্তু আত্মরক্ষাত্মক লড়াইতে তাঁর মতো দক্ষ মল্ল পৃথিবীতে আর কেউ নেই। গামার প্রায় সমকক্ষ ক্ষমতাবান কোনো মল্ল যদি কুস্তিতে নেমে গামাকে আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণে বাধ্য করতে পারেন, তবে সে কুস্তি সমান যেতেও পারে ; কিন্তু কেউ যদি কুস্তিতে নেমে নিজেই আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করেন, তবে গামার হাতে তাঁর পরাজয় মুহূর্তেই নিশ্চিতভাবে ঘ'টে যাবে। গামার এই বৈশিষ্ট্য বিশ্ব-বিখ্যাত হ'য়ে গেছে।

তারপরে তাঁর দেহ। সাধারণত ভারতবর্ষীয় পালোয়ানদের দেহ-মেদবহুল হ'য়ে থাকে। কিন্তু গামার দেহ মেদবহুল হ'য়েও দৃঢ়বদ্ধ। তাঁর দেহের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রায় ২০ বছর থেকে ৬০ বছর পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ৪০ বছর কাল তিনি তাঁর দেহের বাঁধুনী একই রকম অটুট রেখেছিলেন। এমন কি, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাঁর দেহের বিভিন্ন অংশের মাপেও বিশেষ কোনো পার্থক্য ঘটেনি। ১৯১০ অব্দে লণ্ডনে প্রথমে তাঁর দেহের মাপ নেবার দীর্ঘকাল পরে ১৯৩৩, ৫ই জানুয়ারি কলিকাতায় দ্বিতীয়বার আমি নিজে তাঁর মাপ নিয়েছিলাম এবং ভারতে ওটাই তাঁর প্রথম মাপ নেওয়া হ'য়েছিল। এখানে আমি দুটো মাপই পাশাপাশি তুলে দিচ্ছি :—

বয়স	৩০ বছর	৫২ বছর
ভার	*	২৩৯ পাউণ্ড
দৈর্ঘ	৬৭½ ইঞ্চি	৬৭½ ইঞ্চি
গলা	১৮ ইঞ্চি	১৭½ ,,
বাহু (সংকুচিত)	১৮ ইঞ্চি	১৭½ ,,
গোছা (স্বাভাবিক)	১৪ ইঞ্চি	১৩¼ ,,
গোছা (সংকুচিত)	*	১৪¾ ,,
কব্জি	*	৮ ,,
বুক (স্বাভাবিক)	৪৮ ইঞ্চি	৪৯¼ ,,
বুক (প্রসারিত)	*	৫০½ ,,
কটি	*	৪১ ,,
পাছা	*	৫৪ ,,
উরু	২৭ ইঞ্চি	২৭ ,,
হাঁটু (সোজা ও শক্ত)	*	১৬¼ ,,
মোচা (স্বাভাবিক)	*	১৫¼ ,,
মোচা (সংকুচিত)	*	১৬½ ,,
নলি	*	৯ ,,

গামার বাহুরও এক বৈশিষ্ট্য আছে। বাহুর সংকুচিত মাপ নিতে হ'লে সাধারণত' কনুই মুড়ে বাইসেপ্ পেশীর ওপর দিয়ে মাপ নিতে হয়। কিন্তু পালোয়ানদের ঐ নিয়মে বাইসেপ্ পেশীর মাপ না বেড়ে বরং ক'মেই যায়। কেননা, তাঁরা বাইসেপ্ পেশীর উন্নতির জন্য বিশেষ কোনো চেষ্টা করেন না। বরং তাঁরা ক্রমাগত মালিশ ক'রে ক'রে পেশীর কাঠিন্য দূর ক'রে তাকে অপেক্ষাকৃত শিথিল অবস্থায় আনেন। পক্ষান্তরে, তাঁরা ট্রাইসেপ্ পেশীর উন্নতির জন্য নানাভাবে চেষ্টা ক'রে থাকেন। এইজন্য মল্লদের সংকুচিত্ত বাহুর ক্ষেত্রে সব সময়েই আমি তাঁদের বাহু পার্শ্বে ঝুলানো অবস্থায় ট্রাইসেপ্ পেশীর সংকোচন করিয়ে মাপ নিয়ে থাকি। গামার ট্রাইসেপ্ পেশীর গঠন চমৎকার। এ পেশীকে তিনি ১৭ থেকে ½ ইঞ্চি বাড়িয়ে ১৭½ ইঞ্চি ক'রেছিলেন যদিও পেশী নিয়ন্ত্রণের কোনো কায়দাই তাঁর জানা ছিল না। তাঁর শিথিল বাহুর সাধারণ মাপই ছিল ১৭ ইঞ্চি! সহজ কথা নয়।

এই প্রসংগে আর একটি জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, ভারতীয় মল্লরা হাতের গোছা (Forearm) এবং পায়ের মোচার (Calf) পরিপুষ্টির জন্য কিছুমাত্র মনোযোগ দেননা। পক্ষান্তরে, তাঁদের প্রধান নজর থাকে ঘাড়, বাহু, বুক, পিঠ, পেট এবং উরুর দিকে। এজন্যই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভারতীয় মল্লদের গোছা ও মোচা অপেক্ষাকৃত কম পুষ্ট থাকে।

গামার আরো একটি বৈশিষ্ট্য তাঁর চেহারার তারুণ্যে। আমি যখন তাঁকে শেষবার দেখি, তখন তাঁর বয়স ছিল ৬১ বছর ; কিন্তু দৃশ্যত তখনো তাঁকে ৪৫ বছরের নিম্ন বয়স্ক যুবকের মতো মনে হয়েছিল। অবশ্য দেশ-বিভাগের পরে তাঁর আর্থিক দুর্গতি হয়েছে যথেষ্ট, এবং তার ফলে এখন তাঁর দেহের কি পরিণতি ঘ'টেছে, তা জানি না। তিনি এখন পাকিস্থানের অধিবাসী।

• •

গামার বিষয়ে সর্বশেষ কথা এই যে, মল্ল হিসাবে তিনি জীবনে কখনো কারু কাছেই পরাজয় স্বীকার করেননি ; কেননা, একমাত্র গোংগা ছাড়া তাঁর সমকক্ষ অন্যান্য মল্লরা প্রায় সকলেই তাঁর নিজ দলীয়।

ইমামের বিজয় অভিযান

যে সময়ে লণ্ডনে গামা ও বিস্কোর মধ্যে কুস্তির চুক্তি হয়, সেই সময়ে স্বিট্‌জার্ল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ মল্ল জন্ লেম্ লণ্ডনে উপস্থিত হন। যদিও গামার সংগেই তাঁর লড়বার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু গামাকে বিস্কোর সংগে চুক্তিবদ্ধ দেখে তিনি গামারই পরবর্তী শ্রেষ্ঠ মল্ল হিসাবে ইমামকে প্রতিদ্বন্দ্বী বেছে নেন। এর দু বছর আগে লেম্ প্রসিদ্ধ 'হেংলার সার্কাসে' কুস্তি প্রতিযোগিতায় 'বিশ্বের কুস্তি প্রাধান্য' লাভ ক'রেছিলেন। ইমামের সংগে লড়বার পূর্বে তিনি দম্ভ ক'রে ব'লেছিলেন যে, তখন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় চল্‌ছে এবং তাঁর দৈহিক উৎকর্ষ তখন চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে গেছে। অতএব এই লড়াইয়ে জয়লাভ বিষয়ে তিনি সুনিশ্চিত। কিন্তু এই 'চূড়ান্ত দৈহিক উৎকর্ষ' নিয়েও লেম্ ইমামের বিরুদ্ধে কি ক'রেছিলেন ?

গামা ও ইমামের তুলনামূলক আলোচনা প্রসংগে বলা চলে যে, মল্ল হিসাবে গামার মর্যাদা বেশী হ'লেও ক্ষমতা হিসাবে এঁরা দুজনই প্রায় সমান ছিলেন। তবে দুজনের কুস্তির ধারা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা অর্থাৎ গামা যেমন আত্মরক্ষাত্মক কুস্তিতে পৃথিবীতে অতুলনীয় ছিলেন, ইমাম তেমনি আবার আক্রমণাত্মক লড়াইয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। কিন্তু তখনো পর্যন্ত ইওরোপীয় মল্লরা দুই ভ্রাতার এই দুই বিপরীত কুস্তি প্রতিভার কথা জানতেন না। কাজেই বিস্কোকে আত্মরক্ষাত্মক কুস্তির

দ্বারা গামার আক্রমণাত্মক কুস্তিকে বানচাল করতে দেখে লেম্ স্বাভাবিকভাবেই এক অসংশোধনীয় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হ'য়েছিলেন।

কুস্তির সুরুতে লেম্ যখন বুঝলেন, ইমাম তাঁর চেয়ে সবলতর, তখন তিনিও পরাজয় এড়াবার উদ্দেশ্যে বিস্কোর পন্থায় গদী চেপে পড়লেন। ফলে, ইমামও আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেলেন এবং মাত্র ৩ মিনিট ১ সেকেণ্ডের মধ্যেই লেম্‌কে চিৎ ক'রে দিলেন! কিন্তু লেম্ ভাবলেন উল্টো! তিনি মনে করলেন, হয়তো তাঁর নিজের অসাবধানতার জন্যই এই বিপর্যয় ঘটল। অতএব দ্বিতীয়বার হাত মিলানোর পরেই ক্ষিপ্রতার সংগে এবং সতর্কতার সংগেও বটে, তিনি পুনরায় মাটিতে পড়লেন। তার ফলে ইমাম আরো ত্রস্ত অর্থাৎ মাত্র ১ মিনিট ৮ সেকেণ্ডের মধ্যে লেম্‌কে উল্টে ফেলে দিলেন!

এই ঘটনার পরে পশ্চিমী মল্ল-সমাজ প্রায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে গেলেন। তথাপি খুঁজে খুঁজে তাঁরা নিয়ে এলেন আইরিশ্ মল্ল প্যাট্ কনোলিকে ইমামের বিরুদ্ধে। ইমাম তাঁকেও ১০ মিনিটেই পরাজিত ক'রে দিয়েছিলেন।

সেই সময়ে ইওরোপ ও অ্যামেরিকার দুই শ্রেষ্ঠ মল্ল হাকেন্সমিথ এবং ফ্র্যাংক অ্যাল্‌বার্ট গচ্চ্ সমগ্র পশ্চিম জগতের কাছে অতুলনীয় ব'লে সমাদৃত ছিলেন। এই উভয়ের মধ্যেও আবার গচ্চ্ই ছিলেন শ্রেষ্ঠতর; কেননা, তিনি ১৯০৮ অব্দে ও ১৯১১ অব্দে দুবারই হাকেন্স্‌মিথ্‌কে হারিয়েছিলেন। ভারতীয়দের ইচ্ছা ছিল এতদুভয়ের সংগে শক্তির পরীক্ষা দেবেন, কিন্তু গচ্চ্ ও হাকেন্স্‌মিথ্ দুজনই এমন সব কঠিন কঠিন সর্ত উপস্থিত করলেন যে, ভারতীয়দের পক্ষে সেই সর্ত মেনে নেওয়া সম্ভব হোলনা। এর পরেই ভারতীয় মল্লরা দেশে ফিরে আসেন।

ইমামের বৈশিষ্ট্য

গামার মতো তাঁর ভাই ইমাম বখ্‌শেরও গোটাকয়েক বৈশিষ্ট্য ছিল।

ইমাম বখ্‌শও প্রথম অবস্থায় মাধব সিংয়ের কাছেই কুস্তি শিক্ষা সুরু করেছিলেন। তারপরই তাঁর বেশীর ভাগ শিক্ষা হয় গামার হাতে।

ইমামের দৈহিক গঠন ছিল অশ্চর্য রকমের। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁর দেহ গামার দেহের মতো পেশল ও দৃঢ়বদ্ধ ছিল না; বরং গামার চেয়ে দীর্ঘতর হ'য়েও ইমামের গোটা কয়েক অংগ-প্রত্যংগের মাপ গামার চেয়ে কম ছিল। তাঁর এই দীর্ঘ শিথিল দেহ অধিকাংশ সময়েই বৈদেশিক মল্লদের ধোকা দিয়ে এসেছে অর্থাৎ ইমামকে দেখে কখনো প্রচণ্ড বলী মনে হয়নি। তাছাড়া, মল্লক্ষেত্রে তাঁর ক্ষিপ্রতা কতো ভীষণ, মল্লক্ষেত্রের বাইরে তা একেবারেই বোঝা যেতনা। তাই লণ্ডন অভিযানের পরে ও-দেশের কাগজ-পত্রিকাগুলি সভয়ে তাঁর নাম দিয়েছিল 'দি প্যান্থার'।

১৯৫৩, ৫ই জানুয়ারি কলিকাতায় আমি তাঁরও মাপ নিয়েছিলাম এবং এর আগে এদেশে আর কেউ তাঁর মাপ নেননি। মাপটি এই :—

বয়স	৪৭ বছর
ভার	২৪২ পাউণ্ড
দৈর্ঘ	৭০ ইঞ্চি
গলা	১৮ "
বাহু (স্বাভাবিক)	১৫½ "
বাহু (সংকুচিত)	১৬ "
গোছা	১২¾ "

কব্জি	৮½ ”
বুক (স্বাভাবিক)	৪৬½ ”
বুক (প্রসারিত)	৪৯ ”
কটি	৪০ ”
পাছা	৪৪ ”
উরু	২৯ ”
হাঁটু (সোজা ও শক্ত)	১৭ ”
মোচা (স্বাভাবিক)	১৬ ”
মোচা (সংকুচিত)	১৭ ”
নলি	৯¾ ”

আমি সাধারণত প্রত্যেকেরই ডান হাত ও ডান পায়ের মাপ নিয়ে থাকি। কিন্তু ইমামের ডান বাহুর মাপ ১৫½ ইঞ্চি হ'লেও তাঁর বাম বাহুর মাপ ছিল একটু বেশী, ১৫½ ইঞ্চি। তাঁর উর্ধাংগ থেকে নিম্নাংগ অপেক্ষাকৃত বেশী পুষ্ট ও মজবুত।

তৃতীয় অধ্যায়

শীর্ষস্থানাধিকার

(১৯১১—১৯৩৫)

আহমদের ডেরিয়াজ বিজয়

গামা, ইমাম ইত্যাদির বিজয় অভিযানের পরে ভারতীয় মল্ল-সমাজ অত্যন্ত চঞ্চল হ'য়ে উঠল ; কেননা সেই সময়ে গামা ও ইমামের সমকক্ষ বা নিকটবর্তী বহু মল্ল এদেশে ছিলেন। এঁদের মধ্যে লাহোরের গোলাম মহিউদ্দিন এবং অমৃতসরের আহমদ বথ্‌শের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফলে, এক বছর না যেতেই ১৯১১ অব্দে মান্দ্রাজের প্রসিদ্ধ ব্যায়ামী রামমূর্তি নাইডুর পরিচালনায় আর একটি ভারতীয় পালোয়ানের দল লণ্ডন উপস্থিত হন। এই দলে গোলাম মহিউদ্দিন এবং আহমদ ছাড়াও কালা পরতাপ, রম্‌জান, মজিদ, ছাগা, তিলা ইত্যাদি অনেকে ছিলেন।

মল্ল হিসাবে এমিল্‌ ও মরিস্‌ ফ্রান্সের ডেরিয়াজ বংশীয় দুই ভ্রাতার খ্যাতি তখন সারা ইওরোপে পরিব্যাপ্ত। এঁদের মধ্যে কনিষ্ঠ মরিস্‌ ছিলেন অধিকতর ক্ষমতাবান এবং তিনি হাকেন্সমিথ্‌, বিস্কো, লেম্‌ ইত্যাদির সংগে লড়াই করে যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাছাড়া, ভারতোলায়ও তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। কিন্তু সবচেয়ে তাঁর দক্ষতা ছিল মল্ল-সেতুতে (Wrestler's Bridge)।

পশ্চিমী কুস্তি-বিজ্ঞানের সংগে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা নিশ্চয়ই মল্ল-সেতু কি, তা জানেন। ভারতবর্ষীয় পালোয়ানেরা আজো পর্যন্ত এ জিনিষটির বিশেষ অনুশীলন করেন না। কিন্তু ও-দেশের প্রত্যেক মল্ল এ প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত যত্নের সংগে নিরন্তর অভ্যাস ক'রে থাকেন। কুস্তি লড়তে লড়তে যখন কারু চিৎ হয়ে যাবার আশংকা দেখা দেয়, তখন সেই বিপজ্জনক মুহূর্তে শুধু মাথা আর পায়ের পাতায় ভর দিয়ে কাঁধ, পিঠ ও কোমরকে উঁচু ক'রে রাখার নাম মল্ল-সেতু। অনেক সময় প্রতিপক্ষকে

অতর্কিতে চিৎ করার জন্যও মল্ল-সেতু করা হয়। পশ্চিমী মল্লরা এরূপ অবস্থায় অনায়াসে বুক ও পেটের ওপর ১০।১২ মণ ভার গ্রহণ করতে পারেন অথবা বুক বা পেটের ওপর একই সংগে দু চারটে লোকের যথেচ্ছ লাফালাফিকেও অম্লানবদনে সহ্য করতে পারেন। এমন কি, তাতে তাঁদের সেতু একটু দোলেও না। মরিস্ ডেরিয়াজের এই সেতু ছিল পশ্চিম জগতে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। অতএব আহ্‌মদ বখ্‌শের সংগে মরিস্ ডেরিয়াজের কুস্তি হবার কথা ঘোষিত হবার পরে এক প্রশ্নের উত্তরে মরিস্ ব'লেছিলেন, "হাঁ, ভারতীয় পালোয়ানেরা কুশলী হ'তে পারেন; কিন্তু আমার বাহুতেও কম জোর নেই। তাছাড়া, আমার মল্ল-সেতু তো আজো পর্যন্ত কেউ ভাংতে পারেনি।"

কুস্তির পূর্বে দেখা গেল, আহ্‌মদের চেয়ে ডেরিয়াজ ১১ পাউণ্ড বেশী ভারী এবং কোমর ছাড়া দেহের অন্যান্য অংশের মাপও তাঁরই বেশী; মোট কথা, দৈহিক গঠনে ডেরিয়াজ অত্যন্ত চমৎকার ছিলেন। তাঁর চোখেমুখেও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের ছাপ ছিল। আর আহ্‌মদের দৃষ্টি ছিল নিরুদ্বেগ ও শান্ত। ডাক্তারি পরীক্ষায় দেখা গেল, দুজনের হৃদ্‌যন্ত্রের গতিও স্বাভাবিক। সাধারণত প্রতিযোগিতার পূর্বে প্রত্যেক প্রতিযোগীর হৃদ্‌যন্ত্রের গতি স্বাভাবিক থাকা বাঞ্ছনীয়। কেননা শংকা, ভয়, উত্তেজনা, উদ্বেগ বা অতি উৎসাহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরাজয় ডেকে আনে। এই হিসাবে কুস্তির আগে আহ্‌মদ এবং ডোরয়াজ দুজনই ত্রুটিহীন ছিলেন।

কার্যকালে কুস্তি কিন্তু বেশীক্ষণ চল্‌ল না। ডেরিয়াজ আহ্‌মদের কাছে দুবারে যথাক্রমে ১ মিনিট ৬ সেকেণ্ড এবং ৩ মিনিট ১৯ সেকেণ্ডে পরাজিত হয়ে যান। মধ্যস্থ মিঃ ভিভিয়ান হলেণ্ডার ব'লেছিলেন, "প্রথম কুস্তিটা এমন ঝট্‌পট্‌ হয়ে গেল যে, আমি এই ১ মিনিট ৬ সেকেণ্ডের ঠিক বিবরণ দিতে পারবো না। আমার মনে হয়, অন্তত ৩৫ সেকেণ্ড

দুজনার মধ্যে সামান্য ঠেলাঠেলিতে ব্যয় হয় এবং তারপরই ভারতীয়টি বিদ্যুতের মতো তাঁর প্রতিপক্ষের ওপর চেপে বসলেন।" মুহূর্তের মধ্যে ডেরিয়াজের মনের সমস্ত বল নষ্ট হয়ে গেল এবং দ্বিতীয় কুস্তিতেও হারবার লক্ষণ তাঁর চোখে-মুখে স্পষ্ট দেখা দিল! ডেরিয়াজের এই শোচনীয় অবস্থা লক্ষ্য ক'রে মধ্যস্থ মিঃ হলেণ্ডার দ্বিতীয় কুস্তির মিনিট তিনেক আগে ডেরিয়াজকে বিশ্রামের জন্য আরো সময় চাই কিনা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। ডেরিয়াজ শুধু বলেছিলেন, "না"। কিন্তু তাঁর হাবভাব ছিল অত্যন্ত উদ্বেগ ও উত্তেজনাপূর্ণ; মিঃ হলেণ্ডার বলেছেন, ডেরিয়াজের যে বিশ্রাম নেবার প্রয়োজন ছিল না, এমন নয়; কিন্তু যেহেতু তিনি বুঝেছিলেন, কিছুতেই তিনি পরাজয় এড়াতে পারবেন না, সেই হেতুই তিনি চেয়েছিলেন, যা হবার তা তাড়াতাড়িই হয়ে যাক্।

দ্বিতীয় কুস্তির সুরুতে আহমদ্ ডেরিয়াজের সংগে দস্তুরমতো ছেলেমানুষী খেলা শুরু করলেন। কেননা, তিনি নিশ্চতই বুঝেছিলেন, ডেরিয়াজ তাঁর সমকক্ষ নন। কিন্তু আহমদ খেলার ছলে কুস্তি লড়লেও ডেরিয়াজকে বার দুই প্রবল প্রয়াসে আহমদের কাছে আত্মরক্ষা করতে হয়েছিল। বার দুই তিনি মল্ল-সেতুও করেছিলেন এবং তাঁর সেই অতি-মানবিক প্রচেষ্টায় শেতাংগ দর্শকরা খুসীও হয়েছিলেন। মধ্যস্থ মিঃ হলেণ্ডার বলেছেন, "তাঁর এই কাজ অবশ্যই বিস্ময়কর ছিল; কিন্তু কোনো কিছুই তাঁকে পরাজয় থেকে বাঁচাতে পারল না।"

কুস্তির পরে ডেরিয়াজ লণ্ডনের বিশ্ব বিখ্যাত 'হেল্থ্ অ্যাণ্ড স্ট্রেংথ্' পত্রিকার সম্পাদককে বলেছিলেন, "তাঁর (অর্থাৎ আহমদের) সেই বাহু বেষ্টনী অতি সাংঘাতিক ছিল—আমি তাকে রুখতে পারলাম না। আমি সারা জীবনে এমন বলী মল্লের সংগে আর কখনো লড়িনি।"

আহ্‌মদের সম্পর্কে তিনি স্থানান্তরে বলেছিলেন, "মরণ কাল পর্যন্ত বথ্‌শের সেই বাহুবেষ্টনীর কথা আমার মনে থাকবে।" আবার মিঃ হলেণ্ডারের প্রশ্নের উত্তরে আহ্‌মদও হেসে বলেছিলেন, "হাঁ, সাহেব বহুৎ বড় পালোয়ান বটে।"

প্রকৃতপক্ষে, আহ্‌মদ অত্যন্ত স্বল্পভাষী, নিরহংকার, ভদ্র ও গুণগ্রাহী মানুষ ছিলেন। মল্ল-জীবনে আহ্‌মদও চিরদিন অবিজিত ছিলেন।

আর্মাণ্ডের আর্তনাদ

আহ্‌মদের সংগে পরবর্তী কুস্তি হয় স্বিট্‌জার্ল্যাণ্ডের আর্মাণ্ড শার্পিলডেব। আর্মাণ্ড এবং আণ্ডে্‌ দুই ভাই ছিলেন সেই দেশের প্রসিদ্ধ মল্ল; কিন্তু জ্যেষ্ঠ আর্মাণ্ড ছিলেন শ্রেষ্ঠতর এবং তিনিও তাঁর স্বদেশীয় মল্ল জন্ লেমের মতো একবার 'হেংলার দংগল' জয় করেছিলেন। প্রসিদ্ধ ইংরেজ ব্যায়ামী মিঃ বেটিন্সন্ ভারতীয়দের বিরুদ্ধে আর্মাণ্ডকে দাঁড় করিয়ে 'শ্বেতাংগ ভরসা' (White Hope) ব'লে আগাম খেতাব দিয়ে অনেক হৈচৈও করেছিলেন।

আর্মাণ্ডের ওপরে ভরসা ক'রে এত হৈচৈ করার একটা কারণও ছিল। প্রত্যেক বড় বড় মল্লেরই এক একটা বৈশিষ্ট্য থাকে এবং প্রতিপক্ষকে বিশেষ কায়দায় পেলে তাঁরা সেইসব বৈশিষ্ট্যকে অতি মোক্ষমভাবে কাজে লাগিয়ে জয়লাভ ক'রে থাকেন। আর্মাণ্ডেরও এরূপ এক বৈশিষ্ট্য ছিল এবং তা হচ্ছে তাঁর দুর্ধর্ষ 'ক্রস্ বাটক' প্যাঁচ—ভারতীয় নিয়মে যাকে বলা হয় 'ঢাক'। ইওরোপ ও অ্যামেরিকায় এমন পালোয়ান একজনও ছিলেননা যিনি এই 'ক্রস্ বাটক' প্যাঁচের জন্য আর্মাণ্ডকে ভয় করতেন না। কেননা এই প্যাঁচের আওতায় পেলে, সে

মল্ল যত বড়োই হোন, তাঁকে চিৎ করতে আর্মাণ্ডের বিলম্ব হোতনা— এই ধারনাটা ইওরোপীয় মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। খুব বড় বড় বাজির পূর্বে বিপক্ষের এইসব বৈশিষ্ট্য বা দুর্বলতা জানবার জন্য অনেকে চেষ্টা ক'রেও থাকেন। ভারতীয় পালোয়ানেরা কিন্তু এদিকটা কখনো গ্রাহ্যই করতেন না। তবু, এক বন্ধু এসে আহমদকে আর্মাণ্ডের এই বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। উত্তরে আহমদ একটু মুচ্‌কি হেসেছিলেন মাত্র।

১৯১১, জুলাই মাসে লণ্ডন নগরে আহমদ ও আর্মাণ্ড কুস্তিতে অবতীর্ণ হন। প্রথম দু তিন মিনিট কালের কুস্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলনা। কেননা, সেই সময় আর্মাণ্ড শুধু 'ক্রস্ বাটক' ফাঁদ্‌বার সুযোগ খুঁজছিলেন, আর আহমদও সেই প্যাঁচটা দেওয়া হয় কিনা লক্ষ্য করছিলেন। শেষে আহমদ আর্মাণ্ডকে সেই সুযোগ দেবার জন্য এক পার্শ্বে ঘুরে দাঁড়ালেন। সংগে সংগে দেখা গেল, আর্মাণ্ড বিদ্যুৎবেগে আহ্‌মদের দুই বাহু ধ'রে সেই প্যাঁচ প্রয়োগ করেছেন এবং সেই মুহূর্তে আর্মাণ্ডের নিশ্চিত জয়লাভের কথা মনে ক'রে হাজার হাজার শ্বেতাংগ দর্শক উল্লাসে কানফাটা চীৎকার ক'রে উঠল! কিন্তু পর মুহূর্তেই কেমন ক'রে কেউ বুঝতে পারল না, দেখা গেল, আর্মাণ্ড নিজেই উপুর হয়ে মাটিতে পড়েছেন আর তাঁর পিঠের ওপর আহমদ ঘোড়-দৌড়ের 'জকি'র মতো দিব্যি কায়দায় ব'সে আছেন! শুধু তাই নয়, হঠাৎ শোনা গেল, আর্মাণ্ড উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ ক'রে বল্‌ছেন, "ওরে, ও শূয়ারবাচ্চা, তুই আমার পাঁজর ভাংছিস্!"

সংগে সংগে মধ্যস্থ বাঁশী বাজিয়ে কুস্তি বন্ধ করে দিলেন, ডাক্তার এগিয়ে এসে আর্মাণ্ডকে ধরে দাঁড় করালেন। দর্শকদের সেই গগণ-বিদারী চীৎকার কোথায় মিলিয়ে গেল, তারা বিস্ময়ে হতবাক! মধ্যস্থ ও ডাক্তারের জেরার উত্তরে আহমদ কুণ্ঠিতভাবে বললেন, "না, আমি তো

কব্জি কুলুপ (Wrist Hold) দিইনি, আমি কোমর বাঁধ (Waist Grip) দিয়েছিলাম বটে। আমি শুধু, যাতে ফস্কে না যায় তারই জন্যে, হাঁটু দিয়ে ওঁর পাঁজরটা একটু চেপে ধরেছিলাম।"

কুস্তির ঠিক ৪ মিনিটের মাথায় এই ঘটনাটি ঘটে। বিশ্রামান্তে দ্বিতীয়বার কুস্তির কথা উঠতেই আর্মাণ্ড প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বললেন, "না-না, ও ডাকু, ডাকুর সংগে আমি আর লড়তে পারি না।" ফলত আহ্‌মদকেই জয়ী ঘোষণা করতে হোল।

এই ঘটনার পরে বিলাতী কাগজগুলোতে নানা ধরণের মতামত প্রকাশিত হয়েছিল; কতকগুলো আহমদের স্বপক্ষে, কতকগুলো বিপক্ষে। কিন্তু বহুদর্শী ব্যায়ামী মিঃ শ্য ডেস্‌মণ্ডের সংক্ষিপ্ত মন্তব্যটি আমার কাছে বেশী মূল্যবান মনে হয়েছিল বলেই এখানে তাঁর কথা কটি হুবহু তুলে দিচ্ছি, "I did not blame him for refusing to come back to contest a second bout. * * What hurt was the terrible waist-grip of the Indian—an abnormal grip which no white man, however muscular, could have accomplished.

"* * Men like Cherpillod do not bellow in agony for nothing."

মহিউদ্দিনের অ্যামেরিকা ভ্রমণ

তখন ফ্রান্সের মরিস্ গাম্বিয়ের ছিলেন 'গ্রীকো-রোমান' কুস্তিতে ইওরোপের সর্বপ্রধান মল্ল। তখন পর্যন্ত ভারতীয় মল্লরা এই ধারার কুস্তি

বিশেষ কিছু জানতেন না। গাম্বিয়ের যখন গ্রীকো-রোমান ছাড়া অপর কোনো প্রণালীতে প্রতিযোগিতা করতে প্রস্তুত হলেন না, তখন গোলাম মহিউদ্দিন একাধিক সপ্তাহ এই ধারাটি অভ্যাস ক'রে গাম্বিয়েরের সংগে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং ২০ মিনিটের মধ্যে তাঁকে পরাজিতও করেন।

এইভাবে ইওরোপের অভিযানে বিজয় লাভ ক'রে ভারতীয় পালোয়ানেরা দেশে ফিরবার উদ্‌যোগ করেন। কিন্তু গোলাম মহিউদ্দিন গচ্চের সংগে লড়বার শেষ চেষ্টাস্বরূপ কালা পরতাপকে সংগে নিয়ে অ্যামেরিকা গেলেন। কারণ, তখনো পর্যন্ত অ্যামেরিকান্ মল্লদের সংগে ভারতীয় পালোয়ানদের ঠিকমতো বোঝাপড়া হয়নি; বিশেষত, গচ্চের কাছে পশ্চিম জগতের খ্যাতনামা মল্ল বিস্কো, লেম, ডেরিয়াজ, এমন কি, হাকেন্সমিথ্ ইত্যাদি অনেকেই পরাজিত হয়েছিলেন। অতএব ভারতীয় পালোয়ানদের স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সংগে শক্তি পরীক্ষার আগ্রহ জন্মেছিল। কিন্তু চতুর গচ্চ্ এমন সব সর্ত উত্থাপন করতে লাগলেন যে, তা পূরণ করা ভারতীয়দের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

গচ্চের সংগে লড়বার আশায় মহিউদ্দিন অনেকদিন চিকাগো সহরে অপেক্ষা করলেন। কিন্তু কোনো ফলদেয় হোল না। অবশেষে হতাশ হয়ে তাঁকে দেশে ফিরতে হোল। ফিরবার সময়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি নাকি ব'লেছিলেন, "যেখানে বিড়াল নেই, সেখানেই নেংটি ইঁদুরের আস্ফালন বেশী।"

অ্যামেরিকায় অবস্থান সময়ে বিস্কোর সংগে কালা পরতাপের এক কুস্তি হয় এবং তাতে কালা ২ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে পরাজিত হন। প্রকৃত পক্ষে, ১৯০৪ অব্দে অষ্ট্রেলিয়ায় হাকেন্স্মিথের হাতে ভুট্টান সিং ও গংগা

ব্রাহ্মণের পরাজয়ের পরে ১৯১১ অব্দে অ্যামেরিকায় বিস্কোর হাতে কালার পরাজয় আর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কেননা, সেই সময়ে ভারতীয় পালোয়ানদের পরাজিত করা পাশ্চাত্য মল্লদের কাছে এক দুরূহ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ব্যায়াম-বীর রামমূর্তি

মল্ল না হলেও মল্লযুদ্ধের একান্ত অনুরাগী, ভারতবর্ষের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যায়ামবীর রামমূর্তি নাইডুর কথা এখানে আলোচনা করা প্রয়োজন। ১৮৭৯ অব্দে মান্দ্রাজ রাজ্যের এক গ্রামে তাঁর জন্ম হয়; শৈশবে অতিশয় রুগ্ন থাকলেও নিজেরই চেষ্টায় যৌবন উন্মেষের সময় শরীর-চর্চা দ্বারা তিনি স্বাস্থ্য ও শক্তির প্রভূত উন্নতি করেছিলেন। এর পরে তিনি একটি সার্কাস দল গঠন ক'রে ভারতের সর্বত্র বহুবার পরিভ্রমণ করেছিলেন। ভারতের বাইরে পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশসমূহেও তিনি ভ্রমণ করেছিলেন এবং প্রায় সর্বত্রই তিনি শক্তিতে 'বিশ্বের বিস্ময়' নামে সমাদৃত হয়েছিলেন।

বলাই বাহুল্য, রামমূর্তি ছিলেন চতুর পেশাদার ব্যায়ামী; অতএব, স্বাভাবিকভাবেই তাঁর খেলার মধ্যে কিছু বিস্ময়কর ও মনোহরণকারী কার্য-কলাপ ছিল যার ফলে এদেশের জনসাধারণ এমন বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে যেতেন যে, খেলার আসল ফাঁকিটা তাঁদের চোখে ধরাই পড়ত না। এমন কি, বিলাতের মতো জায়গায়ও গোড়ার দিকে 'প্রিন্স' রামমূর্তি শক্তিতে 'বিশ্বের বিস্ময়' নামে আসর জমিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি প্রথম ধাক্কা খান সেখানেই অভিজ্ঞ এবং বরিষ্ঠ বৃটিশ বলী এড্‌ওয়ার্ড আস্টনের কাছে

১৯১১ অব্দে। মাত্র একদিন খেলা দেখেই তিনি মনে করলেন রামমূর্তি বা তাঁর কীর্তি কোনো কিছুই বিস্ময়জনক নয়। তিনি তাঁর সম্পর্কে পরিস্কারভাবেই বলেছিলেন,—

"His greatness was given much publicity in the Press, and we went to see something marvellous. He was acclaimed one of the wonders of the world in strength, but I never saw one feat that impressed me. His great and feature trick was to let a full-grown elephant walk over his prostrate body. A thin board was placed over his bcdy, and the elephant (trained) stepped on one end of the board, stepped *right over* the Indian, trod on the *other end* of the board, and walked away. The board being very flexible, there was not much weight on the man. The thrill was, or would have been, if the animal had made a mistake."

যে তক্তাখানার ওপর দিয়ে হাতী যেত, সেটি এতই সরু ছিল যে, একবার বিলাতেই সেই তক্তাটি ভেংগে গিয়েছিল এবং তার ফলে রামমূর্তি কিছু চোটও পেয়েছিলেন। তা যাহোক, তাঁর এই তথাকথিত শক্তির কাজ দেখে এডওয়ার্ড অ্যাস্টন্ অবিলম্বেই তাঁকে প্রকৃত শক্তির কাজ ভার তোলায় আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু রামমূর্তি অবস্থা চিন্তা করে পিছিয়ে আসাকেই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেছিলেন। যে কারণেই হোক এই ঘটনাটি আমাদের দেশে প্রচার লাভ করেনি।

রামমূর্তির খেলাগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল শায়িতাবস্থায়

বুকে হাতী ধারণ। আমাদের দেশের কেউ কেউ বলেন, আমাদের দেশেই এ খেলার উৎপত্তি হয়েছে এবং এর প্রবর্তক রামমূর্তি। কিন্তু একথা একেবারেই ভিত্তিহীন। কেননা, রামমূর্তির অভ্যুত্থানের পূর্বেই জনৈক জার্মান ব্যায়ামী মধ্য ইউরোপে এই খেলাটি দেখিয়েছিলেন এবং তখনকার পত্র-পত্রিকায় তাঁর সেই অবস্থার চিত্রাদি ছাপাও হয়েছিল। কিন্তু ইওরোপীয়দের কাছে এ খেলার ফাঁকি ধরা পড়বার পরে সেখানে এটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এরপরে রামমূর্তি এটিকে আমাদের দেশে চালিয়ে বিস্তর সুনাম অর্জন করেছিলেন এবং আজো পর্যন্ত এই খেলা আমাদের দেশে জনপ্রিয়তা অর্জন করে চ'লেছে! তাছাড়া তাঁর অন্যান্য খেলা, যেমন—মোটর গাড়ী টেনে রাখা, শিকল ছেঁড়া, বিভিন্ন অবস্থায় বুকে ও পিঠে পাথর ধারণ করা ইত্যাদিও ইওরোপ থেকেই আমদানি করা হয়েছিল। প্রকৃত পক্ষে, ইউরোপীয় শক্তিবীরদের, বিশেষ করে ইউজেন সাণ্ডোর শক্তির কীর্তিতে অনুপ্রাণিত হয়েই রামমূর্তি ইওরোপীয় কায়দায় তাঁর পেশাদারী ব্যায়াম-জীবন চালনা সুরু করেছিলেন; সংগে সংগে যোগ, প্রাণায়াম ইত্যাদির কথা ব'লে তিনি ভারতীয় এবং ইওরোপীয় সকলের মনেই অভিনব রহস্যের সৃষ্টি করেছিলেন!

বাংলাদেশে রামমূর্তির পরাজয়

রামমূর্তি বহুদেশ পর্যটন করেছিলেন বটে, তবে বিলাত ও বাংলা ছাড়া আর কোথাও তাঁর শক্তির প্রভুত্ব চুর্ণ হয়েছে বলে আমার জানা নেই। প্রথম দিকে রামমূর্তি কল্পনাই করতে পারেননি,—বাংলাদেশে তাঁকে অপদস্ত হ'তে হবে। তাই, ১৯১৪ অব্দে বাংলা দেশে ফরিদপুর জেলার সামান্য একটা মহকুমা সহর মাদারিপুরে 'নিখিল ভারত স্বাস্থ্য

প্রদর্শনী' উপলক্ষে রামমূর্তি সদলবলে এসে ১৩ই ফেব্রুয়ারি, অর্থাৎ তাঁর উপস্থিতির প্রথম দিনেই একটি লোহার শিকল হাতে নিয়ে ঘোষণা করলেন যে, দর্শকদের মধ্যে যে কেউ এই শিকল ছিঁড়তে পারলে তাঁকে তিনি সানন্দে ২৫০৲ টাকা পুরস্কার দেবেন।

সেই সময়ে মাদারিপুরের সর্বশ্রেষ্ঠ বলী পুরুষ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দে মাদারিপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের খুবই জনপ্রিয় শিক্ষক ছিলেন। সেই সময়ে তিনি মাটিতে শুয়ে গলার ওপর ১০ মণ বা ঘাড়ের ওপর ২০ মণ পাথর ধারণ করতে পারতেন বলে খ্যাতি ছিল। তাছাড়া, বিপরীত দিকে গমনোদ্যত দুখানা মোটরকে তিনি টেনে রাখতে পারতেন বলেও শুনেছি। তবে তখন পর্যন্ত তিনি শিকল ছেঁড়ার চেষ্টা করেননি। কিন্তু রামমূর্তির এই বে-পরোয়া আহ্বানে তাঁর যেনো আত্মসম্মানে ঘা লাগল; বিশেষত জনকয়েক বন্ধুর উস্কানির ফলে ক্রমশ তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন এবং পরদিন সকাল বেলায়ই রামমূর্তির সংগে দেখা করবার জন্য তাঁর তাঁবুতে গেলেন।

জামা-কাপড় পরা খর্বাকৃতি সতীশবাবুকে তেমন অসাধারণ বলী পুরুষ বলে মনে হোতনা। তাই, বোধ হয়, সাধারণ দর্শনার্থী মনে করে দ্বারোয়ান তাঁকে ফিরিয়ে দিতে চাইল; বলল, "এখন দেখা হবে না।" সতীশবাবু এতে নিজেকে আরো অপমানিত বোধ করলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে ধমকি দিয়ে উঠলেন, "হাঁ, আমি দেখা করবোই এবং এক্ষুণি দেখা করবো। তাঁকে বলো, বিনা পয়সায় শো দেখবার জন্য আমি পাস-প্রার্থী নই। আমি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী—তাঁর আয়ের অংশে আমি ভাগ বসিয়ে ছাড়বো!" সংবাদ শুনে রামমূর্তি তাঁকে তাঁবুর ভিতরে নিয়ে সমাদরে বসালেন এবং জানতে চাইলেন, শিকল ছেঁড়ার অভ্যাস তাঁর আছে কি না। সতীশবাবু নিরুদ্বেগে বললেন যে, শিকল ছেঁড়ার

চেষ্টা তিনি কোনোদিন করেননি বটে, কিন্তু রামমূর্তির মতো বলী যদি একাজ পারেন, তবে তিনিই বা পারবেন না কেন? তিনিও তো দুর্বল নন। এই জবাব শুনে রামমূর্তি অনেকটা যেনো আশ্বস্ত হয়ে গেলেন এবং সতীশবাবুর সম্ভাব্য কৃতকার্যতায় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে তাঁকে বিদায় দিলেন।

সেদিন অর্থাৎ ১৪ই ফেব্রুয়ারি বিকালে রামমূর্তি যথারীতি শিকল নিয়ে প্রদর্শনীতে উপস্থিত হলেন এবং সবিনয়ে সতীশবাবুকে আহ্বান করলেন। সতীশবাবু দর্শকদের আসন থেকে ক্রীড়াংগনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রথমেই রামমূর্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাজির ২৫০৲ টাকা মজুত আছে কিনা এবং থাকলে সকলের সামনে তা হাজির করা হোক। রামমূর্তিকে অগত্যা টাকা উপস্থিত করতে হোল।

তখন রামমূর্তির নির্দেশমতো দু'খানা চেয়ারকে উল্টোমুখী পিছন ঘুরিয়ে কাছাকাছি রাখা হল এবং একটি মোটা ও দৃঢ় কাঠকে দুপায়ে চেপে সতীশবাবুকে দুটি চেয়ারের মাঝখানে বাঁকা হয়ে দাঁড়াতে হল। এরপরে পায়ের তলার কাঠ সমেত সতীশবাবুর দুটি কাঁধ বেষ্টন করে সেই শিকলটিকে লাগানো হল। রামমূর্তি তখন চেয়ারের হেলানদানির ওপর দু'হাতের ভর দিয়ে তাঁকে সর্বশক্তির বলে শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াতে বললেন যাতে শিকলটি ছিঁড়তে পারে।

দর্শকদের হাততালি ও উচ্চ সোরগোলে উদ্বুদ্ধ হয়ে সতীশবাবু দুর্জয় দৃঢ়তা ও প্রতিজ্ঞা নিয়ে সেই শিকলকে বার বার হ্যাঁচকা দিতে লাগলেন। ছ'সাতবার হ্যাঁচকার পরেই হঠাৎ সশব্দে শিকলখানা ছিট্‌কে পড়ল, আর সতীশবাবুও সেই দমকে বেটাল হয়ে পিছন দিকে ছিট্‌কে পড়ে গেলেন! মুহূর্ত মধ্যে প্রায় হাজার দর্শক তীব্র উল্লাসে ফেটে পড়ল। চতুর রামমূর্তিও লাফ দিয়ে সতীশবাবুকে ধরে তুললেন এবং দুহাত তুলে

চীৎকার করে বললেন, "বাংলাদেশে আমার ভ্রমণ এবং শরীর-চর্চার প্রচার আজ সত্যই সার্থক হল"—অর্থাৎ কৌশলে তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে, তাঁর চেষ্টাতেই বাংলাদেশ শরীর চর্চা সুরু করেছে এবং তাঁর প্রেরণাতেই বাংলাদেশ শক্তির ক্ষেত্রেও স্থান পেয়েছে! যাহোক, রামমূর্তিকে শেষে আড়াইশ' টাকার তোড়াটি উপহার দিতে হয়েছিল, যদিও সতীশবাবু নিজে সেই টাকা নেননি।

কিন্তু এই শিকল ছেঁড়ার প্রবল প্রয়াসে সতীশবাবুর কানের পরদায় বিষম ধাক্কা লাগে এবং প্রথম দু'তিন দিন তিনি বিশেষ কিছু শুনতে পাননি। পরে চিকিৎসার দ্বারা আংশিক ভালো হলেও বয়স বৃদ্ধির সংগে আবার সেই ত্রুটি বাড়তে থাকে। এখন তিনি জীবনের প্রান্ত সীমায় এসে পড়েছেন; বয়স ৮১ বছর, কানের কাছে মুখ নিয়ে খুব জোরে কথা না বললে তিনি বিশেষ কিছুই শুনতে পান না। প্রায় ৮০ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি নিয়মিত ব্যায়াম-চর্চা করেছিলেন। কিন্তু ১৯৫৫, ৯ই ফেব্রুয়ারি হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তখন থেকে আর কিছু করতে পারেননি। বর্তমানে বাংলাদেশের জীবিত বলী পুরুষদের মধ্যে তিনিই প্রবীণতম।

মাদারিপুরের ঘটনার পরে রামমূর্তি বাংলাদেশের আর কোথাও টাকার বাজি রেখে 'চ্যালেঞ্জ' দিতেন না। কিন্তু কিছুকাল পরেই তিনি নারায়ণগঞ্জ সহরে বুকের প্রসারণ দ্বারা শিকল ছেঁড়ার একটি 'চ্যালেঞ্জ' জ্ঞাপন করেছিলেন; তবে তাতে টাকার প্রশ্ন ছিলনা। এই শিকল অনেকটা সরু ছিল। শিকলটি দুই বাহুর ওপর দিয়ে বুকে জড়ানো হোত এবং নিঃশ্বাস নিয়ে বক্ষ প্রসারণের সংগে সংগে উভয় বাহুর চাড় দিয়ে শিকলটিকে ছেড়া হত। রামমূর্তি নারায়ণগঞ্জে প্রত্যেক দিন প্রদর্শনীর সময়ে ঐ ঘোষণাটি ক'রে চলেছিলেন। কিন্তু কেউ শিকলটি ছেঁড়ার জন্য

এগুননি। এমন সময় বিশেষ কোনো কাজ উপলক্ষে বোস ঠাকুর সেই সহরে যান। দুজন বন্ধু বোস ঠাকুরকে ধ'রে বসলেন—"একবার চেষ্টা ক'রে দেখুন, শিকলটা ছেঁড়া যায় কিনা।"

একথা সত্যি যে, গোটা কয়েক শক্তির কাজে বোস ঠাকুর এ দেশে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। কিন্তু ১৯০০ অব্দে 'ভগন্দর' দ্বারা আক্রান্ত হবার পরে, বিশেষ ক'রে তিনবার অস্ত্রোপচার এবং অন্যান্য চিকিৎসার পরেও আরোগ্য হতে না পেরে তিনি জীবনে নিরাশ হয়ে সাময়িকভাবে সংসার ত্যাগ করেছিলেন। শক্তির ক্ষেত্র থেকেও তিনি একরকম সরেই দাঁড়িয়েছিলেন। এরপরে পুনরায় সংসারের সংস্পর্শে গেলেও পুরোপুরিভাবে তাঁর সংগে সংসারের যোগ ঘটে নি—শক্তি চর্চারও নয়। বিশেষত রামমূর্তির ওপর বোস ঠাকুরের ছিল অগাধ শ্রদ্ধা। তাঁর ধারণা ছিল, রামমূর্তির মতো 'ডনগীর' পৃথিবীতে বেশী জন্মেননি এবং তাঁর কীর্তি অন্যের পক্ষে করাও সম্ভব নয়। তাই প্রথমত শিকল ছেঁডার ব্যাপারে তিনি কোনো উৎসাহই দেখালেন না; কিন্তু বন্ধু দুটির পীড়াপীড়িতে শেষে তিনি রামমূর্তির খেলা দেখতে প্রস্তুত হলেন।

সেদিনও রামমূর্তি একটি শিকল নিয়ে আসরে উপস্থিত হলেন এবং সবিনয়ে বললেন, "উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে যে কোনো ব্যক্তি এসে এটি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, বুকের প্রসারণ দ্বারা এটিকে ছেঁড়া যায় কিনা।" প্রকৃতপক্ষে, কেউ এগিয়ে না আসায় শেষের কয়েকদিন রামমূর্তি সেই শিকলটিকেই দর্শকদের সামনে ছিঁড়ে ফেলতেন। রামমূর্তির ঘোষণার পরেই বন্ধু দুটি বোস ঠাকুরকে অধৈর্যের মতো বার বার ঠেলতে লাগলেন—"উঠুন, গিয়ে দেখুন কি হয়!" কিন্তু বোস ঠাকুরও প্রবলভাবে নিজের অক্ষমতা জানাতে লাগলেন। এমন সময়, একজন বন্ধু হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "হ্যাঁ, একজন এইখানেই আছেন,

যিনি এই শিকল ছিঁড়তে পারেন এই যে, তিনি ব'সে আছেন!”
—এই বলেই তিনি বোস ঠাকুরকে দেখিয়ে দিলেন।

সংগে সংগে রামমূর্তিও দর্শকদের দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হয়ে এলেন এবং উৎসাহব্যঞ্জক স্বরে বললেন, “আসুন, আসুন বন্ধু, মনে হয় আপনার পক্ষে এ কাজ সত্য সত্যই সম্ভব।” রামমূর্তির এই আহ্বানে বোস ঠাকুর হঠাৎ যেনো লজ্জা, সংকোচ, উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনায় কেমন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন এবং যেনো মন্ত্রচালিতের মতোই অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও গিয়ে রামমূর্তির সামনে দাঁড়ালেন!

সকলেই দেখল, ঘোর রক্তবর্ণ বস্ত্রপরিহিত, দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ, বলিষ্ঠ এক যুবক রামমূর্তির সামনে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর কাপড় লাল, ফতুয়া লাল, চাদর লাল, মাথার পাগড়াও লাল; কিন্ত নগ্নপদ। এক নজরেই বোঝা গেল, তিনি সন্ন্যাসী বা ঐ শ্রেণীর কেউ। এ এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার! মুহূর্ত মধ্যে একটা কানফাটানো উল্লাসধ্বনিতে, মনে হোল যেনো তাঁবু ফেটে যাচ্ছে! শিকলখানা বোস ঠাকুরের হাতে দিতেই তিনি সেটিকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন। শেষে রামমূর্তির নির্দেশে তাঁর সংগারা বোস ঠাকুরের বুকে শিকল জড়াতে উদ্‌যোগী হতেই, কি মনে করে, বোস ঠাকুর দুহাত শূন্যে তুলে শিকলটিকে শুধু তাঁর বুকেই জড়াতে অনুরোধ করলেন। রামমূর্তি কাছেই ছিলেন; একবার শুধু সবিস্ময়ে এই অপরিচিত সন্ন্যাসীর দিকে তাকালেন! সন্ন্যাসীর মুখ গম্ভীর! অগত্যা বাহুর নীচে দিয়েই তাঁর বুকে শিকল জড়ানো হল। এ-ও এক অভাবিত বিষয়! এর আগে এই দেশে কেউ এই কায়দায় বুকের জোরে শিকল ছেঁড়ার প্রচেষ্টা দেখেনি।

সমস্ত দর্শক নীরব, বাজনাও বন্ধ; তাঁবু নিস্তব্ধ। বোস ঠাকুর গোটা কয়েক ঘন ঘন নিঃশ্বাস ছেড়েই একটা পূর্ণ নিঃশ্বাস টেনে নিলেন।

দেখতে দেখতে তাঁর বুকটা প্রসারিত হয়ে উঠল, নাক-মুখ-চোখ লাল হয়ে গেল এবং মুষ্টিবদ্ধ উন্মুক্ত পুরোবাহুর শিরাগুলি যেনো পাকানো দড়ির মতো চামড়া ফেটে বেরুবার উপক্রম করল! তারপরেই 'ঝনাৎ' ক'রে একটা শব্দ হবার সংগে সংগে শিকলটা মাটিতে পায়ের কাছে পড়ে গেল! আবার দর্শকদের কানফাটানো চীৎকার!

রামমূর্তি মুহূর্তকাল বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে রইলেন। তারপরেই হঠাৎ ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তাঁকে দুহাতে জড়িয়ে ধ'রে চাৎকার ক'রে উঠলেন—"Welcome Bengal! Bengal Welcome!" এবং প্রায় সংগে সংগেই তিনি তাঁকে নিয়ে পরদার আড়ালে নিজের চেম্বারে চ'লে গেলেন। দর্শকদের উল্লাস যেনো আর থামতেই চায়না। মিনিট খানেক পরে তাঁরা দুজন ফিরতেই ক্রমশ আবার খেলা সুরু হোল।

সেদিন খেলার শেষে রামমূর্তি বোস ঠাকুরকে নিয়ে আবার ভিতরে গেলেন এবং বেশ কিছুক্ষন তাঁদের মধ্যে আলাপ-পরিচয় হোল। বিদায়ের সময় রামমূর্তি বারংবার বোস ঠাকুরকে অনুরোধ করেছিলেন যাতে তিনি পরেও তাঁর সংগে যোগাযোগ রক্ষা করেন। কিন্তু সংসারের সংগে সম্পর্কহীন বোস ঠাকুর কারু সংগেই বড়ো একটা যোগাযোগ রক্ষা করতেন না। রামমূর্তির অনুরোধ রক্ষা করাও এই কারণেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

এ ছাড়া আরো তিনজন প্রসিদ্ধ পেশাদার বাঙালী বলীকে রামমূর্তি সর্বদাই এড়িয়ে চলতেন। তাঁরা ছিলেন যথাক্রমে ঢাকা জেলার মহেন্দ্রনাথ দাস মজুমদার (১৮৭৮-১৯৩০), কলিকাতার ভীমভবানী (১৮৯০-১৯২২) এবং বরিশালের রাজেন্দ্রনারায়ণ গুহ ঠাকুরতা (১৮৯:-১৯৪৫)। কারণ, এঁরা তিনজনই রামমূর্তির খেলার কৌশলগুলি জানতেন। অনুমান ১৯০৯-১০ অব্দে একবার রামমূর্তি ঢাকায় গিয়ে

কথার কথায় প্রসিদ্ধ পালোয়ান পরেশনাথ ঘোষকে বলেছিলেন যে, বাংলা দেশের আর যাই থাক, জিম্‌নাস্টিক্‌সের জ্ঞান বড় কম; বড় বড় শক্তির কাজেও বাংলাদেশ পিছনে প'ড়ে আছে। তাঁর এই দম্ভোক্তি পরেশনাথের মনে ঘা দিয়েছিল এবং তার জন্যই পরেশনাথের নির্দেশে মহেন্দ্রবাবু বরিশালে গিয়ে শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাত্র সূর্যকুমার গুহ ঠাকুরতার কাছে জিমনাস্টিক্‌স্ শিক্ষা করেছিলেন। ভীম ভবানী তো রামমূর্তির কাছেই সব রকেমর সার্কাসী কৌশল শিখেছিলেন। রাজেন বাবুর শিক্ষাও সূর্যবাবুর হাতেই হয়েছিল।

রামমূর্তি প্রাত্যহিক প্রদর্শণীতে তাঁর খেলায় সাধারণত ফাঁকিবাজির আশ্রয়ই নিতেন; কিন্তু তাঁর 'চ্যালেঞ্জ চোন' সব সময়েই বাজে হোতনা। তাঁর এই কীর্তি অবগত ছিলেন ব'লেই রাজেন বাবু ১৯১৯ অব্দে বরিশাল সহরে তাঁকে পাণ্টা চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন এবং সেই চ্যালেঞ্জের মুখে রামমূর্তি পিছিয়ে যাওয়ায় তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে বলেছিলেন, "আমি বাংলা দেশ থেকে তোমার মতো অন্তত একশ রামমূর্তি গড়ে দিয়ে যাবো।" রাজেন বাবু তাঁর এই প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। এমন কি, তিনি তাঁর বড় মেয়ে ঊষারাণী বোসকে দিয়ে ১৯৩৩, ২২এ ডিসেম্বর কলিকাতার হৃষিকেশ পার্কে 'স্বাস্থ্য ও শিল্প প্রদর্শনীতে' একখানা মোটর ধরিয়েও রেখেছিলেন। মোট কথা, ব্যায়ামী বা বলী হিসাবে রামমূর্তির খ্যাতি যতই থাক, তিনি কিছুতেই বাঙালী বা ইওরোপীয় বলীদের সমকক্ষ ছিলেননা। তবে তিনি দেশ-বিদেশে ভ্রমণ ক'রে ক'রে শরীর-চর্চাকে বহুলাংশে জনপ্রিয় ক'রে দিয়ে গেছেন, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

কালের অমোঘ বিধানে রামমূর্তির জীবনে যবনিকা পাত ঘটেছে বটে, কিন্তু তাঁর ভূত এখন বাঙালী তরুণদের ঘাড়ে চেপে বসেছে, এবং বসেছে

অত্যন্ত সাংঘাতিকভাবে। তাই বুকে হাতী বা রোলার তোলা, বুকে পাথর তোলা বা সেই অবস্থায় তাকে হাতুড়ীর ঘায়ে ভাংতে দেওয়া, মোটর টেনে রাখা, শিকল ছেঁড়া, নানাভাবে লোহার পাত বা ডাণ্ডা বাঁকানো বাংলাদেশে মহা সমারোহে শক্তির কাজ নামেই চ'লেছে এবং এই 'শো-ম্যান্' বা 'ম্যাজিশিয়ান্'রা রামমূর্তীর ওপরেও টেক্কা দিয়ে নিজেদের 'শক্তি সমুদ্র', 'সমুদ্র শক্তি', 'আয়রণ ম্যান', 'ষ্টীল ম্যান', 'ব্যায়ামাচার্য', 'যোগাচার্য', 'যোগীন্দ্র' ইত্যাদি রং-বেরংয়ের খেতাবে বিভূষিত করছেন! অবস্থা দেখে মনে হয়, বিত্তশালীর অযোগ্য সন্তান যেমন উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অর্থকে নিতান্ত অবিবেচকের মতো উড়িয়ে দেয়, এঁরাও তেমনি করছেন। কেননা, রামমূর্তী বা তাঁর সমকালীন বাঙালী বলারা যথেষ্ট দৈহিক শক্তি অর্জন ক'রে শুধু শরীর-চর্চাকে জনপ্রিয় করবার উপায় স্বরূপই ঐসব মনোহরণকারী কীর্তির আশ্রয় নিয়েছিলেন। এইজন্য তাঁরা সচরাচর বাজে লোককে দিয়ে ঐসব খেলা দেখাতেন না। কিন্তু এখনকার বাঙালী তরুণেরা সেইসব খেলা যাকে-তাকে দিয়েই দেখাচ্ছেন। তাঁরা এমনি বিভ্রান্ত যে, একটি একহারা ছেলে বা মেয়ের বুকে হাতা বা রোলার তোলা দেখে জনসাধারণ যে বিস্মিত হবার বদলে তাদের শক্তি বিষয়ে গভীর সন্দিগ্ধ হয়ে যান, তা পর্যন্ত বুঝতে পারেন না, অর্থাৎ তাঁরা নিজেরাই যে এ ব্যাপারে নিজেদেরকে খেলো করছেন, তা বোঝবার মতো বুদ্ধিও তাঁদের নেই! 'শক্তিমান' নাম কিনবার এতই কি উন্মাদনা!

ভীম ভবানীর দূর প্রাচ্য ভ্রমণ

১৯১১, ডিসেম্বর মাসে রামমূর্তি তাঁর সার্কাস নিয়ে কলিকাতায় এলে ভীম ভবানী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং আত্মীয়-স্বজনের অজ্ঞাতসারে তিনি তাঁর সংগে রেংগুন হয়ে জাভায় চ'লে যান। ১৯১২ অব্দে জাভায় একজন ডাচ্চ্ মল্ল রামমূর্তিকে কুস্তিতে আহ্বান করেন। কিন্তু রামমূর্তি কুস্তি জানতেন না ব'লেই তাঁর সম্মান রক্ষার্থে ভীম ভবানী এগিয়ে এলেন। যদিও কুস্তিতে ভবানীরও বিশেষ দক্ষতা ছিলনা, তবু তিনি সেই ডাচ্চ্ মল্লকে ৫ মিনিটের মধ্যেই ধরাশায়ী ক'রে দিয়েছিলেন।

জাভা থেকে রামমূর্তির দল চীন দেশে যায়। সাংহাই সহরে এক অ্যামেরিকান্ কুস্তিবীরের সংগে ভবানীর কুস্তি হয় এবং সে কুস্তিতেও ভবানীরই জয় হয়। এ ছাড়া দক্ষিণ ও পূর্ব চীনে জনকয়েক দেশীয় মল্লের সংগেও তাঁর কুস্তি হয়েছিল। সে দেশের কুস্তির ধারা ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। একটী বৃত্ত রেখার মধ্যে দুজন মল্ল পরস্পর শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হোত এবং ঠেলাঠেলির চোটে কেউ যদি বৃত্ত রেখার বাইরে চ'লে যেত, তবে তাকে পরাজিত ঘোষণা করা হোত। এই নিয়মের ফলে প্রথম প্রথম গোটাকয়েক কুস্তিতে ভবানী বৃত্তের বাইরে গিয়ে হেরে যান। কিন্তু নিয়মটি জানবার পরে তিনি আর একটী কুস্তিতেও হারেননি, বরং সব কয়টিতেই জয়ী হয়েছিলেন।

এই ঘটনার অনেক দিন পরে কলিকাতায় মহারাষ্ট্রীয় আগাসীর সার্কাসে ভবানীর সংগে 'রাশিয়ান সাণ্ডো' নামে জনৈক মল্লের লড়াই হয়। প্রায় আধঘণ্টা কালের মধ্যে এই কুস্তিতে কেউ কাকেও হারাতে

পারেননি, যদিও এই সময়ের মধ্যে ভবানী রাশিয়ান সাণ্ডোকে বার কয়েক মাটিতে ফেলতে সমর্থ হয়েছিলেন।

এই রাশিয়ান সাণ্ডো কে ছিলেন, তা আমার জানা নেই। কেউ কেউ ব'লেছেন, ভানা ক্রেমারই 'রাশিয়ান সাণ্ডো' নাম নিয়েছিলেন। আমার তা বিশ্বাস হয়না। কেননা, ভানা ক্রেমার সত্য সত্যই বাজে মল্ল ছিলেন না। বিশেষত ক্রেমার এ-দেশে এসেছিলেন ১৯১২ অব্দে এবং এলাহাবাদ, সহরে রেওয়া রাজার কুঠিতে প্রসিদ্ধ মল্ল পীর বখ্‌শের সংগে কুস্তিতে ১০ মিনিটের মধ্যে পরাজিত হয়েছিলেন। তারপরে ক্রেমার এদেশে আর কুস্তি লড়েছিলেন ব'লে জানিনা। তিনি কুস্তি জানলেও প্রধানত শক্তির খেলাই দেখাতেন। কাঁধের ওপর লোহার কড়ি বাঁকানোর কাজটি তিনিই প্রথম এদেশে দেখিয়ে গিয়েছেন। সে যাই হোক, ১৯১৫ অব্দ পর্যন্ত ক্রেমার এদেশে ছিলেননা। অথচ ভীম ভবানী সেই বছরেই ক্রেমারের সংগে প্রতিযোগিতা করেছিলেন,— এ কেমন কথা!

ক্রেমারের প্রায় সমীপবর্তী সময়ে স্কটিশ মল্ল উইলিয়াম ব্যাংকিয়ার, যিনি অ্যাপোলো বা স্কটিশ হার্‌কিউলিস্ নামে পরিচিত ছিলেন, এদেশে এসে শক্তির কাজ দেখিয়েছিলেন, কিন্তু কুস্তিতে নামেননি।

গোবর পালোয়ান

এইবার বিশ্ব-বিশ্রুত গোবর পালোয়ান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া দরকার। মল্ল-জগতে তিনি প্রথিতযশা ও দিগ্বিজয়ী হ'লেও দুঃখের বিষয় তাঁর পরিচয়-মূলক কোনো বিস্তৃত জীবনী আজো প্রকাশিত হয়নি।

এমন কি, তিনি যে বাঙালীর ঘরেরই সন্তান, সেকথাও অনেক বাঙালীই জানেননা। এর কারণ, বোধ হয়, সেই সব লোকের কুস্তির প্রতি আজন্ম অনুৎসুকতা এবং অজ্ঞাত-সঞ্জাত ভ্রান্ত-বিদ্বেষ। আরো পরিতাপের বিষয় যে, ব্যায়াম ও খেলাধূলা নিয়ে যাঁরা নিরন্তর মতামাতি করেন, এমন বাঙালীর মধ্যেও অনেকেই গোবর পালোয়ানের সত্যিকার পরিচয় জানেন না, অথবা জেনেও তাঁকে তার সামান্যতম মর্যাদাও দেন না। অথচ কুস্তি-বিদ্যায় গোবর পালোয়ানের মতো এত বড় বিশেষজ্ঞ এবং হৃদয়বান পুরুষ ভারতবর্ষে আর একজনও জন্মান নি।

গোবর বাবুর আসল নাম যতীন্দ্রচরণ গুহ। পূর্বে এঁরা যশোহর জেলার অধিবাসী ছিলেন—কিন্তু পরে এঁরা কলিকাতার অধিবাসী হয়েছেন। গোবর বাবুকে মল্ল-বংশের মানুষ বলা চলে। তাঁর ঠাকুরদা অম্বিকাচরণ এবং জ্যেষ্ঠতাত ক্ষেত্রচরণ প্রসিদ্ধ মল্ল ছিলেন। তাঁর বাবা রামচরণও কুস্তি জানতেন। কিন্তু মল্ল-বিদ্যায় গোবর বাবুর জ্ঞান ও কৃতিত্ব অনন্যসাধারণ। তাঁর ছেলে রতন, মানিক এবং জহরও দক্ষ মল্ল সন্দেহ নেই। ১৯৫২ অব্দে মানিক ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম বিশ্ব অলিম্পিক কুস্তি ফেডারেশনের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

গোবর বাবু একদিকে যেমন ভারতীয় কুস্তির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কলাকৌশল বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছেন, অন্যদিকে তেমনি আবার দীর্ঘকাল ইওরোপ ও অ্যামেরিকায় পৃথিবীর নানা দেশীয় শত শত শ্রেষ্ঠ মল্লের সংস্পর্শে গিয়ে সেইসব দেশের বিভিন্ন কুস্তির নানা কায়দা-কলাপ সম্পর্কে বিস্তর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। কিন্তু তাঁর চেয়েও আমার কাছে, এবং জাতির কাছেও বটে, বেশী মূল্যবান তাঁর উদার ও সদাশয় মনোভাব, যার প্রেরণায় তিনি জাতি-ধর্ম-ব্যক্তি নির্বিশেষে

সকলকেই শরীর-চর্চা ও কুস্তি শিক্ষা দানে ব্রতী হয়েছেন। এইদিক থেকে বিচার করলে তাঁর স্থান গামা বা পুলিন দাস ইত্যাদি দিক্‌পাল ব্যায়ামবিদ্‌দের সাম্প্রদায়িক বা দলীয় নীতির অনেক ওপরে।

আর একটি বিষয়ে গোবর বাবুর কীর্তি এদেশে সর্বপ্রথম এবং আজো পর্যন্ত একক হয়েই আছে। সেইটি হচ্ছে তাঁর সরকারিভাবে 'বিশ্ব-কুস্তি প্রাধান্য' লাভ। আজো পর্যন্ত আর কোনো ভারতীয় এই সম্মান অর্জন করতে পারেননি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যিনি তাঁর অনন্যসাধারণ ব্যক্তিগত প্রতিভার জোরে ভারতবর্ষকে মল্ল-জগতের সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, দেশের অধিকাংশ মানুষের কাছে তিনি রইলেন অবজ্ঞাত! ইদানিং আমাদের দেশে অকীর্তি ও কুকীর্তি বাছাই না ক'রেও কথায় কথায় যাকে-তাকে সম্বর্ধনা ও অভিনন্দন দেওয়ার রেওয়াজ সুরু হ'য়েছে; ভেবে আশ্চর্য হই, গোবর বাবু কি একজন 'অকীর্তিমান' বা 'কুকীর্তিমান' হিসাবেও অভিনন্দন বা মানপত্র পাবার যোগ্য নন!

গোবরের ইওরোপ অভিযান

১৯১২ অব্দে দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্যে গোবর বাবু ইওরোপ যাত্রা করেন। সেই সময় যদিও তাঁর বয়স মাত্র ২০ বছর, তবু দেহগত বিপুলতায় তিনি তখনই গামা, ইমাম, আহমদ ইত্যাদি অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ ভারতীয় মল্লের ওপরে চ'লে গেছেন এবং মল্ল হিসাবেও তাঁদের প্রায় সমকক্ষতা লাভ করেছিলেন। মনে হয়, এখানে তাঁর তখনকার দৈহিক মাপটি উল্লেখ করা বিশেষ চিত্তাকর্ষক হবে। সেটি এই :—

ভার	২৯০ পাউণ্ড
দৈর্ঘ	৭৩ ইঞ্চি
গলা	১৮ "
বাহু (স্বাভাবিক)	১৮ "
গোছা (স্বাভাবিক)	১৭ "
কব্জি	৮ "
বুক (স্বাভাবিক)	৪৮ "
বক্ষ (প্রসারিত)	৫০ "
কটি	৪২ "
উরু	৩০ "
মোচা (স্বাভাবিক)	১৮ "

ইওরোপ ও অ্যামেরিকায় গোবর বাবু যতো কুস্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন, তার বিস্তৃত বিবরণ দূরে থাক, সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে হ'লেও একখানা স্বতন্ত্র পুস্তক লিখতে হবে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁর সেই চমকপ্রদ ও সংঘর্ষময় জীবনেতিহাস আজো পর্যন্ত আমাদের দেশের কোনো পত্রিকা বা প্রকাশক প্রকাশ করেননি। পশ্চিম দেশ হ'লে তার 'আত্মজীবনী' বহু পূর্বেই ছাপা হয়ে ইতিমধ্যে বহু সহস্র বিক্রী হয়ে যেত। যাহোক, আমি এখানে তাঁর মাত্র গোটা কয়েক যুদ্ধের কথা বল্‌ব, যার দ্বারা তিনি বাস্তবিকই অনতিক্রান্ত ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন।

১৯১৩, ২৭এ অগাস্ট স্কট্‌ল্যাণ্ডের গ্লাস্‌গো সহরে সেই সময়কার 'স্কটিশ চ্যাম্পিয়ন' জিমি ক্যাম্প্‌বেলের সংগে গোবর বাবুর কুস্তি হয় এবং সেই কুস্তিতে তিনি জয়ী হয়ে 'স্কটিশ্‌ চ্যাম্পিয়নশিপ্‌' লাভ করেন। কিন্তু তখন ক্যাম্প্‌বেলের চেয়েও বড় একজন স্কটিশ মল্ল ছিলেন, তাঁর নাম

ছিল জিমি এসেন্। এসেন্ তখন 'বৃটিশ এম্পায়ার রেস্ট্লিং চ্যাম্পিয়ন'। এই প্রসংগে বলা দরকার যে, সেই সময়ে ভারতবর্ষও বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কিন্তু সাম্রাজ্য বা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বলীদের বাছাই করবার জন্য সমস্ত প্রতিযোগিতাই ইংল্যাণ্ড ও অ্যামেরিকায় অনুষ্ঠিত হোত। কাজেই, এদেশে তখন খুব বড় বড় মল্ল থাকলেও পশ্চিম জগতে গিয়ে সরকারিভাবে শক্তি পরীক্ষা না দেওয়ায় তাঁদের ক্ষমতা স্বীকৃতি পেত না এবং এইজন্যই ভারতবর্ষের কোনো মল্লের সংগে শক্তি পরীক্ষা না দিয়েও জিমি এসেন্ 'বৃটিশ সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ মল্ল' ব'লে পরিচিত হয়েছিলেন। গোবর বাবু ইংল্যণ্ডে গিয়ে ঐ দেশের জন কয়েক নামজাদা মল্লকে পরাজিত করবার পর ক্রমশ তিনি জিমি ক্যাম্পবেল্ এবং জিমি এসেনের সংগে যুদ্ধ করবার সুযোগ পান।

জিমি এসেনের সংগে গোবর বাবুর প্রতিযোগিতা হয় এডিন্‌বরাতে ১৯১৩, ৩রা সেপ্টেম্বর। দেহের বিপুলতায় এসেন্ কিন্তু গোবর বাবুর চেয়ে কম ছিলেননা, বরং দৈর্ঘে বিরাটতর ছিলেন। তাঁর মাপ ছিল এই রকম:—

দৈর্ঘ	৭৫$\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি
বাহু (সংকুচিত)	১৮ ,,
গোছা (সংকুচিত)	১৫$\frac{১}{২}$,,
বুক (প্রসারিত)	৫০ ,,
উরু	৩০ ,,
মোচা (স্বাভাবিক)	১৭$\frac{১}{২}$,,

বয়স ও অভিজ্ঞতার বিচারে এসেন যদিও গোবর বাবুর ওপরে ছিলেন, কিন্তু শক্তি ও কুস্তি কৌশলে তিনি তাঁর অনেক নীচে ছিলেন। গোবর বাবু নিজেই একবার কথা প্রসংগে আমাকে বলেছিলেন যে, মল্ল

হিসাবে এসেনের মান বড় জোর ভীম ভবানী বা তাঁর নিজের ছাত্র বনমালী ঘোষের সমান ছিল। কিন্তু তা হ'লে কি হয়, ইওরোপে এসেনের সম্মান ও প্রতিপত্তি কম ছিলনা। অতএব কুস্তিতে অবতীর্ণ হয়েই এসেন্ যখন বুঝলেন, তাঁর সেই সম্মান ও প্রতিপত্তি আজ চূড়ান্ত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে, তখনই তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে অবৈধ পন্থার আশ্রয় নিলেন। তথাপি গোবর বাবু তাঁকে সহজেই গদীতে চেপে ধরলেন। প্রায় আধ ঘণ্টার চেষ্টায় এসেন্ ফের দাঁড়ালেন বটে, কিন্তু ৩৯ মিনিটের সময় গোবর বাবু ফের তাঁকে নীচে ফেলে চিৎ ক'রে দিলেন।

দ্বিতীয় লড়াইর সময় এসেন্ দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে গোবর বাবুকে দস্তুরমত কিল-ঘুসি-চড় মারতে সুরু করলেন। মধ্যস্থের বার বার হুঁসিয়ারিতেও যখন কোনো ফলোদয় হোল না, তখন কুস্তি বন্ধ ক'রে দিয়ে গোবর বাবুকেই জয়ী ঘোষণা করা হয়েছিল। এই যুদ্ধে জয় লাভ ক'রে গোবর বাবু 'বৃটিশ্ সাম্রাজ্যের কুস্তি প্রাধান্ত' অর্জন করেন, যা আর কোনো ভারতীয় পারেন নি।

ইংল্যাণ্ড থেকে গোবর বাবু অতঃপর প্যারিসে যান এবং সেখানে ১৯১৪ অব্দে বিশ্ব-প্রদর্শনীতে কুস্তি প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। এই প্রতিযোগিতায় পৃথিবীর নানা দেশের বহু শ্রেষ্ঠ মল্ল যোগদান ক'রেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিস্কো, কার্ল সাপ্ট্, পিটার্সেন ইত্যাদিও উপস্থিত ছিলেন। এখানে গোবর বাবু ভারতের পক্ষ থেকে একাকী প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে বিরাট খ্যাতির প্রতিষ্ঠা ক'রে ১৯১৫ অব্দে দেশে ফিরে আসেন।

অ্যামেরিকায় ভারতীয় পালোয়ান

গোবর বাবু যখন ইওরোপ অভিযানে লিপ্ত, সেই সময়ে ১৯১৩ অব্দে পঞ্জাবের জলন্ধর জেলার মধ্যম ওজন মল্ল বসন্ত সিং আমেরিকায় যান, এবং প্রকৃতপক্ষে সেখান থেকে তিনি আর দেশে প্রত্যাবর্তন করেননি। অবশ্য মল্ল হিসাবে তিনি দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্যে সেখানে যাননি; তাছাড়া, প্রথমদিকে তিনি পেশাদারও ছিলেননা। কিন্তু ১৯২৪ অব্দে তিনি পেশাদার মল্ল হয়ে যান এবং সেই সময় থেকে তাঁকে অ্যামেরিকা, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইতালি, গ্রীস, সুইডেন্, চেকোশ্লোভাকিয়া, ফিন্ল্যাণ্ড, নরওয়ে, জাপান ইত্যাদি নানা দেশের বহু শত মল্লের সংগে শক্তির পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। অ-পেশাদার মল্ল হিসাবেও তাঁকে কয়েক শত কুস্তি প্রতিযোগিতায় নামতে হয়েছিল এবং এইভাবেই তিনি অ্যামেরিকায় বিপুল খ্যাতির প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন।

বসন্ত সিং সম্পর্কে একবার ক্যালিফোর্নিয়ার একখানা সংবাদপত্র লিখেছিল, "বসন্তের মতো চতুর পালোয়ান আজো পর্যন্ত উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ায় আর কেউ আসেননি। তিনি ষাঁড়ের মতো বলী।" তাঁর দেহ-মনের সংযম সম্পর্কে ও-দেশের লোক আশ্চর্য হয়ে বলেছিল, "গরম দেশের মানুষ বসন্ত এদেশে শীতের সময়েও মদ স্পর্শ করেন না, ধূমপান পছন্দ করেন না এবং মাংসও তিনি কদাচিৎ খান। তাছাড়া, অন্যান্য পালোয়ানের মতো তিনি অতি ভোজনও করেন না, বরং তিনি মিতাহারী।"

'চীফ্ ইণ্ডিয়ান' মস্তার নামে আর একজন মল্লের কথাও শুনেছি যিনি ১৯১৩ অব্দে যুক্তরাষ্ট্রে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তিনি সেখানে যথেষ্ট জন-

প্রিয়তাও অর্জন ক'রেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর সম্পর্কে আর কোনো পরিচয়ই আমার জানা নেই।

১৯১৫, ডিসেম্বর মাসে টেক্সাসের হাউস্টনে মস্তারের সংগে চিকাগোর নাতি-গুরু ওজন মল্ল ডেমিট্র্যালের এক তীব্র লড়াই হয় এবং তাতে যদিও মস্তার যথাক্রমে ১৮ মিনিট ৩০ সেকেণ্ড এবং ৯ মিনিটে পরাজিত হন, তবু দর্শকরা তাঁর কুস্তিতে যথেষ্ট খুসী হয়েছিলেন এবং তাঁরা সর্বক্ষণ তাঁরই জয় কামনা করেছিলেন। হাউস্টনের মিঃ উয়েবেল্ এ সম্পর্কে বলেছিলেন :—

"এ দুটি মল্লকে দেখবার আগে আমি তাঁদের নামও শুনিনি। সেদিন সন্ধ্যায় ছোট-খাটো গোটা কয়েক কুস্তি হয়ে যাবার পরে এঁদের কুস্তি হোল। প্রথম এলেন ডেমিট্র্যাল্, তাঁর দেহের গঠন ছিল চমৎকার। সেকেণ্ড তিরিশেক পরেই কিছুটা বেটে, চামড়ার রং খানিকটা লাল্চে এবং বিদ্যুতের মতো চট্পটে মস্তার দেখা দিলেন। স্থির হোল, একজন ঠিকমতো চিৎ না হওয়া পর্যন্ত কুস্তি চলবে এবং 'কণ্ঠ-কুলুপ' (Head Lock) প্যাঁচ চলবে না। তাঁরা হাত মিলিয়ে একে অন্যকে ক্ষিপ্রতার সংগে নীচে ফেল্তে লাগলেন এবং ফের উঠে ঘুরে ঘুরে আক্রমণ চলল দু তরফ থেকেই। আমার মনে হোল, মস্তারই শ্রেষ্ঠতর। কিন্তু ডেমিট্র্যাল্ তাঁকে পায়ের প্যাঁচে নীচে ফেল্লেন। পরে মস্তারও অবশ্য পাল্টা তাঁর পায়ে 'মোজা' (Toe Hold) লাগিয়েছিলেন।

"সমস্ত দর্শক তখন মস্তারকে উৎসাহিত ক'রে চেঁচিয়ে উঠল 'ভেংগে ফেলো!' প্রায় দু মিনিট আংগুল মোচ্ড়ানোর পরে দুজনেই মঞ্চের নীচে প'ড়ে গেলেন এবং দুজন ধরাধরি অবস্থায়ই ফের মঞ্চে

উঠ্‌লেন। মস্তার আবার তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর পায়ে 'মোজা' লাগিয়ে নীচে ফেললেন এবং দর্শকরাও ফের চেঁচিয়ে বলল 'ভেংগে ফেলো, ভেংগে ফেলো'। ডেমিট্র্যালের পায়ের আংগুল বুঝি রবার বা ইস্পাতের তৈরী ছিল, নতুবা ঐ অবস্থায় যাতনায় তাঁকে চিৎ হতেই হোত। তিনি তো চিৎ হলেনই না, বরং এ থেকে মুক্ত হয়ে তিনি 'হাফ্‌ নেল্‌সন্‌', 'ফুল্‌ নেল্‌সন্‌', 'হ্যামার লক্‌' ইত্যাদি প্যাঁচের সাহায্যে ভারতীয়কে কাবু করতে প্রয়াসী হলেন। কিন্তু সে সবই বৃথা হয়ে গেল।

"আরো কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি এবং বেশ এক পশ্‌লা ঘুসি বৃষ্টির পরে ডেমিট্র্যাল্‌ তাঁর প্রতিপক্ষকে শূন্যে তুলে আছাড় মারলেন এবং যুগপৎ 'কাঁচি' ও 'মোজা' লাগিয়ে চিৎ ক'রে ফেললেন। সংগে সংগে দর্শকরা সরোষে চীৎকার ক'রে উঠল এবং মস্তার জখম পা নিয়ে তাঁর কোণে গিয়ে জিরুতে বসলেন।

"দ্বিতীয় বারের পরাজয়ও প্রায় সেই কায়দায় ঠিক নয় মিনিটে ঘটল এবং মস্তারের কাঁধ মাটি ছোঁবার আগেই তিনি হতচৈতন্য হয়ে গিয়েছিলেন।"

মিঃ উয়েবেলের এই বিবরণের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট বোঝা যায়, মস্তার সর্বক্ষণ যথানিয়মে লড়াই করেছিলেন এবং ডেমিট্র্যাল্‌ অবৈধভাবে লড়ছিলেন ব'লেই মস্তার সর্বক্ষণ দর্শকদের সহানুভূতি আকর্ষণ করেছিলেন; পক্ষান্তরে ডেমিট্র্যাল্‌ বিরক্তি ও বিতৃষ্ণার পাত্র হয়েছিলেন। কাজেই মনে হয়, পরাজিত হ'লেও মস্তারের জনপ্রিয়তা ও গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়নি।

অ্যামেরিকার পথে গোবর

প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের কারণে বছর কয়েক ভারতীয় মল্লরা আন্তর্জাতিক কুস্তির ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি। অবশ্য, ১৯১৫ অব্দে কলিকাতায় সুবোধকৃষ্ণ বসু আম্‌ডেন্ নামে জনৈক ডাচ্চ্ মল্লকে হারিয়ে থাকলেও তা তেমন উল্লেখযোগ্য ছিলনা এবং সুবোধবাবু ঠিক মল্লও ছিলেন না। তারপরে ১৯১৯ অব্দে ফোন্ এন্‌ডেন্ নামে যে নরওয়েজিয়ান মল্ল এদেশে এসেছিলেন ব'লে কেউ কেউ বলেন, আমার মনে হয়, তিনি আম্‌ডেন্ ছাড়া আর কেউ নন। কিন্তু এন্‌ডেন্ ও অ্যাম্‌ডেন স্বতন্ত্র হোন, বা একই ব্যক্তি হোন, মল্ল হিসাবে তাঁদের কোনো কৃতিত্ব ছিল না এবং তাঁরা এদেশের দ্বিতীয় শ্রেণীর পালোয়ানদের সংগেও শক্তি পরীক্ষা দেবার সুযোগ পাননি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ভারতীয় কুস্তির ইতিহাসে প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হোল গোবর বাবুর অ্যামেরিকা অভিযান। ১৯১৫ অব্দে ইওরোপ থেকে ফিরবার দু বছর পর থেকেই অ্যামেরিকার মল্ল-সমাজ তাঁকে বারংবার অ্যামেরিকায় যাবার জন্য আমন্ত্রণ করতে থাকেন। বলা বাহুল্য, এর আগে সে-দেশ থেকে এরূপ সাদর আহ্বান এ-দেশের আর কোনো মল্ল পাননি। কেননা, মাত্র ২০।২২ বছর বয়সের এমন 'শিক্ষিত' ও 'সুসভ্য ভারতীয় পালোয়ান' তৎকালীন ইওরোপ ও অ্যামেরিকার কাছে সত্য সত্যই এক দর্শনীয় ব্যক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাছাড়া, রামমূর্তির মতো গোবর বাবুও সেদেশে 'প্রিন্স' নামে পরিচিত হয়েছিলেন। তবে রামমূর্তির সংগে গোবর বাবুর প্রভেদ ছিল দুস্তর ;

রামমূর্তি শক্তির ক্ষেত্রে এসেছিলেন পিছিয়ে, আর গোবর বাবু শুধু এগিয়ে যাননি, এগিয়ে জয়ীও হ'য়েছিলেন প্রায় সর্বত্র।

যাই হোক, অ্যামেরিকার কুস্তিপ্রিয় বিভিন্ন ব্যক্তির সংগে পত্রাপত্রি ক'রে গোবর বাবু শেষ পর্যন্ত মিঃ এডওয়ার্ড ডেল্‌মুকের ব্যবস্থায় রাজী হয়ে ১৯২০, ২৬এ অক্টোবর তাঁর প্রিয় ছাত্র ও প্রথিতযশা মল্ল বনমালী ঘোষকে নিয়ে অ্যামেরিকা যাত্রা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তখন পশ্চিম দুনিয়ার অবিজিত ও শ্রেষ্ঠ মল্ল গচ্চের মৃত্যু হয়েছে। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি গোবর বাবু ইংল্যাণ্ডে উপস্থিত হন এবং সেখান থেকে হোয়াইট স্টার লাইনার এস্ এস্ আড্রিয়াটিক্ জাহাজে রওনা হয়ে ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি আমেরিকার কূলে হফ্‌ম্যান দ্বীপে পৌছান। কিন্তু একবারেই তাঁকে নিউইয়র্কে ঢুকতে দেওয়া হয়নি; দিন ২০ পরে তাঁকে এলিস্ দ্বীপে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বহু প্রশ্ন-পরীক্ষার পরে জানুয়ারি মাসের শেষাংশে তাঁকে নিউইয়র্ক যাবার অনুমতি দেওয়া হয়। বিভিন্ন প্রশ্নাদির মধ্য দিয়ে দেখা গেছে, একেবারে গোড়া থেকেই অ্যামেরিকার 'লালাতংক' ছিল; তাই রাশিয়ার বল্‌শেভিক্ দলের সংগে গোবর বাবুরও যোগ ছিল কিনা অতি নিন্দনীয়ভাবে তা পুংখানুপুংখরূপে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল।

মধ্যস্থের পক্ষপাতিত্ব

গোবর বাবু প্রথম যেদিন নিউইয়র্ক উপস্থিত হন, সেদিনই তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গুরু ওজন মুষ্টিবীর (World's Heavy weight Boxing

Champion) জ্যাক্ ডেম্প্‌সির সংগে বিল্ ব্রেননের 'বিশ্ব প্রাধান্যের' জন্য লড়াই হয়েছিল। গোবর বাবুও এই যুদ্ধ দেখতে গিয়েছিলেন; বারো চক্রের শেষ চক্রে 'র‍্যাবিট্ পাঞ্চ'এর জোরে ডেম্পসি ব্রেনন্‌কে 'নক আউট' করতে সমর্থন হয়েছিলেন।

এই যুদ্ধ উপলক্ষে সেদিন সেখানে অ্যামেরিকার বহু শ্রেষ্ঠ মল্ল ও মুষ্টিক উপস্থিত হয়েছিলেন। গোবর বাবুর ম্যানেজার মিঃ ডেলিভাক্ তাঁকে তাঁদের সংগে পরিচিত করিয়ে দেন এবং লড়াইর পূর্বেও তাঁকে মঞ্চে তুলে সমগ্র জনতার কাছে পরিচয় জ্ঞাপন করেছিলেন। লড়াইর পরে গোবর বাবুর সংগে অ্যামেরিকার প্রসিদ্ধ মুষ্টি প্রমোটার মিঃ জ্যাক্ কার্লীরও পরিচয় হয় এবং মিঃ কার্লী ও মিঃ ডেলিভাক্ তাঁকে দিন দশেকের মধ্যেই হল্যাণ্ডের সেবা মল্ল টমি ড্রাকের সংগে কুস্তি লড়তে রাজী হবার জন্য তখুনি ধ'রে বস্‌লেন। কিন্তু গত তিন মাসের ওপর কুস্তি ও ব্যায়ামের অনভ্যাস, এবং জাহাজে অবস্থান, তদুপরি অ্যামেরিকার জলবায়ুর সংগে অ-পরিচয়, বিশেষ করে অ্যামেরিকান রীতিনীতির অনভিজ্ঞতা—এইসব কথা চিন্তা ক'রে গোবর বাবু এত তাড়াতাড়ি কোনো প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে চাইলেন না। কিন্তু মিঃ কার্লী ও মিঃ ডেলিভাকের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত তিনি রাজী হতেও বাধ্য হন এবং সেই অনুযায়ী পরবর্তী ৩০এ জানুয়ারি, রবিবাব, এই কুস্তি হবার দিন স্থিরীকৃত হয়ে গেল।

গোবর বাবুর হাতে তখন মাত্র দশ দিন ছিল। অনেক চেষ্টা ফিকিরের পরে হাল্কা ওজনে অপরাজিত বিশ্ব-মল্লবীর (Undefeated Light weight Wrestling Champion of the World) জর্জ বোথ্‌নারের ব্যায়ামশালায় গোবর বাবু ব্যায়াম ও কুস্তি করবার অনুমতি পান এবং উপযুক্ত কুস্তি-সংগীর (Wrestling partner) অভাবে

তিনি বনমালীর সংগেই কোনো রকমে সে-কাজ সারতে লাগলেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে কুস্তি প্রতিযোগিতার দিন সমাগত হোল।

এখানে প্রসংগক্রমে বড় বড় লড়াইর দু একটা দুর্নীতির কথা বল্‌ব। গোবর বাবুর সংগে বিভিন্ন সময়ে কথাবার্তার মধ্য দিয়ে লক্ষ্য করেছি, তিনি অসাধারণ আত্মপ্রত্যয়ী ব্যক্তি এবং বহুবার তিনি অত্যন্ত জোরের সংগে বলেছেন যে, ন্যায়-সংগত কুস্তিতে তিনি জীবনে কখনো পরাজিত হন নি; এসব ক্ষেত্রে হয় তিনি জয়ী হয়েছেন, নয়তো বা কুস্তি সমান গিয়েছে। কেউ কেউ হয়তো এটাকে তাঁর দাম্ভিক উক্তি মনে ক'রে নেবেন। তা হতেও পারে। কিন্তু এই কথার মধ্যে কোনো মিথ্যা বা অতিরঞ্জন আছে ব'লেও আমার মনে হয়না। কারণ, তাঁর যতগুলো কুস্তির বিবরণ অন্তত আমার জানা আছে, তার একটিতেও তিনি ন্যায়-বিচারে হারেন নি।

এখন, এই ধরণের বড় বড় কুস্তিতে কিরূপ দুর্নীতি বা কি কি কারণে অনেক সময় ফলাফল উল্টো হয়, তা বল্‌ছি। প্রথমত, কোনো প্রতিযোগী নিজেই প্রতিপক্ষের কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে স্বেচ্ছায় পরাজয় বরণ করতে পারে। দ্বিতীয়ত, কোনো এক পক্ষ থেকে ঘুষ নিয়ে মধ্যস্থ পক্ষপাতিত্ব ক'রে অপর পক্ষকে পরাজিত ঘোষণা করতে পারেন। তৃতীয়ত, মধ্যস্থ ঘুষ না নিয়েও তাঁর অনুরক্ত বা পছন্দসই যে-কোনো মল্লকে জয়ী ঘোষণা ক'রে দিতে পারেন। চতুর্থত, কোনো মল্ল মধ্যস্থের অলক্ষ্যে তাঁর প্রতিপক্ষকে বে-আইনী চোটে কাবু ক'রে দিয়ে জয়ী সাব্যস্থ হতে পারে, যে-ক্ষেত্রে মধ্যস্থের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'লে তার নিজেরই বাতিল (Disqualified) হবার কথা। পঞ্চমত, কোনো প্রতিযোগীর দেহের কোনো অংশ রোগগ্রস্থ বা সাময়িক বেদনাক্লিষ্ট থাকলে এবং

সেখানে বিশেষ ধরণের চোট পেলে তাকে পরাজয় স্বীকার করতে হতে পারে। ষষ্ঠত, মধ্যস্থ নিজেও ভুল দেখে বা ভুল ধারণা ক'রে কাকেও পরাজিত ঘোষণা করতে পারেন। সপ্তমত, অজানিতভাবে নিয়মগত ভুল ক'রেও কোনো প্রতিযোগী পরাজিত গণ্য হতে পারে। অষ্টমত, কোনো আকস্মিক আঘাতেও কোনো প্রতিযোগী সাময়িকভাবে জখম হয়ে হেরে যেতে পারে। এ ছাড়া, নানা ধরণের অন্য কারণও ঘটতে পারে যার জন্য সময়ে সময়ে অত্যন্ত যোগ্য ব্যক্তিকেও পাকে-চক্রে পরাজিত হতে হয়, তার কিছু কিছু উদাহরণ পাঠকরা পরে পরে এই বইতেই পাবেন।

এইবার আবার আসল কথায় ফিরে আসি। ১৯২১, ৩০ এ জানুয়ারি নিউইয়র্কের ব্রুক্লী পল্লীতে রাত্রি ১০॥ টায় গোবর বাবু ও টমি ড্রাকের মধ্যে কুস্তি হয়। কুস্তির পূর্বে দেখা গেল, উচ্চতায় গোবর বাবু ও টমি ড্রাক্ সমান, ৭৩ ইঞ্চি; কিন্তু ওজনে গোবর বাবু একটু বেশী, তাঁদের ওজন ছিল যথাক্রমে ২৫৭ পাউণ্ড ও ২৩৯ পাউণ্ড।

গোবর বাবু ও ড্রাক্ হাত মিলিয়ে কুস্তি সুরু করলেন। প্রথম কিছুক্ষণ দুজনই দুজনের হিম্মৎ বুঝবার চেষ্টা করলেন; তারপরেই গোবর বাবু সহসা পিছিয়ে এসে ড্রাক্কে তীব্রবেগে আক্রমণ করলেন। ড্রাক সেই আক্রমণ থেকে 'অব্যাহতি পাবার জন্য ত্বরিতে পাশে ঘুরে দাঁড়ালেন বটে, তবু গোবর বাবু ডুব মেরে বাম পাশ থেকে দুহাতে তাঁর কোমর চেপে ধরলেন এবং প্রায় সওয়া তিন মন ওজনের ড্রাক্কে বস্তার মতো শূন্যে ঘুরিয়ে নীচে আছাড় মারলেন। ড্রাক্ কিন্তু মাটিতে প'ড়েও ঠিক চিৎ হলেন না এবং গোবর বাবুর একখানা হাতের ওপর নিজের দেহ-ভার দিয়ে বজ্রবলে তা ধ'রে রইলেন, হাজার চেষ্টা ক'রেও গোবর বাবু তা ছাড়াতে পারলেন না,—তিনি সবিস্ময়ে দেখলেন, তাঁর সেই

হাতখানা যেনো যাতি-কলে (Vice) আট্‌কে আছে এবং সেই হাতকে অবলম্বন ক'রেই ড্রাকের পিঠ মাদুর মুক্ত রয়েছে।

এইভাবে মিনিট পাঁচেক কাটবার পর ড্রাক্ সহসা একটি 'লেগ্ সিজার্‌স্' প্যাঁচের সাহায্যে বিস্ময়কর কৌশলে গোবর বাবুকে পাল্টা নীচে ফেললেন এবং মারাত্মক 'টো হোল্ড' প্যাঁচের জোরে তাঁকে চিৎ করবার প্রয়াস পান। কিন্তু ড্রাকের সমস্ত প্রচেষ্টা বিফল হয়ে গেল, যদিও বার কয়েক তিনি গোবর বাবুকে কাৎ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। অবশ্য, গোবর বাবুও প্রথমবার ড্রাক্‌কে কাৎ অবস্থায়ই রেখেছিলেন। কিন্তু ড্রাক্ গোবর বাবুকে চিৎ করবার চেষ্টায় যে অমানুষিক মার-পিট করেছিলেন, সমগ্র প্রেক্ষাগৃহ তাতে বিস্ময়ে হতবাক্ হলেও মধ্যস্থ নীরবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা উপভোগ করেছিলেন। পরের দিন 'নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ড' এর বিবরণে বলা হয়েছিল, "আমরা জীবনে কখনো কোনো মল্লকে প্রতিদ্বন্দ্বীর এরূপ অমানুষিক অত্যাচার এমন নীরবে সহ্য করতে দেখিনি।" বাস্তবিকই তা। প্রকৃত খেলোয়াড়ী মনোভাব নিয়ে গোবর বাবু শক্তির পরীক্ষা দিতে গিয়ে শক্তির পরীক্ষাই দিতেন, তিনি কখনো মারামারির পরীক্ষা দিতেননা। সে যাক, প্রায় আধ ঘণ্টা কাল গোবর বাবু ড্রাকের এই মার নীরবে হজম ক'রে ড্রাক্‌কে পাল্টা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হলেন এবং 'হাফ্ নেল্‌সন' প্যাঁচ লাগাতে গিয়ে নিজেই স্বেচ্ছায় কাৎ হলেন। ঠিক এই অবস্থাটিকেই সুবর্ণ সুযোগ মনে ক'রে মধ্যস্থ হঠাৎ বাঁশী বাজিয়ে ড্রাকের পিঠ চাপড়ে দিলেন অর্থাৎ তিনি ড্রাক্‌কেই জয়ী ঘোষণা করলেন। কিন্তু দেখা গেল, সমগ্র প্রেক্ষাগৃহে কেউ উৎসাহ পোষণ করলেন না, মধ্যস্থের এই প্রত্যক্ষ পক্ষপাতিত্বে তাঁরাও বিস্মিত, হতবাক্। গোবর বাবু জানতেন, ভুল হোক, শুদ্ধ হোক বা স্বেচ্ছাকৃত হোক, মধ্যস্থের রায় কখনো পরিবর্তিত

হবার নয়। কাজেই তিনি অনুচ্চ সামান্য প্রতিবাদ জানিয়েই নত মস্তকে মঞ্চ ত্যাগ করলেন।

পর দিন দেখা গেল, নিউ ইয়র্কের প্রধান প্রধান পত্রিকায় মধ্যস্থের এই হঠকারিতার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। অতএব পরাজিত হয়েও গোবর বাবু মনে মনে তৃপ্তি লাভ করলেন এই মনে ক'রে যে মধ্যস্থের পক্ষপাতিত্ব সকলের চোখেই ধরা পড়েছে।

গোবরের পাল্টা জবাব

টমি ড্রাকের কাছে এই অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের পরে গোবর বাবু বেশ কিছুদিন নীরব রইলেন এবং এই সময়ের মধ্যে তিনি শুধু অ্যামেরিকান জলবায়ুর সংগে নিজেকে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করলেন, সংগে সংগে চল্‌ল উপযুক্ত কুস্তির অভ্যাস ও ব্যায়ামানুশীলন। এর পরে ১৪ই মার্চ চিকাগো সহরের 'চিকাগো কলোসিয়ামে' তিনি বোহেমিয়ার 'অজেয়' ব'লে অভিহিত জোসেফ্ স্কাল্‌জের সংগে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। স্কাল্‌জ্ ছিলেন গোবর বাবুর চেয়েও কিছুটা উঁচু—৭৫ ইঞ্চি। এই যুদ্ধে গোবর বাবু অতি সহজে স্কাল্‌জ্‌কে কাবু করে ফেললেন এবং কার্যত ২১ মিনিটে জয়ী হলেন।

এই জয়লাভের পরেই গোবর বাবুর কর্মাধ্যক্ষ মিঃ ডেলিভাক্ টমি ড্রাকের সংগে তাঁর ফিরতি যুদ্ধের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। গোবর বাবু তৎক্ষণাৎ সানন্দে সম্মত হলেন। কিন্তু ড্রাক্ পূর্ববারে জয়ী হয়েছিলেন ব'লে তাঁকে হারিয়ে নষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য গোবর

বাবুর তরফ থেকেই বেশী আগ্রহ হবে মনে ক'রে এবার ড্রাক্ নিজের সুবিধামত সর্ত উপস্থাপন করলেন। এই সর্তগুলোর একটি হোল, ড্রাক্ হারুন বা জিতুন অথবা সমানই থাকুন, তাঁকে এক হাজার ডলার দিতেই হবে। দ্বিতীয় সর্ত, টিকেট বিক্রীর তিরিশ শতাংশও তাঁকেই দিতে হবে। তৃতীয় সর্ত, প্রস্তাবিত কুস্তির মধ্যস্থ থাকবেন তাঁর নিজের নির্বাচিত জর্জ বোথ্‌নার। চতুর্থ সর্ত, কুস্তি অনুষ্ঠিত হবে বাফেলো সহরে পরবর্তী ১৯ এ এপ্রিল।

গোবর বাবুর কর্মাধ্যক্ষ মিঃ ডেলিভাক্ তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, এইসব সর্তে লড়তে গেলে ব্যবসার দিক থেকে গোবর বাবুর বিশেষ লাভ হবেনা। কিন্তু গোবর বাবু তাঁর অন্যায় পরাজয়ের প্রতিশোধ দেবার জন্য তখন এতই অধীর হয়ে উঠেছিলেন যে, আর্থিক লাভ-লোকসানের প্রশ্ন ছেড়ে দিয়ে হৃত-গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য সেই সব সর্তেই রাজী হয়ে গেলেন।

ইতিমধ্যে কঠিন ব্যায়াম ও কুস্তির দ্বারা গোবর বাবু তাঁর দেহের ওজন কমিয়ে ২৪৫ পাউণ্ডে নামিয়েছিলেন। ১৯ এ এপ্রিল বাফেলো সহরের 'ব্রডওয়ে অডিটরিয়ামে' তাঁদের এই ফিরতি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এবার কুস্তির গোড়া থেকেই গোবর বাবু তীব্রভাবে আক্রমণ ক'রে ড্রাক্‌কে দিশেহারা ক'রে দিলেন। ড্রাক্ তাঁর থেকে নিস্তার পাবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে থাকেন—ছুটে পালাবার চেষ্টাও করেছিলেন। তথাপি গোবর বাবু সহজেই তাঁকে আয়ত্বের মধ্যে নিয়ে এলেন এবং দুহাতে শূন্যে তুলে সোজা আছাড় মারলেন। সংগে সংগে 'ক্রচ্' ও 'হাফ্ নেল্‌সন' প্যাঁচের সাহায্যে ১৮ মিনিট ২০ সেকেণ্ডে ড্রাক্‌কে সম্পূর্ণরূপে চিৎ ক'রে দিলেন।

এই আছাড় খেয়ে ড্রাক্ এমন নিরাশ ও হতবল হয়ে পড়েছিলেন যে,

দ্বিতীয়বারের জয়লাভ গোবর বাবুর পক্ষে আরো সহজ হয়ে গেল। এইবার গোবর বাবু তাঁকে 'ক্রচ্ লক' দ্বারা সহজেই গদীতে চেপে ধ'রে ৪ মিনিট ৫০ সেকেণ্ডে জয়লাভ করলেন।

এই জয়ের পরে সারা অ্যামেরিকায় গোবর বাবুর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে; বিভিন্ন পত্রিকাগুলিও খুসী হয়ে স্বীকার করেছিল যে, পূর্ব বারের প্রতিশোধ গোবর বাবু ঠিক মতোই গ্রহণ করেছেন।

গোবরের 'বিশ্ব-কুস্তি প্রাধান্য' লাভ

এই সময়ে গোবর বাবুর সংগে অ্যামেরিকার সুপ্রসিদ্ধ মল্ল এড্ওয়ার্ড 'ষ্ট্র্যাংলার' লিউইসের কুস্তির প্রস্তাব হয়। 'কণ্ঠরোধ' (Strangle hold) প্যাঁচে অমোঘ নৈপুন্য অর্জন করার জন্যই লিউইসের নামের সংগে 'ষ্ট্র্যাংলার' শব্দটি যুক্ত হয়ে আছে। অবশ্য এই প্যাঁচে অমোঘ নৈপুণ্য অর্জনে তিনি প্রথম ব্যক্তি নন। তাঁরও বহু পূর্বে, প্রায় এক পুরুষ (Generation) আগে, আর একজন অ্যামেরিকান মল্ল এরূপ নামে আখ্যাত হয়েছিলেন; তিনি ছিলেন ইভান 'ষ্ট্র্যাংলার' লিউইস। ইভান্ ও এড ওয়ার্ড দুজনই জাতিতে জার্মান—দুজনই অ্যামেরিকায় জ'ন্মে সে-দেশেরই জল-বায়ুতে বড় হয়েছিলেন। তবে এই সাংঘাতিক প্যাঁচের অপপ্রয়োগে এড্ওয়ার্ড লিউইস্ যেমন কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন, ইভান তেমন করেননি।

১৯২১, অক্টোবর মাসে ক্যান্সাস্ প্রদেশের উইচিটা সহরে গোবর বাবুর সংগে এড্ওয়ার্ড 'ষ্ট্র্যাংলার' লিউইসের কুস্তি হয়। এই বছরের

গোড়ার দিকে লিউইস্ জোসেফ্ স্টেচারকে হারিয়ে 'গুরু ওজনে বিশ্ব-কুস্তি প্রাধান্য' পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু তার অল্পকাল পরেই তিনি পোল্যাণ্ডের ভুবন বিখ্যাত মল্ল স্টানিস্লস্ বিস্কোর হাতে পরাজিত হয়েছিলেন। অতএব লিউইস্ তখন ও-দেশের প্রথম শ্রেণীর একজন প্রধান মল্ল ছিলেন, একথা বলাই বাহুল্য। তথাপি তিনি গোবর বাবুর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হলেন। অ্যামেরিকার কুস্তিপ্রিয় অধিকাংশ মানুষ এতে বিস্মিত হয়ে গেল—তারা অন্তত একজন কালো আদমীর কাছে লিউইসের এই পরাজয় কখনই আশা করেনি।

পরের বছর ২৪ এ অগাষ্ট সান্ ফ্রান্সিস্কো নগরে গোবর বাবুর সংগে অ্যামেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মল্ল অ্যাড্ সাণ্টেলের প্রতিযোগিতা হয়। এখানে প্রসংগক্রমে একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় বলা দরকার।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জাতিব মিলন ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে ক্রমশ বহু বিষয়ের আদান-প্রদান ও সামঞ্জস্য ঘটেছে, এ-বিষয়ে কারুই দ্বিমত নেই। কুস্তি-বিজ্ঞানেও সেই রকম কিছু কিছু পরিবর্তন অবশ্যই ঘটেছে। এসবের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাধারণত দুজন বলীর শক্তির মান নিরূপণ করতে তাদের দৈহিক ওজন অনুসারে শক্তির পরীক্ষা হওয়া দরকার। ধরা যাক, একজন মল্লের দেহভার ১৫০ পাউণ্ড এবং আর একজনের ২৫০ পাউণ্ড। এখন, এই দুজনের মধ্যে প্রতিযোগিতা হ'লে সাধারণত দেখা যাবে, ক্ষুদ্রদেহী মল্লটি অপেক্ষাকৃত বলী ও কুশলী হয়েও হয়তো বিশালতর মল্লকে আয়ত্তে আনতে পারছে না। তার কারণ, ২৫০ পাউণ্ড বোঝাটাই উপেক্ষা করবার মতো নয়; আর সেই বোঝাটাই যখন একটা সচল মানুষ হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বীকে পাল্টা আক্রমণ করতে থাকে, তখন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দেহীর পক্ষে বিপজ্জনক অবস্থায় পড়াই স্বাভাবিক! এইজন্য

যথাসম্ভব সমান সমান ওজনে শক্তির পরীক্ষা হওয়াই বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী।

পাশ্চাত্য দেশ এই বৈজ্ঞানিক সত্যটিকে প্রথম অনুধাবন করেছিল এবং সেইজন্যই তারা শক্তির বিভিন্ন পরীক্ষার ক্ষেত্রে শ্রেণী বিভাগ করেছে। ভারতবর্ষে এই শ্রেণী বিভাগের মূল্য অল্প দিন পূর্বেও স্বীকৃত হোতনা। মুষ্টিযুদ্ধটি নেহাৎ বিদেশী ব'লে এবং পাশ্চাত্য ঢংয়ের ভারোত্তোলন এদেশে চালু হওয়ায় মুষ্টিযুদ্ধ ও ভারোত্তোলনের ক্ষেত্রে গোড়া থেকেই শ্রেণী বিভাগ হয়েছিল। কিন্তু কুস্তিতে বহু দিন পর্যন্ত তা হয়নি। এমন কি, ১৯৩৫ অব্দের ৫ই মে আমি যখন ইতিহাসবিদ ডক্টর হেমচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে 'নিখিল বংগীয় শরীর-চর্চা প্রচার সমিতি'র অধিবেশনে এই শ্রেণী বিভাগের অত্যাবশ্যকীয়তার উল্লেখ ক'রে প্রথম প্রবন্ধ পড়ি, তখন আমি ভারতীয় কুস্তির স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য নষ্ট করতে উদ্‌যোগী হয়েছি ব'লে একটি 'ব্যায়াম সমিতি'র জনৈক প্রতিনিধি সাংঘাতিক আপত্তি ও প্রতিবাদ তুলেছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত আনন্দের কথা যে, শীঘ্রই তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। এমন কি, শ্রেণী বিভাগের ভিত্তিতে তিনি নিজেই তাঁদের সমিতির মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথম ভারতীয় কুস্তি প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করেছিলেন। সে যাক। পাশ্চাত্য নিয়মানুসারে তখন কুস্তিতে ব্যাণ্টাম, ফেদার, লাইট, মিড্‌ল্‌, লাইট্‌ হেভি এবং হেভি ওয়েট শ্রেণী প্রচলিত ছিল। সব চেয়ে কম ওজনের মল্লরা ব্যাণ্টাম শ্রেণীতে বিবেচিত হোত এবং ক্রমান্বয়ে শ্রেণী নির্বাচিত হয়ে সব চেয়ে বেশী ওজনের মল্লরা হেভি শ্রেণীর অন্তর্গত হোত।

অ্যাড্‌ সাণ্টেল্‌ ছিলেন হেভি ওয়েট দলের ঠিক নীচেই লাইট্‌ হেভির দলে, এবং এই শ্রেণীতে তিনি ছিলেন বিশ্ব-বিজেতা। এর অর্থ

এই যে, সেই সময় এই দলের আর কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না। অতএব সাধারণতই তখন তাঁর যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী বাছাই করা চল্‌তে পারত হেভি ওয়েট দলে এবং এই সূত্রেই গোবর বাবুর সংগে তাঁর প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়েছিল। এই যুদ্ধে গোবর বাবু সাণ্টেল্‌কে শোচনীয়রূপে পরাজিত ক'রে অ্যামেরিকান মল্ল-সমিতি কর্তৃক সরকারি ভাবে 'বিশ্বের নাতি-গুরু ওজন মল্ল-প্রাধান্য (World's Light Heavy weight Wrestling Championship) লাভ করেছিলেন যা আজো' পর্যন্ত আর কোনো ভারতীয়ের দ্বারা সম্ভব হয়নি।

লিউইসের বর্বরোচিত জয়

গোবর বাবুর সংগে প্রথম বারের যুদ্ধে লিউইস্ পরাজিত হ'লেও গোবর বাবু 'বিশ্বের গুরু ওজন মল্ল প্রাধান্য' (World's Heavy weight Wrestling Championship) পাননি; কেননা, তার কিছুদিন পূর্বেই বিস্কো লিউইসের কাছ থেকে ঐ লোভনীয় 'জগজ্জয়ী' পদবী কেড়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু লিউইস ১৯২২, ৩রা মার্চ উইচিটা সহরে পাল্টা লড়াই ক'রে বিস্কোর হাত থেকে 'জগজ্জয়ী' পদবী দখল করেন। অগাস্ট মাসে 'লাইট হেভি ওয়েট্ জগজ্জয়ী' খেতাব পাবার পরে গোবর বাবুর খ্যাতি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। এর ঠিক মাসখানেকের মধ্যে সেপ্টেম্বর মাসে লিউইসের সংগে গোবর বাবুর প্রতিযোগিতা হয় সান্ ফ্রান্সিস্কো নগরে। অর্থাৎ এই লড়াইটি 'বিশ্বের হেভি ওয়েট্ কুস্তি প্রাধান্য' উপলক্ষ ক'রে হয়েছিল। অতএব একথা বলাই বাহুল্য যে, এটা ছিল মল্ল-জগতের এক ঐতিহাসিক সংঘর্ষ যাতে গোবর বাবু এবং

লিউইসের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষ ও অ্যামেরিকা নেমেছিল। বোধ হয়, সেইজন্তই লিউইস্ ও মধ্যস্থ ষড়যন্ত্র ক'রে সেদিন যে বর্বরোচিত কাজ করেছিলেন, মল্ল-জগতের ইতিহাসে তা চিরদিন এক গুরুতর কলংক স্বরূপ লিপিবদ্ধ থাকবে।

প্রকৃত পক্ষে, এক শতাব্দী আগে যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি মহামতি আব্রাহাম্ লিংকল্ন্ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারা অ্যামেরিকার বর্ণ-বৈষম্য নিরোধক আইন চালু ক'রে গেলেও বর্ণ-বৈষম্য বা কালো আদ্মীর ওপর ব্যবহারিক অত্যাচার এখনো পর্যন্ত আমেরিকার জাতিগত বৈশিষ্ট্য হয়েই আছে। মানব-প্রেমিক যে মার্কিনে পূর্বে ছিলেননা বা এখনো নেই, এমন নয় ; কিন্তু তাঁদের অস্তিত্ব অমানুষের অত্যাচারে এবং দুষ্কার্যের অন্ধকারে চাপা পড়ে আছে। ইতিহাস এবং রাজনীতির সমঝ্দারেরা অ্যামেরিকার এই বর্ণ-বৈষম্যের সংগে অবশ্যই ঘনিষ্টভাবে পরিচিত আছেন। অবশ্য, একমাত্র সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া অধিকাংশ শেতাংগ রাষ্ট্রেই কম-বেশী বর্ণ-বৈষম্য বিদ্যমান। কিন্তু এ-বিষয়ে অ্যামেরিকা সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে—বিদ্যালয়, হোটেল, রেস্টোরাণ্ট, প্রেক্ষাগৃহ, খেলাধুলা, উপাসনা,—সমস্ত ক্ষেত্রেই অ্যামেরিকান্দের কৃষ্ণাংগ-বিদ্বেষ সুপরিস্ফুট। কেননা, সেখানে এখনো পর্যন্ত অমানুষের রাজত্ব দূরীভূত হয়নি। প্রখ্যাতনামা নিগ্রো মুষ্টিক পিটার জ্যাক্সন্, জ্যাক জন্সন, জোসেফ্ লোইস্ ইত্যাদিকে কিরূপ অগ্নি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে আপন আপন গৌরব প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল, দুনিয়ার ব্যায়ামী সমাজ এবং সভ্য মানুষ তা অত্যন্ত বিস্ময়ের সংগে লক্ষ্য করেছেন। অ্যামেরিকা পরিভ্রমণের সময়ে গোবর বাবুকেও মধ্যে মধ্যে এরূপ অমানুষিক অবস্থার চাপ সহ্য করতে হয়েছিল। সাধারণ লোকের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। জাতি ধর্ম ও কালের গণ্ডীকে উত্তীর্ণ ক'রে যিনি সকল

দেশে সকল মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন, সেই বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষও অ্যামেরিকায় কালো চামড়ার অপরাধেই নিগৃহীত হয়েছিলেন, একথা কে না জানেন? এবং ব্যক্তিগত অপমানকে উপেক্ষা করে শুধু মাত্র কালো মানুষের তরফ থেকে এই ব্যবহারের বিরুদ্ধে তিনি কী তীব্র ও মর্মান্তিক প্রতিবাদ করেছিলেন, তা-ই বা কে না জানেন? বাকি জীবনে আর তিনি অ্যামেরিকায় যাবেন না বলে স্থির করেছিলেন তো এইজন্যই। সে যাক। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্মান 'কালো আদমীর' কবলিত হবে, এ ধারণাতেই অ্যামেরিকানরা উন্মাদ হয়ে যায়। অতএব তার পরিপ্রেক্ষিতে তারা যে-কোনো জঘন্য কাজ করতেও ইতস্তত করবেনা, এটাই তো স্বাভাবিক। লিউইসের হাতে গোবর বাবুর এবারকার পরাজয় তারই এক চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত!

পূর্বেই বলেছি এবারকার লড়াই ছিল কুস্তি জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানের জন্য এবং এই যুদ্ধের ফলাফলের ওপর নির্ভর করছিল—এই সম্মান সাদা আদমীর কবলিতই থাকবে, কিংবা কালো আদমীর করায়ত্ত হবে। অতএব কুস্তির সুরুতেই লিউইস্ ক্ষিপ্ত কুকুরের মতো গোবর বাবুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং যে-কোনো উপায়ে গোবর বাবুকে গদীতে চেপে ধরলেন। বিরামান্তে দ্বিতীয় দফার কুস্তিতেও লিউইস্ তাঁর উন্মত্ততার পুনরাবৃত্তি করলেন বটে, কিন্তু গোবর বাবু মহা ধৈর্যের সংগে তাঁর বর্বরোচিত আক্রমণকে প্রতিহত ক'রে লিউইস্‌কে পাল্টা চিৎ করলেন। পশ্চিমী কুস্তির সাধারণ নিয়মানুসারে দুবারে দুজন মল্ল জয়ী হওয়ায় চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য তাঁদের মধ্যে তৃতীয়বার কুস্তি হয়। তৃতীয়বারের যুদ্ধ চূড়ান্ত যুদ্ধ ছিল ব'লেই এবার লিউইস্ দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আরো জঘন্যভাবে গোবর বাবুকে আক্রমণ করলেন। মধ্যস্থ কিন্তু লিউইসের এই অন্যায় ও বর্বর আক্রমণকে নীরবে উপভোগ করতে লাগলেন।

গোবর পালোয়ান

১৮৯২, ১৩ই মার্চ জন্ম। বাংলার অবিসংবাদী সবশ্রেষ্ঠ পেশাদার মল্ল এবং ১৯১২—১৯৩০ অব্দ পর্যন্ত ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পালোয়ান। কিন্তু দেশ থেকে বিদেশেই তিনি শ্রেষ্ঠত্বের কীর্তির প্রতিষ্ঠা করেছেন। কুস্তির এতবড়ো বিশেষজ্ঞ পুরুষ ভারতে কেউ জন্মান নি।

এইভাবে লিউইসের আক্রমণ যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে লাগল, তখন মধ্যস্থের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য গোবর বাবু মধ্যস্থের দিকে ফিরে দাঁড়ালেন। ঠিক সেই সুযোগেই লিউইস্ পিছন থেকে গোবর বাবুর দুটি পা ধ'রে এমন আছাড় দিলেন যে, পার্শ্ববর্তী কাঠের পাটাতনে গোবর বাবুর মাথা প'ড়ে তিনি অচৈতন্য হয়ে গেলেন এবং এই সুযোগেই মধ্যস্থও লিউইস্‌কেই বিজয়ী ঘোষণা করলেন। এই কুস্তির আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনার সংগে যাঁদের সম্যক পরিচয় আছে, তাঁরাই জানেন যে, গোবর বাবুর এই পরাজয় একটি সুপরিকল্পিত পন্থায় ঘটানো হয়েছিল।

এর পরেও গোবর বাবু অনেক দিন অ্যামেরিকায় ছিলেন এবং সেই সময়ের মধ্যে স্টানিস্‌লস্ বিস্কো, তাঁর ভাই ভ্লাডেক্ বিস্কো, জোসেফ্ স্টেচার, মাহ্‌মুদ ইত্যাদি বিশ্ব-বিখ্যাত অনেকানেক পালোয়ানের সংগে শক্তির পরীক্ষা দিয়েছিলেন।

১৯২৬, ডিসেম্বর মাসে গোবর বাবু দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

গোবর বাবুর ছাত্র বনমালা ঘোষও অসাধারণ মল্ল ছিলেন। স্বয়ং গোবর বাবু ব্যতীত ক্ষমতার নিরিখে বাংলা দেশের আর দু একজন মল্লের সংগে মাত্র তাঁর তুলনা চল্‌তে পারত। তিনি গোবর বাবুর সংগে অ্যামেরিকায় গিয়ে ১৯২৪ অব্দে দেশে ফিরে আসেন। এই সময়ের মধ্যে তিনিও সেই দেশে বিশ্ব-বিখ্যাত বড় বড় মল্লের সংগে বহু লড়াই করেছিলেন। তাঁর সেইসব প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে ভ্লাডেক বিস্কো, জ্যাক্ শেরি ইত্যাদির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিস্কোর ঐতিহাসিক পরাজয়

১৯১০ অব্দে লণ্ডনে গামা-বিস্কোর কুস্তি প্রহসনে বিস্কোর 'কূর্মাবতার' নিয়ে বিলেতী কাগজে যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়, বলা বাহুল্য, ১৯২৩ অব্দ পর্যন্ত তার জের চলেছিল। এই বছর মিঃ রো লিখেছিলেন— "For two and a half hours the struggle continued. Zbysko, the 'balloon' laid flat on his stomach and never budged an inch. Gama did his best to coax his opponent to wrestle, but the Galician knew that if he attempted any such tactics he would be a doomed man."

অতএব পরবর্তী সময়ে ইওরোপ ও অ্যামেরিকার মল্ল-মঞ্চে যথেষ্ট খ্যাতির প্রতিষ্ঠা ক'রেও বিস্কো তাঁর সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী গামার কথা ভুলতে পারেননি। ১৯২৫, এপ্রিল মাসে তৎকালীন 'জগজ্জয়ী' অ্যামেরিকান মল্ল উয়েইন্ 'বিপুল' মান্‌কে হারাবার পরে গামাকে হারিয়ে হৃত-গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি পাগল হয়ে উঠ্‌লেন। বস্তুত মান্ ছিলেন এক দৈত্য বিশেষ। তাঁর দেহের ওজন ও উচ্চতা ছিল যথাক্রমে ৩১৫ পাউণ্ড এবং ৭৮ ইঞ্চি। এজন্যে লোকে তাঁর নামের সংগে 'বিপুল' (Big) শব্দটি যোগ ক'রে দিয়েছিল। গায়েও তাঁর প্রচণ্ড শক্তি ছিল যদিও কুস্তি-বিজ্ঞানে তাঁর তেমন দক্ষতা ছিলনা। প্রথম বয়সে তিনি প্রসিদ্ধ ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন—শেষে অবশ্য গায়ের জোরটাকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে তিনি কুস্তি শিক্ষা সুরু করেছিলেন, এবং

কার্যতও তিনি এবিষয়ে অনেকটাই কৃতকার্য হয়েছিলেন। অতএব এ-হেন প্রচণ্ড বলীকে পরাজিত ক'রে স্বাভাবিকভাবেই বিস্কোর আত্মবিশ্বাস বেড়ে গিয়েছিল।

বিস্কোর এই অদ্ভুত আত্মবিশ্বাসই শেষ পর্যন্ত তাঁকে ১৯২৬, ১৮ই ডিসেম্বর বম্বেতে টেনে নিয়ে আসে। সেবার তিনি ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায়, এমন কি কলিকাতায়ও এসেছিলেন। নানা কারণে সেই সময় গামার সংগে তাঁর কুস্তি সম্ভব না হওয়ায় গোবর বাবু তাঁর সংগে প্রতিযোগিতা করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। কিন্তু বাংলা দেশের নানা জায়গায়, বিশেষ ক'রে, কলিকাতায় তখন হিন্দু-মুছলমানের দাংগা চল্‌তে থাকায় তাঁদের মধ্যে লড়াই হয়নি।

সেবার বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে গেলেও মাস কয়েক পরেই বিস্কো পুনরায় এদেশে রওনা হন এবং ১৯২৭ অব্দের শেষভাগে ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। বস্তুত মল্ল জীবনে বিস্কোর চরম লক্ষ্য ছিল গামাকে জয় করা। অবশেষে বহু চেষ্টার পরে পাতিয়ালায় প্রসিদ্ধ কুস্তি-দংগলের শেষ দিনে ১৯২৮, ২৯এ জানুয়ারি তিনি গামার সহিত লড়বার সুযোগ পেলেন। বেশ কিছুদিন পূর্ব থেকেই এই কুস্তির প্রচার চলেছিল এবং তার ফলে ভারতের নানা প্রান্ত থেকে বহু সহস্র কুস্তি-প্রিয় ব্যক্তি পাতিয়ালায় সমবেত হয়েছিলেন; এমন কি, ভারতের বাইরে থেকেও বহু প্রসিদ্ধ লোক এই কুস্তি দেখতে এসেছিলেন। কুস্তি আরম্ভ হয়েছিল বিকাল ৪।০ টায়; কিন্তু মধ্যাহ্নের পর থেকেই মল্ল-ক্ষেত্র হাজার হাজার দর্শকে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। পাতিয়ালার মহারাজা স্বয়ং, ভূপালের নবাব বাহাদুর এবং দিল্লীর মিঃ গ্রাস্‌কক্ ছিলেন এই লড়াইর বিচারক। কুস্তি হয়েছিল ভারতীয় প্রথায় ঝুড়ো মাটির ওপর। কিন্তু এত প্রচার, এত আড়ম্বর—সবই শেষ হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তে!

এবার মল্ল-ক্ষেত্রে নেমে বিস্কো তাঁর পূর্ব পরাজয়ের কালিমা মুছে ফেলবার জন্য মনে মনে সম্পূর্ণ নূতন কায়দা বেছে নিয়েছিলেন অর্থাৎ এবার তিনি গামাকে এক মুহূর্তের জন্যও আত্মরক্ষার অবসর না দিয়ে আক্রমণ দ্বারা ব্যতিব্যস্ত করে তুলবেন, এই-ই ছিল তাঁর দৃঢ় সঙ্কল্প। বস্তুত এই আক্রমণাত্মক নীতিই হয়ে দাঁড়াল বিস্কোর দ্রুত পরাজয়ের একমাত্র কারণ ; কেননা, পূর্বেই বলেছি, গামা ছিলেন আত্মরক্ষাত্মক কুস্তিতে অতুলনীয় এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

বাঁশীর আওয়াজ হওয়া মাত্রই বিস্কো তাঁর কোন্ থেকে এগিয়ে এসে সেলামী নিলেন এবং কয়েক পা পিছিয়েই পুনরায় ঝড়ের বেগে এসে গামার ওপর পড়লেন। গামাও সেই মুহূর্তেই 'দো দস্তি ঢাক' লাগিয়ে বিস্কোর দুটি কাঁধকেই মাটিতে চেপে ধরলেন। কুস্তির সুরু থেকে শেষ—ব্যবধান মাত্র ৯ সেকেণ্ড! কেমন করে কখন্ কুস্তি সুরু হোল, এবং কেমন করেই-বা কখন্ তা শেষ হয়ে গেল, দর্শকদের মধ্যে কেউ কেউ তা লক্ষ্য করতেও পারেন নি। কিন্তু অকস্মাৎ বিস্কোর বুকের ওপর গামাকে চ'ড়ে বসতে দেখে কুড়ি হাজার দর্শকের মধ্যে হঠাৎ একটা আকাশ-ফাটা উল্লাস-ধ্বনি উঠ্‌ল এবং সেই ধ্বনি থামতে প্রায় এক মিনিট সময় লেগেছিল! পরে অনেককে কিছুটা আনন্দে ও কিছুটা ক্ষোভে বলতে শোনা গেছে, "হায়! এত টাকা ব্যয় করে এসে শেষে এই হোল তার পরিণাম!" কিন্তু যিনি যা-ই বলুন, এটা ছিল পৃথিবীর এক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কুস্তি যাতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দুইটি প্রধান পুরুষ-সিংহ নেমেছিলেন। যুদ্ধ বা খেলায় জয়-পরাজয় থাকতেই পারে এবং দুই সমকক্ষ বীরের মধ্যে একজন পরাজিত হ'লেও তাতে দুঃখের কারণ থাকে না, বা তাতে পরাজিতের মানমর্যাদাও কমে না— যদি না তাতে কোনো অন্যায় অঘটন ঘটে।

গামা-বিস্কো সংঘর্ষ (১৯২৮, পাতিয়ালা)

সেলামীর পরের অবস্থা। লক্ষ্য করুনঃ (বাঁয়ে) বিস্কোর আক্রমণাত্মক গতি, সামনে ও পিছনে তাঁর পা, ব্যবধান প্রায় দু ফুট। অথচ দুপাশের টাল সম্বন্ধে লক্ষ্যহীন। আর (ডাইনে) গামা তাঁর গতি লক্ষ্য ক'রে তাঁকে লুফে নিয়ে ডান দিকে উল্টিয়ে ফেলবার জন্য দুপাশে পায়তাড়া করেছেন, তাঁর ডান পায়ে জোর, বাঁ পা উঠে যাচ্ছে।

এবার, কুস্তি-বিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে বিস্কোর এই পরাজয়ের কারণ বলা দরকার। লণ্ডনের কুস্তিতে বিস্কো ছিলেন আত্মরক্ষী এবং গামা আক্রমণকারী। কিন্তু পাতিয়ালার কুস্তিতে হয়েছিল তার উল্টো, অর্থাৎ বিস্কো আক্রমণকারী, আর গামা আত্মরক্ষী। প্রথমত আত্মরক্ষী গামার সাম্নে আক্রমণকারীর ভূমিকা নিয়ে নিজের পরাজয়কে ঠেকিয়ে রাখতে পারেন, এমন মানুষ পৃথিবীতে জন্মেছিলেন ব'লে আমি বিশ্বাস করিনা। কাজেই বিস্কোর পবাজয় অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই ঘটেছিল বল্‌তে হবে।

তাছাড়া ছিল বিস্কোর পায়তাড়া জ্ঞানের অভাব । শুধু বিস্কো কেন, অধিকাংশ পাশ্চাত্য মল্লই দৈহিক শক্তিতে ভারতীয় মল্লদের চেয়ে বলশালী হ'য়েও এই পায়তাড়ার ভুলের জন্য শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হন। পায়তাড়ার অর্থ হচ্ছে টাল-জ্ঞান, ইংরাজীতে যাকে বলা হয় 'ব্যালেন্সড্ স্টেপিং' বা বাংলায় 'স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপ'। পশ্চিমের শ্রেষ্ঠ মল্লগণ, যেমন, বিস্কো, হাকেন্সমিথ্, ক্রেমার ইত্যাদি এই বিষয়ে অত্যন্ত কাঁচা ছিলেন। গামা ও বিস্কোর পতিয়ালার যুদ্ধেও দেখা গেছে, গামাকে আক্রমণ করতে গিয়ে বিস্কো নিজের পদক্ষেপের ঔচিত্য ভুলে গিয়েছেন এবং অত্যধিক উৎসাহের কারণে দীর্ঘ পদক্ষেপে একেবারে সরাসরি গামার সামনে লাফিয়ে এসেছিলেন; সেই সময় তাঁর পা ছিল সামনে ও পেছনে। অথচ বিস্কোর সেই তীব্র আক্রমণের মুখে গামা তাঁর পা দুটিকে স্প্রিংয়ের মতো বিদ্যুৎবেগে দুপাশে বাড়িয়ে দিয়ে এবং প্রায় আংগুলের ওপর দাঁড়িয়ে বিস্কোর বাহু চেপে ধ'রেই 'দো দস্তি ঢাকের' সাহায্যে তাঁকে এক পার্শ্বে উল্টে ফেলেছিলেন। বিস্কোর পা সেই মুহূর্তে দুপাশে বাড়ানো থাকলে গামার পক্ষে অন্তত ঐ প্যাচটি লাগানো সম্ভব হোতনা। অবশ্য

গামার মতো দিগ্বিজয়ী মল্লের পক্ষে পর মুহূর্তেই অন্য যে-কোনো প্যাচ প্রয়োগ হয়তো অসম্ভব হোতনা। তবু, বিস্কো সেদিন কি ভুলের জন্য এমন দ্রুত পরাভূত হয়েছিলেন, এখানে সেই কথা যথার্থরূপে বলা হোল মাত্র। কারণ, বিস্কো বাস্তবিকই অসাধারণ মল্ল ছিলেন।

বিস্কোর পুনরাহ্বান

পাতিয়ালার পরাজয়ের পরে বিস্কো অতি নীরবে ভারতের সৈকত রেখা ছেড়ে চ'লে গেলেন। অনেকেই মনে করেছিলেন, হয়তো এতদিনে বিস্কো গামার প্রাধান্য অন্তরে অন্তরে স্বীকার করবেন। কিন্তু কী আশ্চর্য! দেড় বছর যেতে-না-যেতেই আবার তিনি সরব হয়ে উঠলেন! তিনি ১৯২৯, ২১ এ অক্টোবর গামা, গোবর, ছোট গামা এবং ভারতের অন্যান্য প্রধান মল্লের উদ্দেশ্যে পুনরাহ্বান ঘোষণা করলেন যা নভেম্বর মাসে এদেশের একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই আহ্বান উপলক্ষে তিনি সদম্ভে লিখলেন,—

"I am right now in the best condition I ever was and I would like to wrestle them all in Catch-as Catch-can and in Greco-Roman style.

"As you know I was compelled to wrestle with Gama in Indian style which was entirely new to me, in fact that was the first time in my life I ever tried to wrestle in that style."

বিস্কোর এই পত্রের জবাবে অনেক কথাই বলবার ছিল। তার মধ্যে দুটি প্রধান।

প্রথমত, বিস্কো বলেছিলেন যে, তখন অর্থাৎ পত্র লেখার সময়ে তাঁর শরীর সব চেয়ে ভালো ছিল। তা যদি হয় তবে কি তিনি ১৯২৮ অব্দে অপটু দেহ নিয়েই অত টাকা-পয়সা ব্যয় ক'রে পাতিয়ালায় গামার সম্মুখীন হয়েছিলেন? তা-তো নয়। কারণ আমরা জানি, ভারতে আসবার আগে তিনি নিজ স্বাস্থ্য ও শক্তির উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন এবং বার বার বড় বড় ডাক্তার দিয়ে দেহ পরীক্ষা করিয়েছিলেন। ফলে ১৯২৩, ২৩এ নভেম্বর চিকাগো হাসপাতালে মাপ নিয়ে দেখা গিয়েছিল, প্রস্থে তিনি পূর্বাপেক্ষাও অনেক বেড়ে গেছেন। আমি পাঠকদের অবগতির জন্য বিস্কোর প্রথম জীবনের এবং চিকাগো হাসপাতালের দুটি মাপকেই পাশাপাশি তুলে দিচ্ছি :—

বয়স	২৮ বছর	৫২ বছর
ভার	*	২৩২ পাউণ্ড (?)
দৈর্ঘ	৬৯ ইঞ্চি	৬৯ ইঞ্চি
গলা	২০¼ ,,	২২ ,,
বাহু (সংকুচিত)	২২½ ,,	২১ ,,
গোছা (,,)	১৬ ,,	১৮ ,, (?)
কব্জি	*	১২ ,, (??)
বুক (স্বাভাবিক)	*	৫৪ ,,
বুক (প্রসারিত)	৫৪ ,,	৫৯½ ,,
কটি	৪২ ,,	৩৯ ,,
উরু	৩০ ,,	৩২ ,,
মোচা (সংকুচিত)	২০½ ,,	১৯ ,,

বিস্কোর শেষোক্ত মাপের মধ্যে কয়েকটি জায়গায় কিছু ভুল আছে মনে হয়। এরূপ বিশাল মাপ যাঁর, তাঁর ওজন কি ক'রে মাত্র ২৩২ পাউণ্ড হয়? ১৮ ইঞ্চি গোছাই বা পৃথিবীতে কজন বলীর হয়েছে? এবিষয়ে একমাত্র ব্যতিক্রম ফ্রান্সের ভুবন-শ্রেষ্ঠ বলী আপোলোন, যাঁর গোছা আরো বড় ছিল! আর বিস্কোর কাব্জর মাপই বা কেমন করে ১২ ইঞ্চি হতে পারে, যা পৃথিবীতে কখনো কারু হয়নি! কিন্তু মাপ ভুল হোক বা ঠিক হোক, একখানা প্রসিদ্ধ বিলাতি পত্রিকা থেকেই ও-দুটি আমার সংগৃহীত। অবশ্য মাপের মধ্যে অতিরঞ্জন থাকলেও, কোনো সন্দেহ নেই যে, দেহের আয়তনে তিনি গামার চেয়ে ঢের বিরাট ছিলেন। তাছাড়া দেহ অপটু থাকলে তিনি কিছুতেই অত দূর থেকে দু দুবার ক'রে এদেশে ধাওয়া করতেন না।

বিস্কোর দ্বিতায় অজুহাত ছিল এই যে, তিনি ভারতীয় প্রণালীতে প্রথমবার লড়তে গিয়েই হেরে গিয়েছিলেন। তাহলে তো ভারতীয় পালোয়ানেরাও বিদেশে গিয়ে বিদেশী প্রণালীতে লড়েছেন। কিন্তু কৈ, তাঁরা তো হার-জিত প্রসংগে ওসব ওজর-আপত্তি তোলেননি। অতএব, হয়তো এই কথা বুঝতে পেরেই তিনি গামা, গোবর বাবু ইত্যাদির সংগে যে-কোনোভাবে কুস্তিতে নামবার আশায় নিজেই লিখেছিলেন, "I am willing to go through all those matches for any amount of money as a stake and all the profit for the winner."

আদতে বিস্কোর এই সর্তও মূল্যহীন। কেননা, মল্ল-সমাজের সাধারণ নিয়ম এই যে, বিজেতার সংগে বিজিত পুনরায় লড়তে চাইলে বিজেতাকে যে-কোনো একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিতে হয় এবং সেটি দিতে হয় হার-জিতের প্রশ্ন না রেখেই। অন্তত ইওরোপ-অ্যামেরিকায় এই

নিয়মটি বেশ চালু আছে। হাকেন্স্মিথ ও গচের দাবীও সেই রকম ছিল যদিও গামা, মহিউদ্দিন ইত্যাদি তাঁদের কাছে কখনো পরাজিত ছিলেন না। মল্ল-সমাজের এই চিরাচরিত সাধারণ নিয়মটির বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত থেকেও বিস্কো সেবিষয়ে কোনো কথা বলেননি, এ-ও এক আশ্চর্য! প্রধানত এই জন্যেই গামার পক্ষেও বিস্কোর পুনরাহ্বান গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

অবশ্য গোবর বাবু বিস্কোর এই আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন। কিন্তু সর্তাদি ব্যাপারে মতৈক্য না হওয়ায় তাঁদের কুস্তি হয়নি।

প্রসংগক্রমে গামার সর্বপ্রধান বৈদেশিক প্রতিদ্বন্দ্বী বিস্কোর জীবন আলোচনা করা যাক। ১৮৭১ অব্দে পোল্যাণ্ডের গালিসিয়া প্রদেশে বিস্কোর জন্ম হয়। বিভিন্ন সময়ে এই প্রদেশটি অস্ট্রিয়া ও জার্মানির হাতে গিয়েছিল। এখন এটি সোবিয়েৎ রাশিয়ার আয়ত্তে আছে। তবে জাতি হিসাবে বিস্কো পোলিশ ছিলেন। প্রাথমিক পড়াশুনা শেষ ক'রে ১৮৮৬ অব্দে ১৫ বছর বয়সে তিনি দূরবর্তী সহরে উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। এই সময় পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত রোগা ও দুর্বল ছিলেন। কিন্তু এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করবার পর থেকে অন্যান্য ছেলেদের মতো তিনিও সব রকম খেলাধূলা ও শরীর-চর্চায় মন দেন।

এর পরে দেখতে দেখতে বিস্কোর দেহের প্রভূত উন্নতি হয়। ১৮৮৯ অব্দে বিদ্যালয়ের কুস্তি ও ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম স্থান দখল করলেন, তখন তাঁর বয়স ঠিক ১৮ বছর। তিন বছর পরে সেই বছর ছুটি উপলক্ষে তিনি গ্রামের বাড়ীতে যান; তাঁর চেহারার তখন এমন পরিবর্তন হয়েছিল যে, বাবা-মা পর্যন্ত তাঁকে প্রথমটা ঠিক চিনতে পারেন নি!

১৮৯২ অব্দে তিনি বিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভ করেন। পরের বছর তিনি বিশ্ব বিদ্যালয়ে আইন অধ্যয়ন সুরু করেন এবং এক বছরের মধ্যে জুন মাসে তিনি আইনেও ডিগ্রী পান। তারপরেই তিনি এটর্ণি হিসাবে আইন ব্যবসা সুরু করেন। বাস্তবিক, বিস্কো ছিলেন প্রতিভাধর পুরুষ—যখন যেদিকে মনোযোগ দিয়েছেন, তখন সেই দিকেই তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেছে। আইনজ্ঞ হিসাবে জীবন চালনা করলেও হয়তো তাঁর কম উন্নতি হোতনা; কিন্তু ভবিতব্য তাঁকে নিয়ে গেল শক্তির ক্ষেত্রে।

১৮৯৪, সেপ্টেম্বর মাসে প্যারিসে একটি আন্তর্জাতিক কুস্তি প্রতিযোগিতা হয়; বিস্কো সেই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে নির্বিবাদে প্রথম স্থান অধিকার করলেন। কার্যত সেই সময় থেকে তিনি কুস্তিকেই জীবিকার্জনের পথ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

১৯০৭ অব্দে বিস্কো প্রথম অ্যামেরিকায় পদার্পণ করেন; তখন অ্যামেরিকায় কুস্তি যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি সেখানকার নামজাদা মল্লদের হারিয়ে দিলেন এবং ১৯০৯, ২৫এ নভেম্বর বাফেলোতে একঘণ্টা কাল তিনি পশ্চিম জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মল্ল ফ্র্যাংক গচের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কিন্তু এখানেই তাঁর বিজয় অভিযান প্রথম প্রতিহত হয়েছিল। এর পরেই তাঁর উল্লেখযোগ্য লড়াই হয় লণ্ডনে গামার সংগে ১৯১০ অব্দে। এক কথায় বলা চলে, তিনি পৃথিবীর দিকপাল প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ মল্লের সংগে শক্তি পরীক্ষা দিয়ে নিজেকে অবিস্মরণীয় মল্লদের দলে নিয়ে গেছেন। তাছাড়া, সরকারি ভাবে তিনি দুই বার 'জগজ্জয়ী'র আসনও লাভ করেছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি রাশিয়ায় গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ধৃত হয়ে এক বছর কাল কারারুদ্ধ ছিলেন এবং বিচারে তাঁর প্রতি

প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছিল। পরে কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারলেন, বিস্কো নির্দোষ এবং একজন নিরীহ পেশাদার মল্ল মাত্র। সংগে সংগে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু বেশী দিন যেতে-না-যেতেই তিনি ফের আর একটি অভিযোগে ধৃত হলেন। সেবার অবশ্য কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রতি অনুকম্পা দেখানোর জন্য, এবং মল্ল হিসাবে বিস্কোর ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করবার জন্যও বটে, সর্ত দিলেন যে, তিনি যদি রাশিয়ার তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ মল্ল আলেস্কো এবার্গকে কুস্তিতে হারাতে পারেন, তবেই তার মুক্তি হবে, নতুবা নয়। এবার্গ ছিলেন দৈহিক বিপুলতা ও শক্তি উভয় দিক থেকে এক দৈত্য বিশেষ। কিন্তু বিস্কো তাঁকে অতিকষ্টে ২ ঘণ্টা ৪৩ মিনিটে পরাজিত ক'রে মুক্তি পেয়েছিলেন।

বিস্কো শুধুই শক্তিমান ছিলেন না—সুশিক্ষিতও ছিলেন। ইওরোপের গোটা কয়েক ভাষায় তাঁর দস্তরমত দখল ছিল শুধু বলায় নয়,—লেখায়ও। আলাপ-ব্যবহারেও তিনি অল্পক্ষণের মধ্যে লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারতেন। শেষের দিকে তিনি ভারতীয় কুস্তির উৎকর্ষতার কথা চিন্তা ক'রে তা শেখার জন্য বিস্তর চেষ্টা করেছিলেন। বিস্কোর সবচেয়ে বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, পৃথিবীতে আর কোনো মল্লই তাঁর মতো এত বেশী বয়স পর্যন্ত সক্ষম ছিলেননা। কার্যত প্রায় ৭০ বছর বয়সেও বিস্কো একজন তরুণের উৎসাহ নিয়ে দুই পুরুষ নিম্নবর্তী পৃথিবীর উদীয়মান শ্রেষ্ঠ পালোয়ানের সংগে বড় বড় দংগলে অবতীর্ণ হয়েছিলেন! অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুবনজয়ী মল্লরাও ৪০ বছর বয়সের মধ্যে অবসর নিয়ে থাকেন! এই বিষয়ে তাঁর স্থান গামারও ওপরে ; কেননা, বয়সের হিসাবে বিস্কো গামার চেয়েও ৯ বছরের বড়।

বিস্কো বিপুল বিত্তশালী ছিলেন। রাশিয়া ও অ্যামেরিকায় তাঁর

বহু জায়গা জমি ছিল। তাছাড়া, অ্যামেরিকার মেইন প্রদেশের ওল্ড আর্চার সহরে তাঁর একটা গ্রীষ্মকালীন বৃহৎ হোটেল ছিল।

বিস্কোর জীবনের সব চেয়ে বড় আশা ছিল, তিনি গামাকে হারাবেন; কিন্তু সে-সুযোগ তাঁর কখনো হয়নি। বিস্কোর কনিষ্ঠ ভাই ভ্লাডেক বিস্কোও পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মল্ল ছিলেন; এবং তিনিও দাদার মতো শক্তির ক্ষেত্রে প্রথিতযশা ছিলেন।

পিটার্সেনের কেরামতি

পাতিয়ালার মহারাজার লণ্ডনে অবস্থান সময়ে জনৈক ইওরোপীয় মল্ল, জেস্ পিটার্সেন, গামার সংগে লড়বার জন্য তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। কেননা, গামা ছিলেন পাতিয়ালার রাজদরবারেরই বেতনভুক মল্ল। মহারাজা এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হ'লে পিটার্সেনের সংগে তাঁর কতকগুলো সর্ত ঠিক হয়। এই চুক্তির বলে পিটার্সেন ২৫০০৲ টাকা নগদ লাভ করেছিলেন, বিলাত থেকে ভারতে আসা-যাওয়ার প্রথম শ্রেণীর ভাড়া পেয়েছিলেন এবং কুস্তির সময় গামা গোটা কতক মোক্ষম প্যাচ লাগাতে পারবেন না বলেও ঠিক হয়েছিল! এই রকম করে পিটার্সেন নিজের পাতে ঝোল ঢালবার ব্যবস্থা করে এলেন এদেশে।

কুস্তির সময় দেখা গেল, পিটার্সেন গায়ে অপর্যাপ্ত তৈলাক্ত দ্রব্য মেখে আখড়ায় নেমেছেন। তিনি ভেবেছিলেন, শক্ত প্যাঁচ লাগানো থেকে যখন গামাকে ঠেকানো হয়েছে, তখন তৈল মাখলেই বাকি কাজ হাসিল হয়ে যাবে! কার্যত হোলও তাই। গামার আক্রমণের মুখে পিটার্সেন শুধু ডুব মেরে ও পাশ কেটে আত্মরক্ষা করতে লাগলেন।

গামা একবারও তাঁকে ঠিকমতো ধ'রে রাখতে পারলেন না বা কোনো প্যাঁচ কসাও সম্ভব হোল না। দর্শকরা শুধু হাসতে লাগলেন।

গামা তখন বিরক্ত হয়ে আখড়া থেকে কিছু মাটি তুলে পিটার্সেনের পায়ে মেখে দিলেন এবং সেই পাখানা ধ'রেই ১ মিনিট ৪২ সেকেণ্ডে তাঁর 'খেল্' খতম ক'রে দিয়েছিলেন।

এই কুস্তিও হয়েছিল ভারতীয় প্রথায়। বিচারক ছিলেন কাশ্মীরের মহারাজা এবং রণজিৎ সিংজী।

'জংলী কুস্তি' ও কার্নেরার দম্ভ

মুষ্টি-জগতে ইটালির প্রিমো কার্নেরার নাম সুপ্রসিদ্ধ। কার্নেরা যৌবনে ছিলেন একজন অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত গ্রাম্য মজুর—কাঠুরিযার কাজ ছিল তাঁর উপজীবিকা। কিন্তু দৈহিক শক্তি ও বিপুলতায় তিনি যে-কোনো ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। তাঁর দৈহিক উচ্চতা ৮১ ইঞ্চি এবং ওজন প্রায় ৩০০ পাউণ্ড; এক কথায় তিনি রূপকথার দৈত্য স্থানীয় ছিলেন! তাঁর মজুরিও অবশ্য অন্য যে-কোনো লোকের দ্বিগুণ ছিল। ঘটনাক্রমে তিনি ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ মুষ্টি-বিশেষজ্ঞ লিয়ন সীর নজরে পড়ে যান। কার্নেরার দৈহিক কাঠামো এবং হাড়ের গড়ন দেখে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে তাঁর দৈনিক মজুরির চেয়েও বেশী টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সংগে নিয়ে আসেন। মঁসিয়ে সী পরে তাঁকে মুষ্টির কলা-কৌশল শিক্ষা দিয়ে ভুবন-বিখ্যাত মুষ্টিক তৈরী করেছিলেন যদিও কার্নেরা কোনো দিনই মুষ্টি-বিজ্ঞানী হতে পারেন নি। মুষ্টিযুদ্ধে তাঁর অধিকাংশ জয় হয়েছিল দৈহিক উচ্চতা, ওজন এবং গায়ের জোরের সাহায্যে। ১৯৩৩

অব্দে কার্নেরা জ্যাক্ শার্কীকে হারিয়ে 'জগজ্জয়ী মুষ্টিক' হবার গৌরবও অর্জন করেছিলেন। তবে শার্কীর সংগে তাঁর ওজনের ব্যবধান ছিল প্রায় ৬ স্টোন।

এই ঘটনার কিছুদিন পূর্বে ১৯৩০ অব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক নতুন ধরণের কুস্তি প্রচলিত হয়; তার নাম দেওয়া হয়েছিল 'অল্-ইন্'। এই ধরণের কুস্তি দু-তিন হাজার বছর বা তারো আগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচলিত ছিল। কিন্তু সভ্যতা উন্মেষের সংগে পৃথিবীর বুক থেকে সেই বর্বরোচিত কুস্তি, যাতে বহু সময় মানুষের জীবন বিপন্ন হোত, লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বিস্ময়ের কথা যে, এই বিংশ শতাব্দীতে যখন বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি, শৃংখলা ও সংস্কৃতি অব্যাহত রাখা ও তার উন্নতি বিধানের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে, তখন অ্যামেরিকান্ যুক্তরাষ্ট্রে সেই জংলী কুস্তির পুনঃ প্রবর্তন ঘটেছে।

রক্ত-মাংসে গঠিত মানুষের দেহ-মনে একটা পশু-প্রবৃত্তি সুপ্ত অবস্থায় থাকেই। মনুষ্যত্বের পূজারী যাঁরা, তাঁরা সেই পশু প্রবৃত্তিকে দমিত করবার জন্য শক্তি-চর্চার পরিচায়ক কুস্তি, মুষ্টি বা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যেও বন্ধুত্বমূলক অবস্থা সৃষ্টি করে থাকেন, এবং সেইজন্যই এই সব কুস্তি, মুষ্টি ইত্যাদিতে নানা বিধি-নিষেধ ও নিয়মাবলী তৈরী হয়েছে; মধ্যস্থ, বিচারক, সময়-নির্দেশক ইত্যাদির নিযুক্ততা তো সেই জন্যেই। কেননা, দৈহীক সংঘর্ষে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে করতে প্রতিযোগীদের মনে স্বাভাবিক উন্মাদনার জন্য সময়ে পশুত্ব জেগে ওঠা বিচিত্র নয়। একজন বলী আর একজন বলীর সংগে বন্ধুভাবে শক্তির পরীক্ষা দেবে, সভ্যতার এইটাই মূল নীতি। সেখানে বন্ধুত্বের পরিবর্তে বৈরীভাব জাগিয়ে তোলা কখনো সভ্য মানুষের কাম্য নয়,—এই নীতিকে ভিত্তি ক'রেই বহুকাল পূর্বে গ্রীস দেশে অলিম্পিক

ক্রীড়ার পত্তন হয়েছিল, এবং কালক্রমে সেই সভ্যতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ খেলাধূলার আদর্শ সারা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। অথচ অ্যামেরিকান কুচক্রীরা এই উন্নতিকামী বন্ধুত্ব-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষাকালীন মানুষের সাময়িক উন্মাদনার সুযোগে মানুষের সুপ্ত পশুত্বকে জাগিয়ে দেবার জন্যই 'অল্-ইন্' কুস্তির আবিষ্কার করেছে! প্রকৃতপক্ষে, এর দ্বারা অ্যামেরিকা অন্যান্য রাষ্ট্রের বা সমাজের সভ্যতাকে প্রকাশ্যভাবে 'চ্যালেঞ্জ' করেছে মাত্র।

'অল্-ইন্' কুস্তির তাৎপর্য এই যে, কিল-চড়-ঘুসি-লাথি ইত্যাদি যে-সব মারাত্মক আঘাত অন্যান্য কুস্তি ধারায় নিষিদ্ধ, সেইগুলি কয়েকটি বিধানানুযায়ী এই কুস্তির মধ্যে প্রচলিত করা হয়েছে, অর্থাৎ নিষিদ্ধ বিশেষ কিছুই নেই—সবই গ্রহণযোগ্য (All allowed), এই মনোভাব থেকেই 'অল্-ইন্' (All-in) কথার উৎপত্তি হয়েছে। বস্তুত মূল এবং প্রকৃতিগত অর্থ বিচার করলে বাংলা ভাষায় এর যথার্থ নাম দেওয়া চলে 'জংলী কুস্তি' এবং যাঁরাই এই কুস্তি দেখেছেন, তাঁদের অধিকাংশই এই কথা সমর্থন করবেন, এবিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। তাই, পরবর্তী সময়ে এই বর্বর মনোভাবের নগ্ন রূপটা প্রত্যেক সভ্য মানুষের মনে ধাক্কা দিতে থাকে এবং বহু লোক এর বিরুদ্ধে আপত্তিজনক অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। অনেকটা এই কারণেই আরো পরে 'অল্-ইন্' কুস্তির নাম বদ্‌লিয়ে 'অ্যামেরিকান্ ফ্রী স্টাইল' করা হয়েছে। কিন্তু নাম যা-ই হোক না কেন, বর্বরতাকে উদ্দীপিত করায় অ্যামেরিকার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা নিবৃত্ত হয়নি।

অনেকে অবাক্ হয়ে প্রশ্ন করেছেন, 'এই বর্বরোচিত কুস্তি অন্যান্য দেশেও প্রচলিত হোল কেমন করে?' উত্তর সহজ। অধিকাংশ সমাজেই ভালো-মন্দ নানা প্রকৃতির মানুষ থাকে এবং বর্বর-ধর্মী

মানুষের কাছে এই কুস্তিটি হৃদয়গ্রাহী হবেই। এইভাবেই আজ আমাদের দেশেও এই কুস্তির কিছুটা প্রসার লাভ ঘটেছে। অনেক সময় নিরীহ মানুষও এই কুস্তি দেখ্‌তে দেখ্‌তে সাময়িক আনন্দ ও উত্তেজনায় এই কুস্তির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও ইংগিত ভুলে যান। অতএব মনুষ্যত্বকামী মানুষের কর্তব্য হোল অ্যামেরিকার এই বর্বর 'চ্যালেঞ্জের' উত্তরস্বরূপ এই বর্বর কুস্তিকে বর্জন করা।

এবার আমরা আসল বিষয়ে ফিরে যাই। ১৯৩১ অব্দে যখন আমাদের দেশের কেউ এই 'অল্‌-ইন্‌' কুস্তি জানত না, সেই সময়ে প্রিমো কার্ণেরা অ্যামেরিকায় এই কুস্তি শিক্ষালাভ করেন। এই কুস্তিটি কুস্তি-বিজ্ঞানের দিক থেকে একেবারেই মূল্যহীন ; কারণ এতে বৈজ্ঞানিক কলা-কৌশলের কোনোই স্থান নেই, তার পরিবর্তে বরং গায়ের জোর আর আঘাত-প্রত্যাঘাত দেবার বিধিবদ্ধ নিয়ম আছে। তাই কার্ণেরা শুধু তাঁর গায়ের জোরকে কাজে লাগানোর জন্যই বিজ্ঞান-সম্মত অন্য কুস্তি ছেড়ে 'অল্‌-ইন্‌' ধারাটি বেছে নিয়েছিলেন।

১৯৩২ অব্দের গোড়ার দিকে কার্ণেরা অতঃপর এই কুস্তিতে গামার সংগে লড়বার ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন এবং তিনি সর্ত স্বরূপ জানিয়েছিলেন যে, এক লক্ষ পাউণ্ড পেলে তিনি গামার সংগে লড়তে রাজী আছেন। গামা অবশ্য এই অন্যায় ও ধৃষ্টতাপূর্ণ আহ্বানে কর্ণপাত করেননি ; কিন্তু পঞ্জাবের উদীয়মান তরুণ মল্ল আব্দুল রসিদের পক্ষ থেকে কার্ণেরার এই আহ্বান গ্রহণ করা হয়েছিল, তবে বিনা সর্তে কার্ণেরাকে এক লক্ষ পাউণ্ড দেবার জন্য রসিদও প্রস্তুত হননি। কেননা, পূর্বেই প্রমাণিত হয়েছিল যে, শুধু গায়ের জোর বা বিপুলতা দিয়ে কুশলী মল্লের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়না। কাজেই, পরাজিত হলেও তাঁকে অত টাকা দিতে হবে, এই সর্ত

কেউ স্বীকার করেন নি। ফলত, কার্ণেরার এ দেশে আসা হয়নি, কুস্তিও সম্ভব হয়নি।

রুশ-বলী চেস্‌লিন্

প্রকৃত বলী পুরুষ রাশিয়া এবং জার্মানিতে যত জন্মেছে, তেমন কম দেশেই জন্মেছেন। অন্য দেশেও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বলী জন্মেছেন সত্যি, তবে তাঁদের সংখ্যা কম। আলেক্সাণ্ডার চেস্‌লিনের জন্ম হয়েছিল সেই বলীর দেশ রাশিয়ার ক্রিমিয়া প্রদেশে ১৯০২ অব্দে।

১৯১৭ অব্দের 'নভেম্বর-বিপ্লবের' মাধ্যমে যখন রাশিয়ায় যুগান্তর ঘটে, তখন চেসলিনের বয়স মাত্র ১৫ বছর, উঠ্‌তি জোয়ান। ক্রমশ রাশিয়ায় অনেক রীতি-নীতির বদল হয়, সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ফলে সেখানকার পেশাদারি শক্তি প্রদর্শন অচল হয়, পেশাদারি সার্কাস বন্ধ হয়; দেশের সর্বাংগীন উন্নতির সংগে সংগে শরীর-চর্চাও সেখানে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়, কিন্তু তা একান্তভাবেই (Strictly) অ-পেশদারি আদর্শের ভিত্তিতে। চেস্‌লিন্ ক্রমশ শক্তির ক্ষেত্রে উন্নতি করেছিলেন বটে, কিন্তু রাশিয়ার সমস্ত বলীকে অতিক্রম করতে পারেন নি। অন্যের কথা ছেড়ে দিয়ে একমাত্র ইভান্ জাইকিনের কথাই ধরা যাক। ৪০ বছর বয়সেও জাইকিন্ সক্রিয়ভাবে শক্তির পরিচয় দিয়ে যখন পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, তখন চেস্‌লিন্ ২০ বছরের নওজোয়ান হয়েও তাঁর কাছে ছিলেন নগন্য। তাই এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, শক্তির ক্ষেত্রে রাশিয়ায় সুনাম লাভকরা চেস্‌লিনের পক্ষে দুরাশা হবার ফলেই তিনি রাশিয়া ছেড়ে বাইরে চ'লে আসেন এবং সার্কাসে পেশাদার বলী রূপে যোগ দিয়েছেন। এইভাবে ভ্রমণ

করতে করতে তিনি ১৯২৮ অব্দে রাশিয়ার ‘ইসাকো’ সার্কাসের সংগে ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। তখন তাঁর বয়স ছিল ২৬ বছর।

পাশ্চাত্য প্রণালীর ভার তোলার কাজে ভারতবর্ষ আজো শিশু মাত্র। ১৯২৮ অব্দে চেস্‌লিন্ এই অবস্থাটি লক্ষ্য ক’রে এদেশকেই তাঁর শক্তি প্রদর্শনের প্রধান ক্ষেত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। চেস্‌লিন্ মল্লযুদ্ধ এবং ভারোত্তোলন উভয় ক্ষেত্রেই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। এদেশের একজন লেখক বলেছেন, চেস্‌লিন্ ২২০ পাউণ্ড বেণ্ট্ প্রেস, ২৬০ পাউণ্ড দুহাতি পুশ্ এবং ৩৪০ পাউণ্ড দুহাতি কন্টিনেণ্ট্যাল্ জ্যার্ক করতে পারতেন। তবে সার্কাসে ঘোষিত ও প্রদর্শিত এই ওজনের পরিমাপ ঠিকভাবে গৃহীত হয়েছিল কিনা জানি না। একথা নিঃসন্দেহ যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সার্কাস কর্তৃপক্ষ ব্যবসার সুবিধার জন্য অতিরঞ্জিত বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন এবং বলী বা খেলোয়াড়কে লোকের কাছে বড় প্রতিপন্ন করবার জন্য বহু মিথ্যা ঘোষণা করেন। আমি নিজেও হাওড়া ময়দানে ১৯৫১, ৩০এ ডিসেম্বর কৃষ্ণার ‘জুবিলী সার্কাসে’ চেস্‌লিনের খেলা ও শক্তির কাজ দেখেছি; কিন্তু তাঁকে কোনক্রমেই প্রথম শ্রেণীর বলবান ব্যক্তি বলা চলেনা।

চেস্‌লিনের ‘নতুন কৌশল’

চেস্‌লিন্ প্রকৃতপক্ষে সুচতুর পেশাদার ব্যায়ামী ছিলেন। রাশিয়াতে অবস্থান সময়ে তিনি ‘ক্যাচ্চ্-অ্যাজ্ ক্যাচ্চ্-ক্যান’ এবং ‘গ্রীকো-রোমান’ কুস্তিতেও কিছুটা দক্ষতা লাভ করেছিলেন। সেই দক্ষতার উপর নির্ভর ক’রেই তিনি ভারতবর্ষে এসে ভারতীয় প্রণালীতেও জন কয়েক ভারতীয় মল্লের সংগে কুস্তি লড়েছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি

বুঝতে পারলেন, কুস্তির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা লাভের কোনো সম্ভাবনা নেই। কেননা, আল্লা বখ্শ্ পালোয়ানকে পরাজিত করলেও বম্বের মালাপ্পা তারাকি এবং বিহারের বংশী সিংয়ের কাছে তিনি ৮।১০ মিনিটের মধ্যেই পরাজিত হয়েছিলেন; অন্যান্য কুস্তিতেও তিনি বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। কাজেই, তিনি মন দিলেন অন্য দিকে।

চেস্লিন্ লক্ষ্য করেছিলেন, বুকে হাতী বা রোলার নেওয়াকে এদেশের লোক সর্বপ্রধান শক্তির কাজ মনে করে এবং হাতী ধারণে রামমূর্তিকে 'প্রথম প্রবর্তক' জ্ঞানে দেবতার মতো ভক্তি করে। অতএব চতুর চেস্লিন্ অবিলম্বে এই খেলার কৌশলটি আয়ত্ত করে ফেললেন যদিও তখন তাঁর বয়স ৩৫ বছরের কম নয়। শুধু তাই নয়, হাতী ধারণ বিষয়ে রামমূর্তি যে-সব ভেল্কী দেখাতেন, যেমন—হাতী নেবার আগে ও পরে রেচক, পূরক ও কুম্ভক জাতীয় শ্বাসের কাজ, হাতী নেবার সময় দেহে রবারের ফিতে বাঁধা, হাতী বুক থেকে নেমে যাবার পরেও কয়েক মিনিট নিঃশব্দে প'ড়ে থাকা এবং দেহকে শক্ত কাঠের ভংগীতে রেখে অন্যের সাহায্যে ওঠা—চেস্লিন্ এইসব বে-মালুম বাদ দিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি রামমূর্তির মতো পূরোবাহু দিয়ে বুকের ওপরকার তক্তাকে ঠেলে না রেখে হাত দুখানাকে দুপাশে সোজাভাবে ফেলে রাখতেন। এই নতুন কায়দায় বুকে হাতী নেবার ফলে বাস্তবিকই তিনি এদেশের কিছু কিছু লোকের মনে অধিকতর বিস্ময় সৃষ্টি করেছিলেন। এমন কি, তথাকথিত বহু ব্যায়ামবিদ্ এবং লেখকও এই কারণে চেস্লিনকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলী ব'লে প্রশংসা করেছিলেন। অথচ, হাতী বা রোলার বুকে নেওয়াটা নিতান্তই ভেল্কীবাজি যা ইদানিংকালের অগণিত রাম-রহিম নিয়ত দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে, পৃথিবীর কোনো

মানুষই ১০০ মন ভার বুকে নিতে পারেননা, নিলে তাঁর হাড়-পাঁজর চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে পারে—এটি দেহ-বিজ্ঞান-সম্মত কথা।

পেরেকের শয্যায় শুয়ে বুকে ঘোড়া বা পাথর রাখা এবং সেই পাথরে হাতুড়ীর ঘা নেওয়া চেস্‌লিনের আর একটি খেলা। মনে হয়, আমাদের দেশের অনেকে এবং পশ্চিমেরও কোনো কোনো ব্যায়ামী, এমন কি, বিশ্ব-জয়ী ইংরেজ ভারোত্তোলক পুলাম সাহেব পর্যন্ত এই খেলার কৌশলটি সম্বন্ধে অনবহিত আছেন। পেরেকের চাপে পিঠের চামড়া কেন ফেটে-কেটে যায় না, সেই কথার হদিস্ না পেয়ে অনেকে নির্বাক হয়ে যান। আসল ব্যাপার হচ্ছে, পেরেকের ডগাগুলি ধারহীন স্থূল ক'রে নেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত, পেরেক যত ঘন-সন্নিবিষ্ট হবে তাতে শয়ন করা ততই সহজ হবে। পেরেক শয্যার পেরেকগুলি যদি হাল্কা ভাবে দূরে দূরে বসানো থাকে, তবে দেহ বা দেহের উপরিস্থ ভারের চাপে নিশ্চয়ই তা দেহের পেশীতে বিঁধে যাবে। তৃতীয়ত, অত্যন্ত শীর্ণকায় বা অত্যধিক মাংসল ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ পেরেকের শয্যায় শুয়ে বুকে ভার গ্রহণ কষ্টসাধ্য ব্যাপার; কিন্তু উপযুক্ত ব্যায়াম দ্বারা পিঠের পেশীকে মজবুত করতে পারলে দোহারা চেহারার ব্যায়ামীরা এই ক্রিয়া কৃতিত্বের সংগে দেখাতে পারেন,—তাঁদের পেশীগুলি তখন ভারের চাপে পেরেকের মাথায় রবারের মতো ফুলে যাবে, অথচ বিঁধে যাবে না; কাঁটাগুলি গায়ে গায়ে ঘন-সন্নিবিষ্ট থাকার কারণে বিঁধে যাবার সুযোগও থাকেনা। চতুর্থত, পেরেকে শুয়ে বুকে পাথর নেওয়া সম্ভব হ'লে সেই পাথরের উপর হাতুড়ীর ঘা মারতে দেওয়ার মধ্যে আর কোনো গুরুত্বই থাকেনা। কারণ, হাতুড়ীর ঘা পাথরের চাপকে ছাপিয়ে যে সামান্য চাপটুকু দেয়, তা একেবারেই নগণ্য। এই শেষোক্ত তথ্যটি যে-কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তি বিলক্ষণ জানেন,

যদিও এই কীর্তি দেখে সাধারণ লোকের চোখ ভয়ে-বিস্ময়ে 'ছানা-বড়া' হয়ে যায়!

১৯৩৫, বোধ হয় অক্টোবর মাসে, কি একটা উপলক্ষে হুগ্‌লী জেলায় উত্তরপাড়ার রাজবাড়ীতে রাজেন গুহ ঠাকুরতা তাঁর দল নিয়ে খেলা দেখাতে গিয়েছিলেন; আমি নিজেও তখন সেই সংগে গিয়েছিলাম। আমার এক বন্ধু, হেমচন্দ্র ঘোষ, সেদিন পেরেকের শয্যায় শুয়েছিলেন এবং তাঁর বুকে পাতা তক্তার ওপর দিয়ে বিষ্ণু ঘোষ মোটর সাইক্‌ল্ চালিয়েছিলেন। আমি সেদিন একান্তে গিয়ে রাজেন বাবুকে এ-খেলার কৌশল সাধারণের কাছে ঘোষণা করতে অনুরোধ করি এবং বলি যে, ভবিষ্যতে যখনি এর কৌশল লোকের জানা হয়ে যাবে, তখন লোকে আজকের মতো আর তাঁদেরকে বলী ব'লে সম্মান করবে না, বরং ধাপ্পাবাজ মনে করবে। তিনি আমার কথা স্বীকার করেছিলেন; ফলে, তাঁর নির্দেশে সেদিন বিষ্ণুবাবুকে এ খেলার এই তথ্যগুলি জন সমক্ষে সবিস্তারে বল্‌তে হয়েছিল।

আমাদের দেশে রাস্তা-ঘাটের যেখানে-সেখানে অনেক মজার 'সাধু' কৃশকায় হয়েও নগ্নদেহে মারাত্মক বাব্‌লা বা কুচ্‌ কাঁটার শয্যায় দিব্যি আরামে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুয়ে থাকে এবং এইভাবে সাধারণ লোকের বিস্ময়োৎপাদন ক'রে পয়সা কামাই করে। কিন্তু চক্ষুষ্মান লোক একটু লক্ষ্য ক'রেই বুঝতে পারেন, তাদের দেহের নীচের দিকে কাঁটা থাকে না, বা থাকলেও থেঁতো কাঁটা থাকে; দুপাশে নীচেকার কাঁটাকেও সেরূপ করে নেওয়া হয়। কিন্তু দুপাশে ওপরের দিকে দেহকে ছুঁয়ে এবং এপাশে-ওপাশে সর্বত্রই তীক্ষ্ণধার কাঁটা বিছিয়ে রাখা হয়। উৎসুক ব্যক্তিরা ইচ্ছা করলেই এইসব 'সাধু'দের কণ্টক শয্যায় শোবার আগে বা পরে সেইসব কাঁটা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন,

যদিও 'সাধু'রা এই কৌশল গোপন রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা করবে এবং ও-ধরনের পরীক্ষার সুযোগ দিতে চাইবে না।

প্রসংগক্রমে খালি পায়ে ভাংগা কাচের উপর ল্যাফিয়ে পড়বার কৌশল বল্‌ছি। প্রথম নানাভাবে এই কাচের টুকরাগুলির তীক্ষ্নতা নষ্ট করা হয়; তারপরে ও-গুলোকে আদার রসে সিদ্ধ ক'রে নিলে ওর আর কোনো মূল্যই থাকেনা। একসময়ে আমি নিজে অন্যের অলক্ষ্যে একটু আদা চিবিয়ে নিয়ে শেষে কাচের ছোট ছোট হোমিওপ্যাথিক শিশিকে কড়্‌মড়্‌ করে চিবিয়ে দিতাম। প্রথমটা সবাই আশ্চর্য হতেন বটে, কিন্তু পরক্ষণেই আদার রসের ক্ষমতার কথা শুনে তাঁরা আরো বিস্মিত হতেন। অতএব ভাংগা কাচের ওপর লাফিয়ে পড়া অথবা সেই কাচের ওপর শুয়ে বুকে ভার নেওয়া, কিংবা কাচের ওপর উন্মুক্ত পুরোবাহু বেখে হাতুরীর পরিমিত ঘায়ে তাতে ভোঁতা ছেনী বিঁধানোর চেষ্টা দেখে অবাক্ হবার কিছু নেই। মনে রাখা দরকার, মানুষের দেহ রক্ত-মাংসের তৈরী, শরীর-চর্চার সাহায্যে তা অধিকতর সক্ষম হলেও লোহা বা পাথর হ'তে পারে না।

চেস্‌লিন্‌ মোটর গাড়ী থামানোর খেলাও দেখাতেন; প্রকৃত বলী ব্যক্তিরা কখনো এসব 'ম্যাজিক' দেখিয়ে লোকের বাহবা নেওয়া পছন্দ করেন না এবং নেহাৎ নিম্নস্তরের ব্যায়ামীরা শক্তির ক্ষেত্রে পাত্তা না পেয়ে অথবা পয়সার লোভে এই ধরণের ফাট্‌কা বা চটক্‌দারি খেলার আশ্রয় নিতে বাধ্য হন।

চেস্‌লিনের দেহখানা বিশাল ছিল ঠিকই; কিন্তু তাঁর দেহের মাপ নেবার সুযোগ আমার কখনো ঘটেনি। তবে 'খেলাধূলা' মাসিকে আমার এক বন্ধু তাঁর মাপ নিয়েছেন বলে লিখেছিলেন। সেই মাপটিই আপাতত দিলাম :—

তারিখ	২০।১২।৪৮
বয়স	৪৬ বছর
ভার	২৪৬ পাউণ্ড
দৈর্ঘ	৭১ ইঞ্চি
বাহু (?)	১৬½ ,,
গোছা (সংকুচিত)	১৫½ ,,
কব্জি	৮½ ,,
বুক (স্বাভাবিক)	৫০½ ,,
বুক (প্রসারিত)	৫৩½ ,,
কটি	৪৫ ,,
উরু	২৭ ,,
মোচা (ডান)	১৬⅞ ,,
মোচা (বাঁ)	১৭½ ,,
নলি	১০½ ,,

চেস্‌লিন্ শুধু একাকী দেশত্যাগী নন ; ১৯২২ অব্দে বিবাহের পর তিনি তাঁর স্ত্রী ভেরা চেস্‌লিন্‌কে সংগে নিয়ে সার্কাসে ঢুকেছেন। ভেরা সুগঠনা নন বরং স্থুল বপূ ও কুদর্শনা। কেননা '৬৪ ইঞ্চি উচ্চতায় ১৫৮ পাউণ্ড ভার' সচরাচর বড় পালোয়ানেরও হয়না। তথাপি তিনি 'নাচ' দেখিয়ে থাকেন। শক্তির পরিচায়ক খেলাও তিনি দু একটা দেখান। তাঁদের ছোট্ট মেয়েটি পর্যন্ত সার্কাসে নাচ দেখায়। অবশ্য মেয়েটির নাচ তারিফ করবার মতো।

বৈদেশিক মল্লের 'মুক্ত-আহ্বান'

১৯৩২ অব্দের অন্যতম প্রসিদ্ধ ঘটনা হোল গোলা মোহাম্মদের অ্যামেরিকা অভিযান। অ্যামেরিকায় সর্বমোট তিনি ১৩২টি কুস্তি লড়েছিলেন ; তার একটি কুস্তিতেও তিনি হারেন নি। গোটা কয়েক কুস্তি সমান গেলেও বাকী সমস্ত কুস্তিতে তিনিই জয়ী হয়েছিলেন। ১৯৩৪ অব্দে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৯৩৪ অব্দের অন্যতম বিশিষ্ট ঘটনা হচ্ছে চারজন বৈদেশিক মল্লের ভারতীয় মল্লদের উদ্দেশ্যে এক 'মুক্ত-আহ্বান' ঘোষণা। অক্টোবর মাসে ইটালিয় জাহাজ 'কণ্টে ভার্ডে' যোগে রোমেনীয় মল্ল আর্নন্ধ কোসিস্ ও জর্জ্জ ইওনেস্কো, বাভেরিয়ান মল্ল অটো হার্টি ভেবার এবং প্যালেষ্টাইনের পালোয়ান জেজি গোল্ডষ্টেইন্ বম্বেতে এসে অবতরণ করেন। ২৩এ নভেম্বর তাঁরা কলিকাতা উপস্থিত হন এবং ১৩ই ডিসেম্বর 'ষ্টেট্স্ম্যান্' পত্রিকা মারফৎ তাঁরা ভারতবর্ষের সকল শ্রেষ্ঠ মল্লের উদ্দেশ্যে এক 'মুক্ত-আহ্বান' ঘোষণা করেন।

এতদ্‌প্রসংগে বলা দরকার যে, আমাদের দেশের কোনো পত্রিকাতেই শক্তি-ক্রীড়া সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট না থাকায় কাগজওয়ালারা দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো এই ধরণের বাজে আহ্বান ছেপে দেন। তার ফলে বিনা পয়সায় ঐসব আহ্বানকারীর 'বিজ্ঞাপন' হয়ে গেলেও সাধারণ লোকের কাছে প্রকৃত বলী ব্যক্তিদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়ে যায়। কেননা, তাঁরা যার-তার আহ্বানে সাড়া দিতে পারেন না এবং তার জন্য সাধারণ লোকের ধারণা হয়, পরাজয়ের ভয়েই তাঁরা নীরব আছেন। পশ্চিম জগতে কিন্তু এই ধরণের অঘটন বেশী ঘটেনা ; কিংবা এরূপ আহ্বান ছাপা হ'লেও পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার সংগে

নিজেদের মন্তব্য বা টিকা প্রকাশ ক'রে থাকেন। অবশ্য আমাদের পত্রিকাগুলি সব সময়েই যে অজ্ঞতাবশে এধরনের আহ্বান বা সংবাদ ছাপেন তা নয়; বহু সময়ে বিশেষ বিশেষ কারণে ইচ্ছা করেও তাঁরা ব্যক্তি বিশেষকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। কারণ, জাতিগত, সম্প্রদায়গত, ধর্মগত বা ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের মূল্যই এদেশে বেশী। সে যা-ই হোক, বিদেশী মল্ল চতুষ্টয়ের ঐ আহ্বান প্রকাশিত হবার পরে একমাত্র গোবর বাবু তার উপযুক্ত জবাব দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন—

"তাঁদের (বৈদেশিক বলীদের) এই প্রস্তাব যদি আত্ম-বিজ্ঞাপনের উপায় মাত্র না হয়, তবে আমি তাঁদের ইচ্ছা পূরণের ব্যবস্থা করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু মল্ল-জগতে তাঁরা সুপরিচিত নন, তাঁদের অতীত কীর্তিও আমাদের কাছে অবিদিত। সুতরাং সুরুতেই কোনো প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় মল্লের সংগে তাঁদের কুস্তি করা চল্‌বেনা। প্রথমত একজন নাতি-গুরু ওজনের মল্লকে (Light Heavy weight Wrestler) এবং তারপরে কোনো দ্বিতীয় শ্রেণীর মল্লকে হারাতে পারলেই তাঁরা প্রথম শ্রেণীর কুস্তিবীরের সমকক্ষ ব'লে গণ্য হতে পারেন।

"বলা বাহুল্য, এইসব কুস্তি ভারতীয় নিয়মে হবে; কারণ যখনি আমাদের পালোয়ানেরা পশ্চিমে কুস্তি লড়তে গেছেন, তখনি তাঁদেরকে সেখানকার বিধি-ব্যবস্থা মানতে হয়েছে। অবশ্য, তাঁদের মনে যাতে কোনো ক্ষোভ না থাকে, তার জন্য আমি এরূপ বন্দোবস্ত করতে পারি যে, প্রথম বারের কুস্তিতে একান্ত নিষ্ফল না হ'লে সেই প্রতিদ্বন্দ্বীর সংগেই পুনরায় তাঁদেরকে পশ্চিমী প্রণালীতেও লড়তে দেওয়া হবে।

"এ প্রসংগে একথাও জানিয়ে রাখ্‌ছি যে, তাঁরা যদি আমার প্রস্তাবে সম্মত হন, তবে কুস্তিগুলি আমারই ক্লাবে হবে। কারণ সাধারণ-গম্য স্থানে আন্তর্জাতিক কুস্তির অনুষ্ঠান করতে পুলিসের যে অনুমতি আবশ্যক,

তা অতিশয় দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু কুস্তিগুলি যাতে নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তার জন্য সকল সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের এবং কলিকাতার ব্যায়ামবিদ্ ও মল্লকুশলী জনকয়েক প্রসিদ্ধ নেতাকে মল্লক্ষেত্রে আমন্ত্রণ করা হবে।"

গোবর বাবুর এই পত্রখানা পরের সপ্তাহের বিভিন্ন তারিখে ইংরেজী ও বাংলায় একাধিক দৈনিক কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। এর পরেই বৈদেশিক মল্লরা নীরব হয়ে যান। অবশ্য, গোবর বাবু পরে একদিন আমাকে বলেছিলেন যে, তাঁরা তাঁর সংগে ব্যক্তিগতভাবে গিয়ে দেখা করেছিলেন এবং গোবর বাবুর উপদেশ অনুযায়ী কিছুদিন এদেশে থেকে ভারতীয় কুস্তি ও ভারতীয় পালোয়ানদের বুঝবার চেষ্টা করতেও তাঁরা সম্মত হয়েছিলেন। তখন কলিকাতায় আগত বৈদেশিক 'এম্পায়ার সার্কাসে' তাঁরা যোগ দিয়ে ১৯৩৫, জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে কুস্তি ও শক্তির খেলা দেখিয়েছিলেন। সেই সময় কোনো কোনো ব্যক্তির চেষ্টায় ছোট গামার সংগে আর্নল্দ্ কোসিসের একটা কুস্তির কথা চলেছিল। শেষে সেই আলোচনা ভেস্তে যায় এবং ১৯৩৬ অব্দের মে মাসের পূর্বে এই কুস্তি আর সংঘটিত হয়নি। সে কথা পরে হবে।

বিস্কোর পত্র

১৯৩৪ অব্দের শেষের দিকে প্রসিদ্ধ ষ্টানিস্লস বিস্কো তাঁর ভাই ভ্লাডেক্ বিস্কো ও ভাগ্নে ক্যারল নোভিনা ছাড়াও তেরোজন দক্ষ মল্ল নিয়ে দক্ষিণ অ্যামেরিকার ব্রাজিল, আর্জেণ্টাইন, চিলি, পেরু, ইত্যাদি দেশ পরিভ্রমণে গিয়েছিলেন। এইসময় আর্জেণ্টাইনের লুনা পার্কে এক বিরাট কুস্তির দংগল হয়। তাতে পৃথিবীর আঠাশটি দেশের কয়েক শত বড় বড় মল্ল দশ মাস কাল প্রতিযোগিতা করেছিলেন। অনুমান কুড়ি

লক্ষাধিক লোক এই দংগল দেখেছিল। এই দংগলের ১১৮টি লড়াইয়ে জয়ী হয়ে ভ্লাডেক বিস্কো 'বিশ্ব-বীর' ব'লে ঘোষিত হয়েছিলেন এবং তাঁকে চূড়ান্ত লড়াই করতে হয়েছিল বত্রিশ হাজার লোকের সামনে ১৯৩৫, ২০এ জুন প্রসিদ্ধ পালোয়ান আবী কাপলানের বিরুদ্ধে। আর জনপ্রিয় মল্ল হিসাবে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করেছিলেন কারল নোভিনা। এই পুরস্কার দিয়েছিলেন আর্জেণ্টাইনের খেলাধুলা সম্পর্কিত সাপ্তাহিক কাগজ 'ও-কে'। এবিষয়ে চূড়ান্ত মীমাংসার জন্ম নোভিনা সাইবেরিয়ান মল্ল হাল্সীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এক হাজার ভোটের ব্যবধানে মোট আঠারো হাজার ভোট পেয়ে প্রথম স্থান দখল করেছিলেন।

এই দংগল চলার সময়ে, ১৯৩৫ অব্দের মে মাসে হঠাৎ একদিন বুয়েনস্ এরিয়াজ থেকে ষ্টানিসলস্ বিস্কো গোবর বাবুকে এক ব্যক্তিগত পত্র লিখেছিলেন। পত্রটি এই :—

"তুমি কেমন আছ? এবং ভারতবর্ষের স্বাস্থ্যই বা কেমন? আমি এখন দক্ষিণ অ্যামেরিকার ব্রাজিল, আর্জেণ্টাইন, চিলি, পেরু ইত্যাদি দেশে কুস্তি ল'ড়ে বেড়াচ্ছি।

"ভারতবর্ষে আজকাল কুস্তি কি রকম চল্‌ছে? তুমি আমাকে জন কয়েক বিশিষ্ট তরুণ ভারতীয় মল্লের ছবি পাঠাতে পার কি? আমি আমার সংগে একজন বেশ ভালো ভারতীয় মল্ল রাখ্‌তে চাই; তাহলে ভারতীয়রা যে কুস্তিতে কতো দক্ষ, দুনিয়ার লোক তা বুঝতে পারবে।

"গামা কেমন আছেন? তুমিই বা কেমন আছ? এখনো কি কুস্তি লড়ো? যদি এখনো কুস্তির অভ্যাস থাকে, তবে মাস কয়েকের জন্ম একবার এখানে আস্‌বে কি?"

এই পত্রের জবাব গোবর বাবু বিস্কোকে হয়তো বন্ধুভাবেই দিয়েছিলেন এবং ভারতের বাইরে যেতে হলে কি কি সর্তে যেতে পারেন,

তা-ও তিনি তাঁকে নিশ্চয়ই জানিয়েছিলেন। কিন্তু এই পত্রের মধ্য দিয়ে আমরা একটা বিষয় পরিস্কারভাবে বুঝতে পেরেছি। তা হোল, বিস্কোর ভারতীয় কুস্তি শেখার অদ্ভুত আগ্রহ। ভারতীয় কুস্তি কতটা উন্নত, দুনিয়ার মানুষকে তা জানানোর আগ্রহ বিস্কোর কতোখানি ছিল বা আদৌ ছিল কি না, জানি না। কিন্তু দীর্ঘ কালের বিস্তর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি নিশ্চিতভাবে বুঝেছিলেন, ভারতীয় কুস্তি-বিজ্ঞানের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে যার জন্য ভারতীয় মল্লরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠত্বের আসন দখল করতে পারে এবং কালো জাতির কাছ থেকে সেই আসন ছিনিয়ে নিতে হ'লে তাদেরই কাছে ছাত্রের মতো দীর্ঘকাল কুস্তি শিক্ষা করতে হবে ; সেখানে শেতাংগের মিথ্যা আত্মাভিমান চল্‌বে না।

বাস্তবিকপক্ষে, বিস্কোর মতো এমন নিবিড়ভাবে ভারতীয় কুস্তি অধ্যয়ন একমাত্র জার্মান মল্ল ক্রেমার ছাড়া আর কোনো পশ্চিমী মল্ল করেছেন ব'লে জানিনা। ভারতে অবস্থান সময়ে তিনি এদেশের বড় বড় পালোয়ানের কাছে কিছুদিন কুস্তি অভ্যাস করেছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়
বিপর্যয়
(১৯৩৬-১৯৪০)

ক্রেমারের ভারত অভিযান

পৃথিবীর শরীর-চর্চার ইতিহাসে জার্মান ব্যায়ামীদের স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য, অন্তত বিগত এক শতাব্দী কালের মধ্যে এ বিষয়ে জার্মানি যে কীর্তি প্রতিষ্ঠা করেছে, তা অনস্বীকার্য যদিও তদপেক্ষা অধিকতর কীর্তি প্রতিষ্ঠা করা এখন অন্য রাষ্ট্রের পক্ষেও সম্ভব। জার্মানির ব্যায়াম-শিক্ষক প্রফেসর লুইস্ আটিলা, শক্তিবীর কার্ল আব্স্, আলয়সিয়াস্ মার্ক্স, ইউজেন্ সাণ্ডো, জন্ গ্রুন্ মার্ক্স, আর্থার সাক্সন, মাক্স সিক্, হার্মান গর্ণার, হেনরি স্টেইন্বর্ণ্, বি-সম টাল্বিদ্ (Planche Master) পলিনেটি, মুষ্টিক মাক্স্ স্মেলিং, মাক্স্ বিয়ার, ভারোত্তোলক জোসেফ্ মাংগের ইত্যাদির নাম ব্যায়াম-জগতে সুপরিচিত। কুস্তিতেও বহু জার্মান প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। এই প্রসিদ্ধ বলীর দেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ মল্ল ছিলেন এড্মুণ্ড ফোন্ ক্রেমার। ক্রেমার প্রায় চার বছর ভারত পরিক্রমণ ক'রে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, এবং তাঁর পূর্বে বা পরে আর কোনো বৈদেশিক পালোয়ান এদেশে এসে এতখানি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেননি যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে দৈব ক্রেমারকে অনেকখানি সহায়তা করেছিল।

১৯০৬, ১৩ই ডিসেম্বর পশ্চিম জার্মানির ডুইস্বুর্গ সহরে ক্রেমারের জন্ম হয়। তাঁর বাবা ছিলেন পূর্ব প্রুশিয়ার অধিবাসী; স্বাস্থ্য-শক্তিতে তিনিও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিন ভাই ও দুই বোনের মধ্যে ক্রেমার ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। ছেলেবেলা থেকেই খেলাধূলার ওপর ক্রেমারের অসাধারণ অনুরাগ জন্মেছিল; বিদ্যালয়ে পড়বার সময়ে ১৪ বছর বয়সে তিনি কুস্তি সুরু করেন এবং ১৫ বছর বয়স থেকেই বিদ্যালয়ের

বার্ষিক কুস্তি-প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে থাকেন। তখন প্রতি বছর গরমের সময়ে জার্মানির কোনো-না-কোনো সহরে স্কুলের ছেলেদের একবার করে কুস্তি প্রতিযোগিতা হোত। ১৯২৩ অব্দে জার্মানির এরফুর্থ সহরে যে প্রতিযোগিতা হয়, তাতে ৩০০ ছাত্র প্রতিযোগী যোগ দিয়েছিল। এই প্রতিযোগিতায় পর পর গোটা দশেক কুস্তি লড়ে ক্রেমার শ্রেষ্ঠ স্থান দখল করেন। অল্পকাল পরেই ডর্টমুণ্ড সহরে আর একটি বড় কুস্তির দংগল হয়, যাতে স্কুল-কলেজের ছেলে ছাড়াও পশ্চিম জার্মানির বিভিন্ন জায়গা থেকে সব রকমের অ-পেশাদার মল্লরা যোগ দিয়েছিল। দংগলে দুটি ভাগ ছিল—ছোট দল (Junior) ও বড় দল (Senior)। ক্রেমার ছোট দলের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে পশ্চিম জার্মানির প্রাধান্য (Junior Wrestling Championship of West Germany) লাভ করেন।

১৯২৫ অব্দে ক্রেমার ডুইস্‌বুর্গের একটি ব্যায়ামাগারে ব্যায়াম-শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। ১৯২৭ অব্দে অ-পেশাদার মল্ল হিসাবে ক্রেমার সারা জার্মানির বিভিন্ন সহর পরিভ্রমণ করেন এবং এই উপলক্ষে তাঁকে প্রত্যহ ৮।১০ টা কুস্তি লড়তে হয়েছিল। এই কুস্তিগুলিতে পর পর জয়ী হওয়ায় তাঁর খ্যাতি দিক্‌বিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং ১৯২৮ অব্দে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন।

তখন 'গ্যেটে পুরস্কার' জার্মানিতে সব চেয়ে লোভনীয় পুরস্কার ছিল যা শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য ও ব্যায়াম,—এই কয়টি বিষয়ের মধ্যে বছরে মাত্র একবার একজনকে দেওয়া হোত যিনি এইসব বিষয়ের মধ্যে তুলনামূলকভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হতেন। ১৯৩২ অব্দে তিনি সব চেয়ে সম্মানিত এই 'গ্যেটে পুরস্কার' লাভ করেন, তার অর্থ এই যে, সেই বছর জার্মানির সমস্ত শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক ও

ব্যায়ামবিদের মধ্যে মানের নিরিখে ক্রেমারের মান ছিল সর্বোচ্চে এবং ক্রেমার বলেছিলেন, এই সম্মান লাভ তাঁর জীবনের এক অবিস্মরনীয় ঘটনা যার মূল্য বিশ্ব-জয়ের চেয়ে কম নয়।

এই বছরই অ্যামেরিকার লস্ এঞ্জেলস্ সহরে বিশ্ব অলিম্পিক খেলায় 'ক্যাচ্চ্-অ্যাজ্ ক্যাচ্চ্-ক্যান্' কুস্তির মধ্যম ওজনে ক্রেমার প্রতিযোগিতা করেন এবং চূড়ান্ত যুদ্ধে ২০ মিনিট কাল লড়ে স্নইডিশ্ মল্ল ক্রাডিয়ার কাছে শুধু সংখ্যায় পরাজিত হন। এর দু মাস পরেই তিনি ডুইস্‌বুর্গ সহরে রোমেনিয়ান মল্ল ভল্‌জাগ্‌কে গ্রীকো-রোমান কুস্তিতে মাত্র ১০ সেকেণ্ডে চিৎ করেন। পরের পরের ১৯৩৩, জানুয়ারি মাসে কোলোন্ সহরে ক্রেমার তাঁর পূর্ব বিজেতা সুইডেনের ক্রাডিয়াকে ৪ মিনিট ৩০ সেকেণ্ডে হারিয়ে 'বিশ্বের মধ্যম ওজন কুস্তি-প্রাধান্য' লাভ করেন।

১৯৩৪ অব্দে ভিয়েনা নগরে ক্রেমার সর্বপ্রথম পেশাদার মল্ল হিসাবে ফিনিশ্ বীর হুটান্‌কে পরাস্ত করেন এবং তারপরেই তিনি বিশ্ব পরিক্রমায় বহির্গত হন। এই উপলক্ষে একবার তিনি স্টক্‌হোম নগরে 'নন্-স্টপ্ রেস্‌টলিং কন্‌টেস্টে' চারজন মল্লকে ৩ মিনিট ৩০ সেকেণ্ডে পরাজিত করেন। ১৯৩৫ অব্দে এথেন্সে তিনি প্রসিদ্ধ মল্ল রুডি ডুসেকের ভাই আর্ণি ডুসেক্‌কে ১৪ মিনিটে হারিয়ে দেন। ক্রমশ তিনি ভারতে আসবার পথে তুরস্কের মুস্তাফা, মিশরের বালি জাফর, আরব ও ইরাকের ক্রিকর আদ্‌মিঞা, হাদ্‌সি আব্বাস্, জিলাল, জুলু ইত্যাদি অনেক কুস্তিবীরকে পরাস্ত করেন। এইভাবে ক্রমাগত জয়ী হ'তে হ'তে তিনি পারস্যের মধ্য দিয়ে বেলুচিস্থানে উপস্থিত হন এবং সেখান থেকে তিনি সোজা ১৯৩৬, ১লা জানুয়ারি কলিকাতা উপস্থিত হন।

গোংগার ঐতিহাসিক পরাজয়

উঠ্‌তি বয়সে লস্ এঞ্জেলেসে সুইডেনের ক্রাডিয়া ছাড়া ভারতে আসবার পূর্বে ক্রেমার আর কোথাও পরাজিত হননি। অবশ্য লস্ এঞ্জেলেসের যুদ্ধেও তিনি চিৎ হননি এবং পেশাদারি কুস্তির নিয়মে তাকে সমান বলে গণ্য করা হয়। অতএব ভারতে আসবার পূর্ব পর্যন্ত ক্রেমারের মল্ল-জীবন বাস্তবিকই গৌরবোজ্জ্বল ছিল। কলিকাতায় এসে ক্রেমার প্রথমেই গোবর বাবুর সংগে দেখা করেছিলেন। সপ্তাহ খানেক এখানে থেকে ৮ই জানুয়ারি তিনি দিল্লী রওনা হন এবং সেখান থেকে ১২ ই জানুয়ারি লাহোরে উপস্থিত হন।

লাহোরে অবস্থান সময়ে ছোট-খাটো মল্লদের ডিংগিয়ে সৌভাগ্যবলে তিনি একবারেই গামা ও ইমামের সুযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী শিয়ালকোটের গোংগা পালোয়ানের সংগে লড়বার সুযোগ পেয়ে যান এবং দৈবক্রমে তিনি তাতে জয়ীও হয়েছিলেন।

১৯৩৬, ২৩ এ মার্চ লাহোরের মিণ্টো পার্কে গোংগা ও ক্রেমারের এই ঐতিহাসিক কুস্তি সংঘটিত হয়েছিল! একথা সংশয়ের অতীত যে, মল্ল হিসাবে গোংগা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বীরের সমকক্ষ ছিলেন। এই যুদ্ধের ফল কি হওয়া উচিত, অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের তা একরূপ পরিস্কার জানা ছিল। কেননা, বলী বা মল্ল হিসাবে গোংগার কাছে ক্রেমারের মান সর্বদাই শিশুতুল্য ছিল। অতএব, খবরের কাগজে যেদিন হঠাৎ দেখলাম, গোংগা ক্রেমারের কাছে দু মিনিটে হেরে গিয়েছেন, সেদিন আমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত ও হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম—যেমন হয়েছিলাম আর একবার জার্মান মুষ্টিক ম্যাক্স্ স্মেলিংয়ের হাতে নিগ্রো

মুষ্টিক জোসেফ্ লোইসের পরাজয়ের বার্তা প'ড়ে! অবশ্য, উভয়ক্ষেত্রেই দৈব ও অনিবার্য পরিস্থিতি দায়ী ছিল: তথাপি, পরাজয় হয়েছিল একথা স্বীকার করতেই হবে। এবং তা-যে মল্ল ও মুষ্টি-জগতের ঐতিহাসিক সত্য, সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই।

গোংগা ও ক্রেমারের কুস্তিটি সংক্ষেপে বল্‌ছি। প্রথম ক্রেমার মল্লক্ষেত্রে এলেন; আধ মিনিট পরেই গোংগাও লাফাতে লাফাতে এসে উপস্থিত হলেন। জয় লাভের স্থির বিশ্বাসে গোংগার চোখ-মুখ ছিল দীপ্তিমান। তিনি ভেবেছিলেন, সাহেব পালোয়ানেরা কুস্তি-বিজ্ঞানী নয়; তবু সতর্কতা প্রয়োজন। তাই হাত মিলানোর পরে দুজন দুজনের ঘাড়ে হাত দিয়ে একে অপরের শক্তি বুঝে নেবার চেষ্টা করলেন। এইভাবে মিনিট খানেক কেটে যাবার পরে যখন নিজের জয়লাভ সম্পর্কে গোংগার আর তিলমাত্র সংশয় রইল না, তখন তিনি ক্রেমারকে ছেড়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন এবং পর মুহূর্তেই প্রচণ্ড বিক্রমে ক্রেমারকে আক্রমণ করলেন।

একথা বলাই বাহুল্য যে, শক্তি ও আকৃতিতে গোংগার কাছে ক্রেমারকে এতই নগন্য দেখাচ্ছিল যে, বিদেশী ক্রেমার স্বাভাবিকভাবেই দর্শকদের সহানুভূতি আকর্ষণ করেছিলেন। অতএব গোংগাকে আক্রমণ করতে দেখে ক্রেমারের আসন্ন পরাজয়ের আশংকায় সকলেই রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু ফল দাঁড়িয়ে গেল সম্পূর্ণ বিপরীত! কারণ যে মুহূর্তে গোংগা ক্রেমারকে ধরতে গেলেন, সেই মুহূর্তেই ক্রেমার তাঁকে প্রতিহত না ক'রে অকস্মাৎ পিছনের দিকে চিৎ হয়ে মল্ল-সেতু হয়ে গেলেন।

টাল ও শক্তি-বিজ্ঞানীরা নিশ্চয়ই জানেন, প্রবল শক্তির বেগকে বানচাল করতে হ'লে দুর্বলকে সেই বেগের অনুকূলেই নিজের

শক্তিকে কাজে লাগাতে হয়। ইওরোপীয় কুস্তির 'ফ্লাইং মেয়ার', ভারতীয় কুস্তির 'ধোবী পাট' এবং জাপানী যুযুৎসুর 'সে-ও-ই-নাগে' এই টাল্ ও শক্তি-বিজ্ঞানকে ভিত্তি করেই তৈরী হয়েছে। আমার ব্যক্তিগত জ্ঞান ও ধারণা, তড়িৎক্ষিপ্র আক্রমণের মুখে 'ফ্লাইং মেয়ার', 'ধোবী পাট' বা 'সে-ও-ই-নাগের' চেয়েও 'মল্ল-সেতু' অনেক বেশী কার্যকরী যদিও এই কৌশল প্রয়োগ করতে ঘাড় ও মাথার খুলির প্রচণ্ড শক্তি ও সহনশীলতার প্রয়োজন হয়! দুর্ভাগ্য, আমরা 'ভারতীয় বৈশিষ্ট্য, ভারতীয় বৈশিষ্ট্য' বলে সর্বদা এমন অন্ধ থাকি যে, বৈদেশিক উৎকৃষ্ট বিষয়গুলি আমরা দেখ্‌তেই পাই না বা দেখেও স্বীকার করাটাকে লজ্জাকর মনে করি। মুখ্যত পশ্চিমীদের মল্ল-সেতুর বিষয়ে স্বাভাবিক উপেক্ষাই গোংগার এই আকস্মিক পরাজয়ের জন্য দায়ী ছিল। কেননা, আক্রান্ত হয়েও ক্রেমার তাঁকে বাধা না দিয়ে পাল্টা চিৎ হবার ভংগী করবেন, এটা গোংগার স্বপ্নের অগোচর ছিল। তাই, নিজ শক্তির বেগে তো বটেই, অধিকন্তু ক্রেমারের হ্যাঁচ্‌কা টানে গোংগা তাঁর দেহের ওপর দিয়ে মাথার পেছনে উল্টিয়ে পড়লেন এবং ক্রেমারও সেই সুবর্ণ মুহূর্তেই পায়ে 'স্প্রিং' করে বিদ্যুৎবেগে গোংগার বুকে চড়ে বস্‌লেন! সংগে সংগে গোংগার কাঁধদুটিও মাটিতে ঠেকে গেল! মাত্র দু মিনিটের মধ্যে এই অদ্ভুত ঐতিহাসিক কুস্তির যবনিকা পাত ঘটে গেল! জার্মান কুস্তি বিজ্ঞানে এই বিশিষ্ট কৌশলটি 'সুপ্লেস্' (Supless) নামে পরিচিত ব'লে ক্রেমার আমাকে বলেছিলেন।

পরে ক্রেমার কলিকাতায় এলে ২রা মে আমি তাঁকে এই কুস্তির বিষয়ে তাঁর মতামত জানতে চেয়েছিলাম। তিনি কিন্তু বিনা দ্বিধায়ই বলেছিলেন যে, সেইদিন হাত মিলানোর পরেই তাঁর মনে হয়েছিল, এত

বড় বলীর বিরুদ্ধে তিনি আর কখনো দাঁড়াননি। 'সুপ্লেস্' প্রয়োগ করবার পূর্ব মুহূর্তেও তিনি ভাবতে পারেন নি যে, সে সুযোগ তাঁর কখনো আসবে। এমন কি, 'সুপ্লেস্' প্রয়োগ করবার মুহূর্তেও তাঁর মনে হয়নি যে, তাতে কাজ হয়ে যাবে। কিন্তু হয়ে গেছে অকস্মাৎ! তিনি ভাগ্যবান!

ক্রেমারের ভাষায় গোংগা ছিলেন—চমৎকার (Splendid), সেরা মল্ল (Greatest wrestler). আর গোংগা! দু এক সপ্তাহের মধ্যে পরিচিত লোকের দিকে তিনি চোখ তুলে তাকাতে পারেন নি। পরিচিত লোকের প্রশ্নে শুধু নিজের বুক চাপ্‌ড়ে ইশারায় বলতেন, "গুলি ক'রে মারো।" আত্মগ্লানিতে কয়েক সপ্তাহের জন্য তিনি মুশ্‌ড়ে পড়েছিলেন!

১৮৯৪ অব্দে পঞ্জাবের শিয়ালকোট সহর থেকে মাইল ছয়েক দূরবর্তী উগোকি গ্রামে গোংগার জন্ম হয়। তাঁর বাবা গামু পালোয়ান ছিলেন গোলাম, কাল্লু, কিক্কড়, রহমান ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ পালোয়ানদের সমসাময়িক এবং প্রায় সমকক্ষ। গোংগার ঠাকুরদা বালি পালোয়ানও ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মল্ল ছিলেন। সকল ভাইদের মধ্যে গোংগাই ছিলেন বয়স ও ক্ষমতায় বড়। অন্যান্য ভাইরাও ক্ষমতাবান মল্ল। গোংগার আসল নাম ছিল ফিরোজউদ্দিন; কিন্তু শিশুকালে গুরুতর রোগগ্রস্ত হ'য়ে তিনি বাক্ ও শ্রবণশক্তি হারিয়ে ফেলেন সেই থেকেই জনসাধারণের কাছে তিনি 'গোংগা' (Deaf and Dumb) নামে সমধিক প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন।

মল্ল হিসাবে গোংগা নিঃসন্দেহভাবে গামা, ইমাম, গোলাম মহিউদ্দিন, আহমদ বখ্‌শ ইত্যাদির সমকক্ষ ছিলেন। গামা গোংগাকে ভয়ের চোখে দেখতেন এবং সেইজন্যেই তিনি নিজেকে সর্বদা ছোট গামা, হামিদ এবং ইমাম বখ্‌শ—এই তিনটি দৃঢ় সচল প্রাচীরের আড়ালে রাখতেন।

গোংগা কিন্তু ছোট গামাকে কুস্তিতে বার বারই হারিয়েছিলেন। হামিদ্ পালোয়ানও গোংগার হাতে একাধিকবার হেরেছিলেন এবং ইমাম বখ্‌শকেও একবার হারতে হয়েছিল! এইভাবে গোংগা গামার সংগে লড়বার অধিকার পেয়েছিলেন ঠিকই, তথাপি নানা টালবাহনার সাহায্যে গামা গোংগাকে এড়িয়ে গিয়েছিলেন! গামা ও গোংগার মধ্যে শক্তি পরীক্ষা হ'লে ফল কি দাঁড়াত, তা কেউ হলপ্ করে বল্‌তে পারেনা। তথাপি গোংগার নাম ও খ্যাতি তাঁদের তুলনায় কম; তার কারণ গোংগা ছিলেন বুদ্ধিহীন। তাছাড়া, আমরাও সত্যিকারের পর্য্যালোচনা দ্বারা কারু গুণ বিচার করিনা এবং যে দিকে দল ভারী দেখি, আমরাও সাধারণত সেই দিকেই ঝুঁকে পড়ি, আর সেই দিকের প্রচারকার্যেও মত্ত হই। পাশ্চাত্য জগত গামা, ইমাম, গোলাম মহিউদ্দিন বা আহম্মদ বখ্‌শের ক্ষমতা স্বীকার করেছে ব'লেই তো আমরাও তাঁদেরই জয়গান ক'রে এসেছি।

নোবেল পুরস্কার লাভ করবার পূর্বে আমরা কি রবীন্দ্রনাথকেই সম্মান দেখিয়েছিলাম? তাই, নোবেল পুরস্কার লাভের পর যখন কলিকাতা থেকে স্পেশাল ট্রেনযোগে বাংলার পাঁচশত সম্মানিত ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতনে অভিনন্দন দিতে গিয়েছিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁদের এই স্তুতিবাদে বিরক্ত হয়ে অভিনন্দনের উত্তরে ব'লেছিলেন যে, তাঁদের দেওয়া সম্মানের পাত্র তিনি মুখের কাছে নিতে পারেন, কিন্তু পান করতে তিনি অক্ষম!—এই তো আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য, জাতীয় ধারা! অতএব গোংগা পশ্চিম দুনিয়ায় গিয়ে শ্রেষ্ঠ মল্ল হিসাবে পশ্চিমীদের স্বীকৃতি যদি না পেয়ে থাকেন, তবে তিনিই বা শ্রেষ্ঠ হবেন কেমন করে? তাই, তিনি রইলেন চিরদিন অখ্যাত, অবজ্ঞাত। এটাই কি স্বাভাবিক?

জিজার নির্বুদ্ধিতা

ভারতবর্ষে ক্রেমার দ্বিতীয় কুস্তি লড়েন জিজা খৈওয়ালার সংগে লাহোরের মিণ্টো পার্কে পরবর্তী ১৯ এ এপ্রিল। বিচারক ছিলেন রায় সাহেব কিরপা নারাইন।

জিজা ও ক্রেমারের মধ্যে কুস্তির সুরু দেখে জিজাকেই শ্রেষ্ঠতর মনে হয়েছিল। মাত্র ১ মিনিট ৩০ সেকেণ্ডের সময় ক্রেমার জিজার ওপর জার্মান 'শ্লয়ডার' (Schleuder), যা ভারতীয় 'ঢাক' প্যাচের মতো, কস্‌তে গিয়ে নিজেই তাঁর বাম কাঁধ চেপে অর্ধ চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে যান; জিজা কিন্তু এক পা-ও টলেননি। তাই ক্রেমারকে মাটিতে পড়তে দেখেই তিনি নিজের জয় হয়েছে মনে ক'রে আনন্দে লাফাতে লাফাতে বিশাল জন-সমুদ্রের মধ্যে মিশে গেলেন—আর ফিরলেন না! কার্যত ক্রেমার চিৎ না হওয়ায় এবং জিজা ফিরে না আসায় অগত্যা জার্মানকেই জয়ী ঘোষণা করতে হয়েছিল।

আমাদের দেশের মল্লগণ কোনো শক্তিশালী সংঘ বা সমিতির অধীন না থাকায় তাঁরা পূর্বাপর খেয়ালমতো লড়াই ক'রে এসেছেন। এমন কি, বহু সময়ে তাঁরা বিচারকের নির্দেশকেও অমান্য ক'রে থাকেন। আবার অনেক সময় দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে মারামারি পর্যন্ত বাধে। তার ফলে স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষিত সমাজ কুস্তিকে ছোটলোকী ব্যাপার জ্ঞানে ঘৃণা ক'রে এসেছেন। ভারতীয় মল্লদের এই খেয়াল-খুসীর বিরুদ্ধে আমি ১৯২৯ অব্দ থেকে সাধ্যমতো লিখে আস্‌ছি এবং 'কুস্তি সংঘ' গঠনের জন্য বার বার আবেদনও করেছি। ১৯৩৬ অব্দে এদেশে আমিই প্রথম দেশবাসীর কাছে কুস্তি সংঘ গঠনের একটি

পরিকল্পনা পেশ করেছিলাম। অত্যন্ত আনন্দের কথা, আমার পরিশ্রমের ফলে কুস্তি প্রিয় ব্যক্তিগণ শেষ পর্যন্ত অ পেশাদার কুস্তি ফেডারেশন গঠনও করেছেন। কিন্তু এখনো পর্যন্ত এদেশের পেশাদার মল্লদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোনো সংঘ গঠিত হয়নি। কবে তা হবে, তার নিশ্চয়তা নেই। এবং তা না হওয়া পর্যন্ত ভারতীয় কুস্তি যতোই বৈজ্ঞানিক কলা-কৌশল যুক্ত হোক না কেন, কিছুতেই তা সভ্য লোকের সমর্থন পাবে না, বা ব্যাপকভাবে এর চর্চাও হবে না। অতএব ভারতীয় কুস্তির মানও দিনের পর দিন নিম্নগামী হবেই হবে।

কোসিসের পরাজয়

রোমেনীয় মল্ল আর্নল্দ কোসিসের কথা পূর্বেই একবার আলোচিত হয়েছে। ১৯৩৫ অব্দের গোড়ায় ছোট গামার সংগে তাঁর প্রতি-যোগিতার আলোচনা চলেছিল বটে, কিন্তু তখন তা কার্যে পরিণত হয়নি। এরপরে ক্রেমারের ভারতে আগমন এবং ভারতীয়দের বিরুদ্ধে তাঁর দুই বারের জয়লাভ বৈদেশিক মল্লদের যথেষ্ট প্রলুব্ধ করে। সেই সময় অর্থাৎ ১৯৩৫, এপ্রিল-মে মাসে ব্রহ্মদেশের রেংগুন সহরে একটি কুস্তির দংগল অনুষ্ঠিত হয়! কোসিস্ এই দংগলে যোগদান করেন এবং ১০ই মে ছোট গামার কাছে ৬ মিনিটে পরাজিত হন।

পরবর্তী ১৯এ মে কলিকাতায় আমার সংগে কোসিসের ঐ কুস্তি সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু দেখলাম, ঐ পরাজয়কে কোসিস সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেননি; এবং নেহাৎ আকস্মিক পরাজয় মনে করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, গামা তাঁকে মাটিতে আছড়ে ফেলবার সংগে সংগেই তিনি 'মল্ল-সেতু' করেছিলেন। কিন্তু মাটির

সংগে বালি মেশানো থাকায় তাঁর সেতু ফস্কে গিয়ে তাঁর পিঠ মাটিতে ঠেকে গিয়েছিল। তিনি আরও মন্তব্য করেছিলেন যে, ইওরোপীয় প্রথায় গদী পাতা থাকলে এই দুর্ঘটনা হোতো না। আমি তখন তাঁকে ভবিষ্যতে সতর্ক হবার জন্য বলেছিলাম যে, শুধু পরাজয় এড়াবার জন্য যখন তখন সেতু করলে ভারতীয়দের কাছে তাঁকে কিন্তু নিশ্চয়ই ঠকতে হবে। কেননা সেতু যতো শক্ত এবং যতো জোরালোই হোক, দক্ষ ভারতীয়দের কাছে তা শুধু নিরর্থক হবে না, পরাজয় বহও হবে; কেননা, তাঁদের চাপে সেতু ধ্বসে যাবেই। তবু বন্ধুবর কিছুমাত্র দমিত হলেন না; দৃঢ়ভাবে বললেন, "No, no Mr. Bose, I am known in Europe as the King of Bridges!" অবশ্য তাঁর এই দম্ভ পরে বহুবার চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়েছিল—সে কথা যথাসময়ে বলা যাবে।

এতদ্‌প্রসংগে বলা দরকার যে, কোসিস্ এদেশে পরে বহু পরাজয় বরণ করেছিলেন, এবং একেবারে সাধারণ পালোয়ানদের কাছেও হেরেছিলেন। অথচ তাঁর গায়ে জোর ছিল বিস্তর। তাঁর এই পরাজয়ের কারণ ছিল এই যে, তিনি সাধারণত মন্থর প্রকৃতির লোক ছিলেন; ক্রেমার বা অন্যান্য পালোয়ানদের সংগে নিত্যকার অভ্যাস সময়ে বা বাজির প্রতিদ্বন্দ্বিতার কালে, তাঁর এই মন্থরতা সর্বদাই অতি স্পষ্ট ছিল। অধিকাংশ সময়েই দেখেছি, আত্মরক্ষাত্মক নীতিতে তিনি লড়তেন; অথচ আত্মরক্ষাত্মক কুস্তি ভয়ানক শক্ত ব্যাপার। আক্রমণাত্মক কুস্তির একটা সুবিধা এই যে, তাতে প্রতিপক্ষের চিন্তা করার সুযোগ মিলে কম; এবং প্রতিপক্ষের সামান্যতম দুর্বলতার সুযোগেই তাঁকে আয়ত্তে আনা যায় না আত্মরক্ষাত্মক পন্থায় কখনো হয় না। ভারতীয়, বিশেষ করে পাঞ্জাবী পালোয়ানেরা আক্রমণাত্মক

নীতিতে অভ্যস্ত। তাই, প্রায় সর্বত্রই কোসিস্‌কে পরাভব স্বীকার করতে হয়েছিল।

আমি বরং ছোট গামার বিরুদ্ধে তাঁর দীর্ঘ ৬ মিনিট লড়ায় বিস্মিত হয়েছি। কেননা, দৈহিক বিপুলতা, শক্তি, দম, কৌশল সব দিকেই ছোট গামা শ্রেষ্ঠতর ছিলেন। ১৯৩৩, ১০ই ডিসেম্বর আমি তাঁর যে মাপ নিয়েছিলাম, তা দেখলেই একথা স্পষ্ট হবে :—

বয়স	৩৪ বছর
ভার	২৫০ পাউণ্ড
দৈর্ঘ	৬৮½ ইঞ্চ
গলা	১৯¼ ,,
বাহু (স্বাভাবিক)	১৬ ,,
গোছা (,,)	১৩ ,,
কব্জি	৮¼ ,,
বুক (স্বাভাবিক)	৪৯ ,,
বুক (প্রসারিত)	৫২ ,,
কটি	৪৫ ,,
পাছা	৫৭ ,,
উরু	২৬½ ,,
হাঁটু	১৬½ ,,
মোচা (সংকুচিত)	১৭ ,,
নলি	১০¼ ,,

কোসিস্ ১৯০৩, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি হুংগারিতে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু ১৯১৪-১৮ অব্দে বিশ্বযুদ্ধের ফলে ইওরোপে যে ওলট-পালট হয়, তাতে তিনি রোমেনিয়া রাষ্ট্রের প্রজা গণ্য হন অর্থাৎ তাঁর জন্মস্থান রোমেনিয়া রাষ্ট্রের অন্তর্গত হয়ে যায়।

শিশুকাল থেকেই তিনি ব্যায়াম-প্রিয় ছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর বাবা-মায়ের কড়া বিরুদ্ধাচরণ ছিল। তাই প্রবল-জেদী বালক আর্নল্দ মাত্র ৮ বছর বয়সে একদিন ঘর থেকে পালিয়ে এক ছোট সার্কাস দলে ঢুকবার চেষ্টা করেন। অবশ্য অবিলম্বেই তিনি বাবা-মায়ের খপ্পরে প'ড়ে বাড়ী ফিরতে বাধ্য হন। কিন্তু ব্যায়ামের প্রতি তাঁর এই দুর্দমনীয় আগ্রহের নমুনা দেখে বাবা-মাও শেষ পর্যন্ত তাঁকে আর বাধা দেননি। ১৯১৬ অব্দে তিনি হুংগারির প্রসিদ্ধ মল্ল ডক্টর হোদোর বেলার কাছে কুস্তি শিখতে থাকেন এবং শীঘ্রই এ বিষয়ে বেশ কৃতিত্ব অর্জন করেন।

১৯২০ অব্দে তিনি রোমেনিয়ার আন্তর্বিদ্যালয় কুস্তি-প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরে তিনি ইওরোপের নানা জায়গায় ঘুরে বহু কুস্তি প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন! ১৯২৮ অব্দে কোসিস প্রায় ২৫ বছর বয়সে বেলগ্রেদে রাশিয়ার প্রসিদ্ধ বলী ও মল্ল ইভান্ জাইকিনের সংগে আপোষে কুস্তি লড়েছিলেন। যদিও তখন জাইছিন্ বিগত যৌবন এবং বয়স তাঁর ঠিক ৪৬ বছর, তথাপি কোসিস্ নিজেই বলেছিলেন যে, কুস্তির সুরুতেই তিনি শিশুর মতো তাঁর করায়ত্ত হয়ে অত্যন্ত সাংঘাতিকভাবে ভূ-নিক্ষিপ্ত ও পর্যুদস্ত হয়েছিলেন। কোসিস্ এবং তাঁর স্বদেশবাসী সহযোগী জর্জ ইওনেস্কো উভয়েই আমাকে বলেছিলেন যে, জাইকিনের সমকক্ষ পালোয়ান পৃথিবীতে আর কেউ আছেন বলে তাঁরা বিশ্বাস করেন না। এই রুশ

বলীর জীবিতকালেই তাঁর শক্তির কীর্তি প্রবাদের সৃষ্টি করেছিল এবং ওরূপ বিরাট বলী পৃথিবীতে যে বেশী জন্মেন নি, তাও ঠিক।

১৯৩২ অব্দে কোসিস্ লস্ এঞ্জেলেসে বিশ্ব অলিম্পিক কুস্তিতে প্রতিযোগিতা করেছিলেন। এর অল্পকাল পরেই তিনি পেশাদার মল্ল হিসাবে জর্জ ইওনেস্কোর সংগে বিশ্ব পরিক্রমায় বহির্গত হন এবং সেই সূত্রে ভারতবর্ষেও এসেছিলেন।

তাঁরা যে বিরাট গাড়ীখানায় বিশ্ব-ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন, তা বাস্তবিকই দেখবার মতো ছিল। এই গাড়ীর সামনের উপরিভাগে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল 'Tour de Monde' অর্থাৎ 'বিশ্ব পর্যটক'। গাড়ীর মধ্যে একখানা করে শয্যা সমেত ছোট ছোট তিনখানা কুঠরী, খাবার ঘর, সাজ ঘর, স্নান ঘর, প্রস্রাবাগার, জলের চৌবাচ্চা এবং প্রয়োজনীয় সব রকম আস্‌বাবপত্রাদিই ছিল। গাড়ীতে উঠলে মনে হোত, যেনো একখানা সুসজ্জিত চলমান ছোট্ট কুঠরীতে ব'সে আছি। খাট ও টেব্‌ল্ চেয়ারে এমন মূল্যবান স্প্রিং লাগানো ছিল যে, চলবার সময়ে তেমন ঝাঁকানিও লাগত না।

কুস্তি ছাড়া কোসিস্ শক্তির কাজেও বিশেষ দক্ষ ছিলেন এবং তিনি যে-সব শক্তির কাজ দেখাতেন, সে-সব কাজ দেখানোর মতো মরদ বাংলা দেশে বিশেষ কেউ ছিলেন না। যেমন,—কুকুর বাঁধবার মজবুত শিকলকে দুহাতে বুকের কাছে ধরে রেখে শুধু মোচড় দিয়েই তিনি ভেংগে ফেলতে পারতেন; এ ছাড়া কোসিস্ মাথার ওপর কড়ি বাঁকাতে পারতেন। আর ৭ ইঞ্চি লম্বা এবং ½ ইঞ্চি চৌকোন্ একখানা ইস্পাতি শলাকে তিনি কোনাকুনি বেঁকিয়ে 'নাল' (Horse shoe) বানাতে পারতেন।

প্রথমত এই লোহাকে উরুর ওপর রেখে দু প্রান্তে দু হাতের চাপ

দিয়ে ধনুকাকৃতি করা হোত, তারপরেই তাকে দুই উরুর ফাঁকে এনে যুগপৎ দুই উরু ও দুই হাতের সমবেত চাপে ইংরেজি 'ইউ' (U) অক্ষরের কায়দায় বাঁকানো হোত। বাংলার স্বনাম প্রসিদ্ধ বলী দিগিন্দ্রচন্দ্র দেব ১৯৩৬ অব্দে আমাকে বলেছিলেন যে, কোসিসের এই শিকল ছেঁড়া বা লোহা বাঁকানোর কাজ কোনো ভারতীয়ের দ্বারাই সম্ভব নয়। দিগিনবাবু নিজেও বেশ কিছুদিন অভ্যাসের পরে ১১ ইঞ্চি লম্বা লোহাকে অতি কষ্টে খানিকটা মাত্র ধনুকের আকার করেছিলেন। এই লোহাখানা আমি নিজেও পরীক্ষা করেছিলাম। অতএব আমারও ধারণা হয়েছে যে, তদপেক্ষা অনেক ছোট অর্থাৎ ৭ ইঞ্চি লোহাকে বাঁকানোর মত জোয়ান লোক এদেশে নেই। কোসিসের হাতে ছেঁড়া সেই শিকলও দিগিনবাবুর কাছে আমি দেখেছি--সেগুলো খাঁটি ইস্পাতের ছিল। কিন্তু কড়িগুলো পরীক্ষা করবার সুযোগ আমার হয়নি।

ভুয়া খবর

১৯৩৬, মে মাসে 'কেশরী' বাংলা দৈনিকে একদিন অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস পরিবেশিত এই সংবাদ প্রকাশিত হয়—"সম্প্রতি বোম্বাইয়ে জার্মান কুস্তিগীরের সংগে মল্লযুদ্ধে জয়লাভ করায় নাসিকের শরীর-চর্চামোদিগণ মাধব রাও পালোয়ানকে অভিনন্দিত করে। মাধব রাও 'দাক্ষিণাত্যের গোংগা' নামেই সময়িক পরিচিত। মাধব রাও নাসিকের একজন অধিবাসী।" এই সংবাদে ক্রেমারের নাম উল্লেখ না থাকলেও বাংলা দেশের অনেকে এবং অন্যান্য জায়গার কেউ কেউ মনে করেছিলেন যে, ক্রেমার মাধব রাওর হাতে পরাজিত হয়েছেন।

কিন্তু সংবাদটি ছিল সর্বৈব মিথ্যা। কেননা, জিজা পালোয়ানের সংগে কুস্তির পর ২৫এ এপ্রিল ক্রেমার সোজা কলিকাতায় আসেন এবং ২২এ মে পর্যন্ত তিনি এখানেই ছিলেন।

শেষোক্ত দিনে তিনি কাবর্দা রাজ দরবারের মল্ল শামসুদ্দিনের সংগে লড়বার জন্য মুসৌরি যাত্রা করেন। ২৪এ মে তিনি মুসৌরি পৌছান। ৭ই জুন মুসৌরির হ্যাপি ভ্যালিতে শামসুদ্দিনের সংগে ক্রেমারের কুস্তি হয়; ৩০ মিনিট লড়বার পরে এই কুস্তি সমান হয়। পূর্বাপরই ক্রেমার তাঁর শান্ত স্বভাবের জন্য সকলের সহানুভূতি লাভ ক'রে আস্‌ছিলেন। এই দিনকার যুদ্ধেও তিনি প্রথমত সে অবস্থা রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু বয়সে তরুণ হলেও তাঁর চেয়ে অনেক বিশাল চেহারার শামসুদ্দিন কিছুতেই ক্রেমারকে আয়ত্তে আনতে না পেরে যখন তিনি অন্যায়ভাবে কিল-ঘুসি মারতে থাকেন, তখন ক্রেমারও পাল্টা মার সুরু করেছিলেন। ব্যাপারটা হয়তো গুরুতর আকার ধারণ করতে পারতো; কিন্তু এই লড়াইয়ে রামমূর্তি নাইডুর মতো বহুদর্শী ব্যায়ামী মধ্যস্থ ছিলেন ব'লেই তাঁর হস্তক্ষেপে দুই মল্ল নিয়ন্ত্রিত হন। মুসৌরি থেকে ১১ই জুন রওনা হয়ে ক্রেমার ১৩ই জুন ফের কলিকাতায় উপস্থিত হন এবং ১লা জুলাই পর্যন্ত কলিকাতায়ই অবস্থান করেছিলেন।

অতএব স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, ক্রেমার তখন পর্যন্ত নাসিক যান নি এবং অন্য কোনো কুস্তিও লড়েন নি। এই ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য এইজন্য যে, এর ভিত্তিহীনতা দিয়ে আমরা ১৮৯২ অব্দে কলিকাতায় করিম বখ্‌শ্‌ পেহেল্‌রিওয়ালার হাতে টম্‌ ক্যাননের কল্পিত পরাজয় বার্তাটিকেও বিচার করতে পারব। তখনকার দিনে গুজবের মূল্য অনেক বেশী

দেওয়া হোত এবং খাঁটি সাংবাদিকের অভাব হেতু ঐসব গুজবের ওপর ভিত্তি ক'রে এখনো পর্যন্ত অনেকে বিজ্ঞতা দেখিয়ে থাকেন।

ক্রেমারের ভাগ্য বিপর্যয়

ক্রমশ ক্রেমারের জনপ্রিয়তা বেড়ে যেতে থাকে এবং নূতন নূতন স্থর প্রস্তাবও আসতে থাকে। ১লা জুলাই গোবর বাবুর সংগে ক্রেমার ও কোসিস্ দ্বারবংগ রওনা হন। ৩রা জুলাই দ্বারবংগে মহারাজার প্রধান পালোয়ান পূরণ সিংয়ের সংগে ক্রেমারের এবং দ্বিতীয় পালোয়ান চাঁদ খাঁয়ের সংগে কোসিসের কুস্তি হয়।

এইদিন ক্রেমারের দৈহিক ওজন ছিল মাত্র ১৯০ পাউণ্ড, পূরণ সিং ছিলেন অনেক বেশী ভারী। কুস্তির সুরু থেকে ৪৩ মিনিট কাল ক্রেমার ও পূরণ প্রায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমান কুস্তি লড়েছিলেন। অবশ্য পূরণের টানা হ্যাঁচড়ায় একবার ক্রেমারের জাংঘিয়া ছিঁড়ে যায় এবং সেই সময় থেকে পূরণ তাঁর ল্যাংগট ধ'রে লড়তে থাকেন। ৪৩ মিনিটের মাথায় ক্রেমার ক্রমশ কোন্ঠাসা হয়ে ডান হাতে পিছনের খুঁটি ধরবার চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুদিন পূর্বে ক্রেমারের ডান হাতের বুড়ো আংগুলে গুরুতর চোট লেগেছিল এবং সেটি বাঁধা অবস্থায় ছিল। কুস্তি লড়্তে লড়্তে আংগুলের বাঁধনটি অনেকটা আল্‌গা হ'য়ে গিয়েছিল এবং খুঁটি ধরতে গিয়ে হঠাৎ সেই বাঁধনটি একেবারেই খুলে যায়। তাছাড়া, তিনি আংগুলেও বিষম চোট পান। এই অবস্থায় আংগুলটি পুনরায় বাঁধবার প্রয়োজন হয়। ক্রেমার আংগুল বাঁধবার জন্য তখন হাত-মুখ নেড়ে সময় চাইলেন ; কিন্তু ইংরেজী ভাষা না জানার ফলে তাঁর মুখ থেকে গোটা

কয়েক শব্দ মাত্র বেরিয়েছিল—"Stop, stop, pain, pain, finger pain, finger bind !"

এই প্রতিযোগিতার মধ্যস্থ ছিলেন স্বয়ং দ্বারবংগের কুমার বাহাদুর। তিনি মনে করলেন, ক্রেমার বুঝি কুস্তিতে অসমর্থ হ'য়ে আত্মসমর্পণ করছেন। অতএব ভ্রমবশত তিনি পূরণ সিংকে জয়ী ঘোষণা করলেন। ফলে, সমাগত দর্শকদের মতো পূরণও আনন্দে নৃত্য করে উঠ্‌লেন। বিস্মিত হ'য়ে ক্রেমার তখন জিজ্ঞাসা করলেন, "What, what matter ?" পরক্ষণেই ভুল ধরা পড়লে কুমার বাহাদুর ক্রেমারকে পুনরায় লড়বার সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু গোবর বাবু তখন কুস্তির আন্তর্জাতিক আইনের উল্লেখ করে ব'লেছিলেন, "ভুল হোক, আর যা-ই হোক, মধ্যস্থের সিদ্ধান্ত কখনো পরিবর্তিত হতে পারে না।" এইভাবে ক্রেমার পূরণের সংগে আর লড়াই করবার সুযোগ পেলেন না। কিন্তু এই অপ্রত্যাশিত দুর্গতির জন্য কুমার বাহাদুর জয়ীর প্রাপ্য টাকার একাংশ ক্রেমারকে দিয়েছিলেন, আর পরের দিন ক্রেমারকে চাঁদ খাঁয়ের সংগে কুস্তি লড়তে দিয়েছিলেন।

অসাধারণ মল্ল চাঁদ খাঁ

৩রা জুলাইর অপর কুস্তিতে চাঁদ খাঁ অতি সহজেই আর্নল্‌দ্‌ কোসিস্‌কে হারিয়েছিলন। সেই সময় চাঁদের ওজন ছিল মাত্র ১৬৫ পাউণ্ড, অথচ কোসিস্‌ ছিলেন ২৪০ পাউণ্ড ভারী। কুস্তিতে নেমে নমস্কারীর পরেই চাঁদ কোসিস্‌কে এমন 'দাঁও' মারলেন যে, কোসিস্‌ ছিট্‌কে দড়ির বাইরে পড়েছিলেন! কোসিস্‌ ফিরে এলে আবার তাঁদের কুস্তি সুরু হয়। দ্বিতীয় মিনিটে চাঁদ পুনরায় 'দাঁও' লাগালেন।

এইবার কোসিস্‌ সীমারেখার ওপর চিৎ হয়ে পড়বার উপক্রম হতেই তিনি 'মল্ল-সেতু' হলেন। চাঁদও সেই অবস্থায়ই তাঁকে আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু মধ্যস্থের আদেশে তিনি কোসিস্‌কে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন; কেননা, সীমারেখার ওপর কুস্তি বে-আইনী। আবার কুস্তি হোল এবং তৃতীয় মিনিটে আবার সেই 'দাঁও' প্যাচই পড়ল। কিন্তু এবার চাঁদ অনেকটা সতর্কতার সহিত 'দাঁও' মেরেছিলেন যাতে কোসিস্‌ দূরে ছিট্‌কে না পড়েন। 'সেতুরাজ' কোসিস্‌ কিন্তু এবারও যথারীতি 'মল্ল-সেতু' হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল এবং তৃতীয় মিনিট শেষ হবার পূর্বেই চাঁদের চাপে তাঁর পিঠ এবং কাঁধ মাটিতে লেপ্‌টে গেল!

কোসিস্‌ এই প্রথমবার বুঝতে পারলেন, ছোট গামা তো দূরের কথা, চাঁদ খাঁয়ের মতো একজন সাধারণ ভারতীয় পালোয়ানের কাছেও ইওরোপীয় 'সেতু' কাজের হয় না। এই দিন প্রথম দুইবার ক্ষেত্রের বাইরে শক্ত মাটিতে সেতু হবার ফলে কোসিসের মাথার চামড়া কেটে বিস্তর রক্তপাত হয়েছিল এবং এতো সংক্ষিপ্ত কুস্তির শেষেও তাঁকে যথেষ্ট ক্লান্ত ও দুর্বল মনে হয়েছিল।

৪ঠা জুলাই ক্রেমারের সংগে কুস্তির সময়ও চাঁদ গোড়া থেকেই বিপুল বিক্রমে আক্রমণ সুরু করেন। ক্রেমার অতি কষ্টে আত্মরক্ষা করতে থাকেন। এই রকমভাবে ২৫ মিনিট কাটবার পর চাঁদের আক্রমণ আরো তীব্র, আরো ভীষণ হয়ে দাঁড়ালো। বিক্ষুব্ধ ঝড়ের বেগে তিনি বার বার ক্রেমারের ওপর পড়তে লাগলেন এবং এই আক্রমণের ফলে ক্রেমারের নাক, মুখ, কান ফেটে রক্তধারা ছুটল। ৪৩ মিনিটের মাথায় ক্রেমার বাস্তবিকই বে-দম ও হতাশ হ'য়ে পড়লেন—আর যেনো তাঁর সময় কাটছিল না! অবশেষে যখন তাঁর প্রকৃত বিপদ

ঘনিয়ে এল, ভাগ্যক্রমে সেই সময়ে ৪৫ মিনিটের বাঁশী তাঁকে বাঁচিয়ে দিল।

বাস্তবিক, পূর্ব থেকে ৪৫ মিনিট কুস্তি হবার কথা ঘোষণা না থাকলে কিংবা আরো কয়েক মিনিট কুস্তি চললে সেদিন ক্রেমারের পরাজয় রক্ষা পেত কিনা সন্দেহ। দৈহিক ওজনের বিচার করলে চাঁদ খাঁকে ক্রেমারের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর মল্ল বলতে হবে। কেননা, ক্রেমারের চেয়ে চাঁদের ওজন অন্তত ২৫ পাউণ্ড কম ছিল। ভারতবর্ষে এসে অবধি ক্রেমারকে এরূপ তীব্র শক্তির পরীক্ষা আর দিতে হয়নি; এবং এইদিনই ক্রেমার প্রথম বুঝেছিলেন্, কুস্তিতে ভারতবর্ষ জয় করা তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব!

জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ব পঞ্জাবের আম্বালায় আর একটি কুস্তি প্রতিযোগিতা হয়। সোলোনের দুর্গা-মন্দিরের উৎসব উপলক্ষে বাঘাটের মহারাজা একটি আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই আমোদ-প্রমোদের মধ্যে অন্যতম আকর্ষণ ছিল আন্তর্জাতিক কুস্তি-প্রতিযোগিতা। এই লড়াই হয়েছিল প্রসিদ্ধ পাঞ্জাবী মল্ল জিজা খৈওয়ালা এবং অ্যামেরিকান্ কুস্তিগীর হাড্সনের মধ্যে।

কুস্তির পূর্বে এবং সুরুতে হাড্সনের বাক্যচ্ছটা এবং নানা ধরণের অংগ ভংগী দেখে দর্শকদের মধ্যে বহু লোকের ধারণা হয়েছিল, সাহেবই জিতবেন। কিন্তু দেড় মিনিট কুস্তির পরে দেখা গেল জিজা 'ঢাক' মেরে সাহেবকে নীচে ফেলেছেন, আর সাহেব প্রাণপণ চেষ্টায় হাত-পা ছুঁড়ছেন। এইভাবে কয়েক সেকেণ্ড পার হ'লে ১ মিনিট ৫০ সেকেণ্ডে জিজা হাড্সন্কে মাটির সংগে সটান চিৎ ক'রে দিয়েছিলেন। মহারাজা সন্তুষ্ট হয়ে জিজাকে কিছু টাকা এবং একটি রৌপ্যাধার উপহার প্রদান করেছিলেন।

ইওনেস্কোর ধাপ্পা

৭ই অগাস্ট লাহোরে 'সিভিল্ অ্যাণ্ড মিলিটারি গেজেটের' জনৈক প্রতিনিধির কাছে রোমেনিয় বলী জর্জ ইওনেস্কো এক দাম্ভিক বিবৃতি দিয়ে বলেন যে, তিনি গামার সংগে কুস্তি লড়বার জন্য লাহোরে গেছেন। এই সংবাদটি লাহোর থেকে ৮ই অগাস্ট প্রচারিত হয় এবং ১০ই অগাস্ট 'আনন্দবাজার পত্রিকা,' 'অ্যাড্ভান্স,' ১৭ই অগাস্ট 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ইত্যাদিতে প্রকাশিত হয়।

ইওনেস্কোর চাল-চলনের সহিত প্রথম থেকেই আমার পরিচয় ছিল। তাই, গামার সংগে লড়বার জন্য তিনি লাহোরে গেছেন,—এই সংবাদটিকে আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারি নি। কেননা, এর অল্প কাল আগে ২০এ মে তারিখে ইওনেস্কো কলিকাতায় কথাপ্রসংগে আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি কুস্তি ছেড়ে দিয়েছেন, এবং এখন তিনি শুধু 'শক্তির কাজ' (Feats of strength) দেখিয়ে থাকেন। তার পর ৫ই জুন এম্পায়ার থিয়েটারে মার্টিন সাহেবের ব্যবস্থাপনায় যে মুষ্টিযুদ্ধ ও শক্তির প্রদর্শনী হয়, তার প্রচার-পুস্তিকায় ইওনেস্কোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছিল। সেই পরিচয় প্রসংগেও উল্লেখ করা হয়েছিল—"His prodigious strength attracted the attention of the best physical culturists of the Continent and in the end he was prevailed upon to forsake the 'grappling' game in favour of exhibitions of his wonderful physical powers." বলা বাহুল্য, বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ ইওনেস্কো ১০ই জুন আট আনা দামের এই ছোট্ট বইখানি

আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। অতএব যে ব্যক্তি কুস্তি ছেড়ে দিয়ে শক্তির কাজ দেখানোকেই পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছেন, তিনি কুস্তি লড়তে যাবেন রামা-শ্যামার সংগে নয়, সব ডিংগিয়ে একেবারে গামার সংগে—যিনি এক সময়ে সদলবলে ইওরোপে গিয়ে সারা শ্বেতাংগ সমাজকে কম্পমান ক'রে এসেছিলেন? —এ কেমন কথা! এমন সময় দেখলাম গোবরবাবু অধৈর্য হয়ে ১৯এ অগাস্ট 'অমৃতবাজারে' লিখেছেন,— "This will show that we are desperately in need of a Central Wrestling Association which can put a stop to such meaningless challenge of foreign and Indian wrestlers." বলাই বাহুল্য, গোবর বাবুর এই প্রতিবাদ অত্যন্ত সময়োচিত হয়েছিল।

এই শব্দসার ও আত্মপ্রচারী ইওনেস্কো ১৯০০, ৫ই ফেব্রুয়ারি তখনকার ইংগারিতে জন্ম গ্রহণ করেন; এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে তিনিও কোসিসের মতো রোমেনিয়ার অধিবাসী হ'য়ে যান। ছোট বেলা থেকে তাঁর স্বাস্থ্য ভাল ছিল এবং দেহেও শক্তি ছিল। প্রথম জীবনে সাধারণভাবে ব্যায়াম সুরু করলেও ১৮ বছর বয়সে তিনি ফ্রান্সের সুপ্রসিদ্ধ মল্ল পল্ পন্সের কাছে কুস্তি শিক্ষা আরম্ভ করেন। এর তিন-চার বছর পর থেকে তিনি ইওরোপের বিভিন্ন মল্লের সংগে শক্তি পরীক্ষায় নামতে থাকেন। ইওনেস্কোর নিজের কথায়—'তিনি ইওরোপের ৩০০০ পেশাদার মল্লের সংগে ল'ড়ে অন্তত ২০০০ মল্লকে হারিয়েছিলেন—বাকীগুলোর সংগে সমান ছিলেন; এবং একটি কুস্তিতেও হারেন নি।' তাঁর এই উক্তির সত্যতা সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই।

ইওনেস্কোর ভারত-ভুমিকা

জর্জ ইওনেস্কো ১৯২৮ অব্দে প্রথম ভারতবর্ষে আসেন; তারপরেও তিনি একাধিকবার এসেছিলেন। কিন্তু ১৯৩৪, অক্টোবর মাসে যেবার আসেন, সেবার দীর্ঘকাল এদেশে অতিবাহিত করেন। কলিকাতায় তিনি একবার আমাকে বন্ধুভাবে গোটা কয়েক চুটকি শক্তির কাজ দেখিয়েছিলেন; তাতে মনে হয়েছিল, দৈহিক শক্তি তাঁর যথেষ্ট ছিল এবং এবিষয়ে বাংলাদেশে তখন তাঁর জোড়া বিশেষ কেউ ছিল না। কোসিসের মতো তিনিও ৭ইঞ্চি চৌকোন লোহাকে কোণাকোণি ভাবে বাঁকাতে পারতেন এবং ইস্পাতের শিকল ছিঁড়তে পারতেন।

ইওনেস্কো এদেশে যার-তার কাছে প্রচার করতেন যে, এইসব শক্তির কাজ দেখে সারা ইওরোপ তাঁকে 'আয়রন ম্যান' খেতাব দিয়েছিল। এর পরে চেকোস্লোভাকিয়ার বলী এমার করসেংকোও এদেশে নিজেকে 'অ্যায়রন ম্যান' ব'লে পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু এই নামে সারা ইওরোপ ও অ্যামেরিকায় যাঁর খ্যাতি ছিল, তিনি ছিলেন পূর্ব প্রুশিয়ার সাগ্‌মুণ্ড ব্রেইট্‌বার্ট। অবশ্য ইদানিং কালে অনেক বাজে লোক এইসব রকমারি খেতাব নিয়ে থাকেন এবং একমাত্র বাংলা দেশেই গণ্ডা খানেক 'আয়রণ ম্যান' ও 'স্টীল্ ম্যান' আত্মপ্রকাশ করেছেন, এবং হয়তো পরে পরে আরো অনেকে উদিত হবেন। কিন্তু মজা এই যে, ইওরোপীয় শক্তি ক্ষেত্রে অপাংক্তেয় হয়ে যখন ইওনেস্কো ও কোসিস্ এদেশে এসে দম্ভ প্রকাশ করেছিলেন এবং ১৯৩৬, ২৮এ মে তাঁদের প্রচার-পত্র 'স্টেট্‌স্‌ম্যানে'র মারফৎ আর একবার বাংলার বলীদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন যে, আগামী ৫ই জুন এম্পায়ার

থিয়েটারে তাঁদের প্রদর্শিত শক্তির কাজগুলো কেউ দেখাতে পারলে তাঁকে বা তাঁদেরকে তাঁরা একটা 'চমৎকার উপহার' দেবেন, তখন বাংলার সেই 'আয়রন ম্যান' কম্পেনির কোনো পাত্তা পাওয়া যায়নি। কারণ, হাজার হলেও ইওনেস্কো বা কোসিস্ নিশ্চয়ই মেয়ে-মহলের বলী ছিলেন না।

এই প্রসংগে একজন সাহসী বীর বাঙালীর নাম উল্লেখযোগ্য, তিনি আশুতোষ কলেজের ব্যায়াম-শিক্ষক সরসীকুমার গাংগুলী। দাঁতে কাম্‌ড়ে ভার তোলায় তিনি আজো পর্যন্ত ভারতবর্ষে অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং সেই সময়ে তিনি নির্বিবাদে ৪০০ পাউণ্ড তুল্‌ছিলেন। ইওনেস্কো বা কোসিস্ কেউ দাঁতের এরূপ ক্ষমতা দেখাতে পারতেন না। সাধারণত এক একজন বলীর এক একটি বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা থাকে। ইওনেস্কো ও কোসিস তাঁদের ক্ষেত্রে বাংলা দেশে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। অতএব সরসী বাবুও পাণ্টা সর্তাধীনে ইওনেস্কো ও কোসিসের আহ্বান গ্রহণ ক'রে 'স্টেট্‌স্‌ম্যান্' কাগজে পত্র দিয়েছিলেন—কিন্তু ফিরিংগী পত্রিকা সরসীবাবুর সেই চিঠি ছাপেনি, যদিও 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ঠিক খেলার দিনে অর্থাৎ ৫ই জুন সেই পত্রের নকল ছেপেছিল। এদিকে সরসীবাবুর পত্র পেয়েও ইওনেস্কো ও কোসিস্ কোনো উত্তর না দেওয়ায় সরসীবাবু রংগমঞ্চে উপস্থিত হন নি। ফলত সেদিন রংগমঞ্চে দাঁড়িয়ে কোসিস্—"কোথায় মিঃ গাংগুলী, মিঃ গাংগুলী কোথায়? এগিয়ে এসো"—ব'লে উচ্চৈঃস্বরে ডাকাডাকি করেছিলেন; এবং দর্শকদের বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, ভয় পেয়েই মিঃ গাংগুলী আসছেন না। আরো দুঃখের বিষয় যে, ৯ই জুন কোসিসের আর এক প্রস্ত দাম্ভিক বিবৃতি 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় ছাপা হয়ে যায়। একথা বলাই বাহুল্য যে, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত না হ'লে পুস্তক-পত্রিকার মাধ্যমে এমনিভাবে কারু কারু অমর্যাদা

ঘটা স্বাভাবিক। তবু, অন্তত শক্তি ক্ষেত্রের একটি বিষয়ে তখন বাংলা দেশের সান্ত্বনা ছিল এবং তা ছিল দাঁতের জোরে ভার তোলা যায় বলে সরসীবাবু ইওনোস্কো ও কোসিসের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস করেছিলেন; অথচ তিনি কোনোদিন খেতাবের পুচ্ছ পরিধান ক'রে লোক হাসান নি।

ইওনেস্কোর মাপ

'সিভিল অ্যাণ্ড মিলিটারি গেজেটের' পূর্বোক্ত প্রতিনিধি ইওনেস্কো সম্বন্ধে আরো কতকগুলো ভুল সংবাদ পরিবেশন করেছিলেন। তাঁর সংবাদে ছিল, ইওনেস্কো ১৯৩২ অব্দে লস্ এঞ্জেলেস্ সহরে বিশ্ব অলিম্পিক কুস্তিতে বুলগারিয়ার ডেমিট্রি মার্টিনফ্‌কে পরাজিত করে 'বিশ্ব অলিম্পিক কুস্তি-প্রাধান্য' লাভ করেছিলেন। সংবাদে বলা হয়েছিল, রাশিয়ার ইভান্ জাইকিন তখন পৃথিবীর 'সর্বজয়ী মল্ল' ছিলেন। সংবাদে ইওনেস্কোর দৈহিক উচ্চতা দেওয়া হয়েছিল '৭৪¾ ইঞ্চি'। বলা বাহুল্য, এই সবগুলি কথাই ভুল এবং আজগুবি। আসলে শক্তি-জগৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ একজন আনাড়ী এবং অজ্ঞ লোকের কাছে ইওনেস্কো যা-খুসী তাই বলেছিলেন; প্রতিনিধি বন্ধুটিও বিনা দ্বিধায় তার সবই ছেপে দিয়েছিলেন।

ইওনেস্কো ইতিপূর্বে আমার কাছেও ঐ ধরণের কিছু কিছু উক্তি করেছিলেন। তাছাড়া ক্রেমারের ওপর তাঁর একটা দারুণ হিংসা ছিল ব'লে তিনি আমার কাছেও বলেছিলেন যে, ক্রেমার অলিম্পিক কুস্তি লড়া দূরে থাক, কোনোদিন অ্যামেরিকায়ও যাননি। কিন্তু আমার সব চেয়ে বেশী আশ্চর্য মনে হতো, যখন তিনি ভারতীয় কুস্তির বৈশিষ্ট্য ও স্থান সম্পর্কে বহু কথা শোনবার পরেও নির্বিচারে ভারতীয় ডন-বৈঠক ও কুস্তির বিষয়ে অনর্গল নিন্দা করতেন। তাতে আমার

মনে হয়েছিল, লোকটা শুধু হিংসুটে ও মিথ্যাবাদী নন, মূর্খ এবং লজ্জাহীনও বটে।

তিনি বুঝতে পারতেন না, সকলের কাছেই শক্তির ধাপ্পা দেওয়া চলে না। প্রসংগক্রমে ক্রেমারের কথা বলি।

১৯৩৬, মে মাসে কলিকাতায় রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের বাড়ীতে যখন তিনি কুস্তির মহড়া দিতেন, তখন একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন যে, তিনি ২৯০ পাউণ্ড 'দুহাতি ক্লীন ও জ্যর্ক' করতে পারেন। কথাটা আমার মোটেই বিশ্বাস হোল না। কাছেই একটা ১৬০ পাউণ্ড ডিস্ক্ বার-বেল পড়েছিল। আমি তখন তাঁকে সেই বারবেলটা দুহাতে 'প্রেস' করতে বললাম। প্রথমটা অনিচ্ছা প্রকাশ ক'রেও শেষে প্রেস করতে গেলেন। কিন্তু পারলেন না। ক্রেমার তাঁর মেরুদণ্ড দেখিয়ে বললেন যে, ওটা সুস্থ ও স্বাভাবিক নেই; তাছাড়া কিছুদিন থেকে বারবেল তোলার অভ্যাসও তাঁর নেই। কিন্তু অবস্থা যা-ই হোক না কেন, একজন অতি আনাড়ী লোকও দুহাতি ক্লীন ও জ্যর্কে যে ভার তুলতে পারে, দুহাতি প্রেসে তার দুই তৃতীয়াংশ তুলবেই; নিপুণ ব্যক্তিরা আবার তিন চতুর্থাংশ বা তার বেশীও তুলতে সমর্থ। সেই হিসাবে ২৯০ পাউণ্ড ক্লীন ও জ্যর্ক ক'রে থাকলে ক্রেমারের তো ২০০ পাউণ্ড অবলীলাক্রমে প্রেস করা উচিত ছিল। ক্রেমার ভারোত্তোলক ছিলেন না, এবং একজন খাঁটি মল্লের পক্ষে ভারোত্তোলনের বৈজ্ঞানিক কৌশল না জানাটা অগৌরবের কিছু নয়। কিন্তু কথায় কথায় তিনি নিজের শক্তি সম্পর্কে হঠাৎ একটা অতিরঞ্জিত বা বাড়তি কথা ব'লে ফেলেছিলেন মাত্র। তিনি ভাবতে পারেন নি যে, আমি তখুনি কথাটাকে যাচাই করে ফেলতে পারি। অনভ্যাসের কথা উঠতেই পারে না; কেননা, দীর্ঘ চার বছর অনভ্যাসের পরে এবং বিশেষ ধরনের শারীরিক অসুস্থতা বশত আমার

দৈহিক ওজন তখন ৮ ষ্টোনের নীচে নামা সত্ত্বেও ঐদিন প্রথম বারেই আমি নিজেও ও-ভারটাকে ক্লীন ও জ্যর্ক করেছিলাম।

'সিভিল অ্যাণ্ড মিলিটারি গেজেটের' প্রতিনিধি ইচ্ছা করলেই কিন্তু ইওনেস্কোর দৈহিক উচ্চতাটা পরখ করতে পারতেন। ইওনেস্কোকে চোখে দেখেও কি উচ্চতার অসম্ভাব্যতা সম্বন্ধে তাঁর মনে সন্দেহ জাগল না? অতএব সকল সংশয় দূর করবার জন্য আমি এখানে ইওনেস্কো ও কোসিসের মাপ দুইটি উল্লেখ করছি। ১৯৩৬, ১০ই জুন কলিকাতার ১১৪-ডি, রিপন স্ট্রীটে তাঁদের বাসস্থানে গিয়ে আমি নিজে তাঁদের এই মাপ নিয়েছিলাম:—

	ইওনেস্কো	কোসিস্
ওজন	২৬০ পাউণ্ড	২৪০ পাউণ্ড
দৈর্ঘ	৬৮½ ইঞ্চি	৬৯ ইঞ্চি
গলা	১৯½ ,,	১৮½ ,,
বাহু (স্বাভাবিক)	১৬ ,,	১৪½ ,,
গোছা (,,)	১৩ ,,	১৩¼ ,,
কব্জি	৮¾ ,,	৮¼ ,,
বুক (স্বাভাবিক)	৫০¼ ,,	৪৭ ,,
বুক (প্রসারিত)	৫৪ ,,	৫৯ ,,
কটি	৪৭ ,,	৪২ ,,
উরু	২৫ ,,	২৬½ ,,
হাঁটু	১৬½ ,,	১৬½ ,,
মোচা (স্বাভাবিক)	১৬ ,,	১৫⅞ ,,
মোচা (সংকুচিত)	১৭½ ,,	১৬¾ ,,
নলি	৯½ ,,	৯⅞ ,,

ইওনেস্কোর বুকের তুলনায় উদর অতি বিরাট এবং সেই তুলনায় উরু অত্যন্ত কৃশ; এক পাশ থেকে তাঁর দিকে তাকালে কণ্ঠ থেকে হাঁটু পর্যন্ত তাঁর দেহের সম্মুখভাগকে একটি অর্ধবৃত্তাকার পিণ্ডের মতো দেখায়! এই হিসাবে তাঁর দেহ কুদর্শন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁর গ্রীবাদেশটি দেখবার মতো। 'বৃষস্কন্ধ' শব্দটাকে যাঁরা শুধুই কাগজপত্রে পড়েছেন, অথচ মানুষের ক্ষেত্রে একথাটাকে কাল্পনিক বা অতিরঞ্জিত মনে করেন, তাঁরা ইওনেস্কোকে দেখলে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে পারতেন। আজ পর্যন্ত আমি তো অসংখ্য বলী ও মল্ল দেখেছি, কিন্তু ইওনেস্কোর মতো এমন অদ্ভুত গ্রীবা আর দেখিনি। ঘাড়ের ঠিক পিছনেই উঁচু, বিশাল, অথচ দৃঢ় একটি টিলা-পেশী তাঁর ঘাড়ের এই বৈশিষ্ট্য বাড়িয়েছিল। ১৯½ ইঞ্চি গ্রীবা এমনিতেই অসাধারণ; তদুপরি ইওনেস্কো শ্বাসরুদ্ধ ক'রে তাকেও ২৩ ইঞ্চি করতে পারতেন। একটা অসাধারণ কাজ বটে! কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ইওনেস্কোর ফটোতে এই 'বৃষকন্ধ' দেখা যায় না; তার কারণ অধিকাংশ ফটো তাঁর সামনের দিক থেকে তোলা এবং অতিরিক্ত অংশ সযত্নে 'রিটাচ্চ' করে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তি-গত আলাপের সময় বুঝেছিলাম, তিনি তাঁর ঘাড়ের ঐ অবস্থাটিকে পছন্দ করেন না। আমি তাঁর এই মানসিক দুর্বলতার হেতু বুঝতে পারিনি।

ইওনেস্কো লাহোরে গামার সংগে লড়বার কথা ঘোষণা করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর মতো একজন নগণ্য ব্যক্তির সংগে লড়বার সর্ত গামা যা দিয়েছিলেন, তাতে এই শ্বেতাংগের মুখ এতটুকু হয়ে গিয়েছিল! গামা কুস্তিতে হারুন বা জিতুন, তাঁকে অগ্রিম এক লক্ষ টাকা দিতে হবে, এই ছিল তাঁর প্রধান সর্ত। আর ইমাম বখ্শের সংগে পাতিয়ালায় লড়তে হ'লে তাঁকে দিতে হবে কুড়ি হাজার, আর বাইরে লড়তে হলে দিতে হবে পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং এতেও জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন থাকবে না।

ধৃষ্টতার উপহার স্বরূপ এই জবাব নিয়ে অবশেষে এই রোমেনীয় বন্ধুকে লাহোর ছেড়ে আসতে হয়েছিল!

ক্রেমার ও তাঁর প্রচার

১৯৩৬, জুলাই মাসে ক্রেমার আবার কলিকাতার বাইরে যান। বম্বেতে তাঁর সংগে দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ পালোয়ান মালাপ্পা তারাকির কুস্তি হয়। ৪০ মিনিট কাল এই কুস্তিতে দুজন সমান ছিলেন।

অক্টোবর মাসে কাল্‌গাপুরে তাঁর সংগে গোদা সিং পালোয়ানের লড়াই হয়। বাহুতে বিষম আঘাত লাগায় ক্রেমার প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হয়ে পরাজয় স্বীকার করেছিলেন। এই কুস্তি দেখবার জন্য সেদিন ২০০০ লোক উপস্থিত হয়েছিল। আহত হবার পরে তাঁকে ষ্টেচারে করে হাসপাতালে পাঠাতে হয়; প্রথম মনে হয়েছিল তাঁর বাহুর হাড় বুঝি ভেংগে গিয়েছে; কিন্তু এক্স-রে পরীক্ষায় দেখা যায়, শুধু বাহুর পেশীই জখম হয়েছিল।

ক্রেমারের একটা অভ্যাস ছিল যে, কুস্তি লড়তে লড়তে নীচে এসে গেলে অন্যান্য পালোয়ানের মতো তিনি দুই হাঁটু ও কনুই মুড়ে উপুর অবস্থায় আত্মরক্ষা করতেন না। নীচে আসবার সংগে সংগে তিনি দুই হাঁটু মাটিতে ঠেকিয়ে বসে পড়তেন এবং দুই হাতের করতল মাটিতে রেখে প্রতিদ্বন্দ্বীর আক্রমণ ঠেকাতে চেষ্টা করতেন; সেই সময় তিনি কনুই মুড়তেন না এবং দুটি হাতকেই সোজা ও শক্ত অবস্থায় রাখতেন। কুস্তি-বিজ্ঞানীরা জানেন, এটি মারাত্মক অবস্থা, অর্থাৎ উপরিস্থ প্রতিপক্ষ তখন ওপর থেকে অনুকূল অবস্থার সুযোগে যে-কোনো বাহুকে অকস্মাৎ

এমন আঘাত দিতে পারেন যে, নীচের পালোয়ানের সেই হাত তাতে ভেংগে যেতে পারে।

রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের বাড়ীতে ক্রেমারের কুস্তি অভ্যাস কালে আমি বহুদিন উপস্থিত ছিলাম। আমি তখন তাঁকে এই কথাগুলি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি একথাব যৌক্তিকতা স্বীকারও করেছিলেন। কিন্তু দীর্ঘকালের অভ্যাস বশত তাঁর এ বিষয়ে প্রায়ই ভুল ঘটত এবং অভ্যাসমতো মধ্যে মধ্যে প্রথম নিয়মেই আত্মরক্ষা করতেন। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী বন্ধুর কাছে আমি শুনেছিলাম যে, কোল্হাপুরে গোদা সিংয়ের বিরুদ্ধে লড়বার সময়ে তিনি ও-রকম 'ব্যাং'য়ের মতোই নীচে বসেছিলেন। আর সেই মুহূর্তেই গোদা সিং পিঠের ওপর থেকে হঠাৎ ক্রেমারের হাতের ওপর নিজের পা চালিয়ে দিয়ে তাঁকে উল্টে ফেলে দিয়েছিলেন! সেই আঘাত এমনি মারাত্মক হয়েছিল যে, এ-হেন কষ্ট সহিষ্ণু ক্রেমারও তাতে চীৎকার ক'রে উঠেছিলেন!

ক্রেমার ভারতবর্ষে এসে প্রথমেই ভাগ্যবলে গোংগা পালোয়ানকে 'বিপাকে' পরাজিত করায় যে দু চারজন বাঙালী উল্লসিত হয়ে খবরের কাগজে বেয়াকুবের মতো গুণগান করেছিল এবং গোবর বাবুর মতো দিগ্বিজয়ী মল্লকেও বিদ্রূপ-কটাক্ষ করতে দ্বিধা বোধ করেনি, ক্রেমারের পরবর্তী কীর্তিগুলি তাদের ততোধিক নিরুৎসাহ করেছিল। আসল কথা এই যে, অল্প প্রয়াসে ক্রেমারের সাহচর্য লাভ করায় নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই এরা তাঁর কাছে কালো চামড়ার কাঙালপনা দেখিয়েছিল; শ্বেতাংগ ক্রেমারকে তোয়াজ তারই অনিবার্য পরিণাম।

অক্টোবর মাসের শেষ ভাগে এলাহাবাদে একটি বড়ো কুস্তির দংগল সুরু হয় এবং ৯ই নভেম্বর তা শেষ হয়।

৮ই নভেম্বর আর্ণলদ্ কোসিসের সংগে লাহোরের মোহাম্মদ শফির কুস্তি হয়। শফির পূর্ব ব্যবসা ছিল মিস্ত্রীর। কিছুকাল পূর্বে তিনি পেশাদার মল্ল হিসাবে নানা জায়গায় কুস্তি লড়লেও সুনাম অর্জন করতে পারেননি। এজন্য অনেকেই ভাবতে পারেননি, কোসিসের বিরুদ্ধে তিনি বিশেষ কিছু করতে পারবেন। কিন্তু ফল হোল সম্পূর্ণ উল্টো। লড়াইটি ৩০ মিনিট চল্‌বে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং পরাজিত করবার ক্ষেত্রে পিঠ ২ সেকেণ্ড কাল মাটিতে ঠেকিয়ে রাখতে হবে বলেও ঘোষণা করা হয়েছিল।

কুস্তি সুরু হবার ২০ সেকেণ্ড পরে শফি 'কাঁচি' দিয়ে কোসিসকে মাটিতে ফেলেন। কোসিস্ প্রথমটা উপুর হয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে থাকেন; কিন্তু ক্রমশই তাঁকে কাবু হতে দেখা গেল। বার কয়েক তিনি চিৎ হবার উপক্রম হলেন; তবে 'মল্ল-সেতু'র জোরে তা থেকে সারলেন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ৭ মিনিটে শফি তাঁকে পূরোপূরি চিৎ করতে সমর্থ হন। শফির এই আশাতীত সাফল্যে সকলেই আনন্দিত হলেন এবং কিছু সংখ্যক উৎসাহী শফির উদ্দেশে মল্ল-ক্ষেত্রের ওপর মুদ্রা ছুঁড়ে ছুঁড়ে মেরেছিলেন।

দংগলের শেষ দিনে অর্থাৎ ৯ই নভেম্বর ক্রেমারের সংগে জলন্ধরের সর্দার খাঁয়ের কুস্তি হয়। এ কুস্তিটি ভারতীয় প্রথায় হবার কথা ছিল; কিন্তু প্রতিযোগিতার প্রধান বিচারক শচীন্দ্র মজুমদারের লেখায় দেখেছিলাম যে, সে কথা ঘোষণা করতে তাঁদের 'ভুল' হয়েছিল। এই প্রতিযোগিতায় তাঁর সহযোগী বিচারক ছিলেন দংগলের কর্তা এক স্কচ্ ভদ্রলোক। কুস্তি ৩০ মিনিট চলবার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল।

সেলামীর পরে দুজন মল্লই পিছিয়ে যান এবং দুজনই পর্যায়ক্রমে প্রতিপক্ষকে আয়ত্তে আনবার জন্য চতুরতার আশ্রয় নেন। প্রথম সর্দার

খাঁ পিছন ঘুরে ক্রেমারকে আক্রমণের জন্য প্রলুব্ধ করবার প্রয়াস পান। এরপরে পাল্টা ক্রেমারও দুহাত শূন্যে তুলে সর্দারকে আক্রমণের জন্য প্রলুব্ধ করেন। প্রথমবার প্রলুব্ধ না হলেও দ্বিতীয়বার সর্দার ক্রেমারকে আক্রমণ করেছিলেন। এই রকম শূন্যে হাত তুলে ঈষৎ উবু হয়ে প্রতিপক্ষকে ধোকা দেওয়া ক্রেমারের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। সর্দার খাঁ এই ধোকার কবলিত হয়ে ক্রেমারকে আক্রমণ করতেই ক্রেমার চোখের পলকে সর্দারের দুই বাহু ধরে 'ফ্রন্ট ফ্লাইং হোল্ড্' কিংবা 'ডাব্‌ল্ আর্ম লক' প্রয়োগ করেন। এর ফলে সর্দার সামনের দিকে ছিটকে পড়ে যান এবং মাত্র মুহূর্ত কালের জন্য তাঁর কাঁধ মাটি স্পর্শ করে। তৎক্ষণাৎ ক্রেমার চীৎকার ক'রে নিজেই নিজের জয় ঘোষণা করেন এবং সেই চীৎকারে বিভ্রান্ত হয়ে হোক, কিংবা অন্য যে-কারণেই হোক, প্রধান বিচারকও ক্রেমারকে জয়ী ঘোষণা করেন। সংগে সংগে "দশহাজার কণ্ঠ আপত্তি করে উঠল যে কুস্তি শেষ হয়নি। ক্রেমার তখন আখড়া থেকে নীচে নেমে এসে ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে বসেছেন। সে কি দারুণ গণ্ডগোল!"

বস্তুত, এটি আন্তর্জাতিক বিধান অনুসারে সংগত কুস্তি হয়নি। প্রথমত, বিচারকদের ঘোষণার ভুল। দ্বিতীয়ত, সাধারণ নিয়মানুযায়ী কারু উভয় স্কন্ধ বা পিঠ কমপক্ষে ৩ সেকেণ্ড ভূমি-সংলগ্ন রাখতে হয়; এর ব্যতিক্রম করতে হলে তা আগে থেকেই ঘোষণা করতে হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এ ক্ষেত্রে তার কিছুই করা হয়নি এবং প্রধান বিচারক শচীনবাবু নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে, সর্দারের কাঁধ 'মাত্র অর্ধ সেকেণ্ডের জন্য' ভূমি স্পর্শ করেছিল! অতএব এতে তাঁর বিচার বিভ্রান্তি ঘটেছিল নিশ্চয়। সাধারণত নিয়ম হওয়া উচিত, কোনো প্রতিযোগিতায় সেই বিষয়েরই অভিজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যস্থ বা বিচারক নিযুক্ত

হওয়া। কিন্তু আমাদের দেশে এই নিয়ম বহু সময়েই উপেক্ষিত হয়। শচীনবাবুর নিজের কথায়ই জানি, তিনি কোনো দিন কুস্তি লড়েন নি,—এ বিষয়ে তাঁর বাবার মানা ছিল। তবে, কুস্তি সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান কি পরিমাণ ছিল, তা অবশ্য আমার জানা নেই।

ক্রেমার ও সর্দার খাঁয়ের এই কুস্তিতে বিচার বিভ্রাট না ঘটলে কুস্তির ফলাফল কি দাঁড়াত, বলা কঠিন। অবশ্য কয়েক দিন পরে, ২২এ নভেম্বর 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' শচীনবাবু তাঁর রায়ের সমর্থনে লিখেছিলেন, Sardar was beaten by a better man; greater speed and a quick mind were the causes of Sardar's short stay of three minutes in the ring that evening. It must of course be said that although Kraemer had to share the dust of the ring with Sardar Khan, the latter was not an equal apponent of the German." কিন্তু এই ধারণাগত বা আনুমানিক কথা ব্যবহারিক কুস্তির পরীক্ষায় নিতান্তই মূল্যহীন হতে পারে; অতএব তা আত্মপক্ষ সমর্থনের দুর্বল প্রয়াস মাত্র। কার্যত সেদিন দর্শকরা ক্ষিপ্ত হয়ে এমন বিশৃংখল অবস্থার সৃষ্টি করেছিল যে, সহযোগী স্কচ্ বিচারক ভদ্রলোক সহায়তা না করলে তাদের হাত থেকে শচীনবাবুর নিস্তার পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ত।

বাস্তবিক পক্ষে, এলাহাবাদের এই দংগলের দু একটি বিষয় আজো পর্যন্ত আমার কাছে দুর্বোধ্য রয়ে গেছে!

প্রথমে ধরা যাক, কোসিস ও শফির কুস্তি। শচীনবাবু লিখেছিলেন, "এ কুস্তিটা হয়েছিল ইওরোপীয় ধরনে অর্থাৎ কোসিসের ব্রিজ্ করবার অধিকার ছিল, কিছু ভারতীয় দাঁও-প্যাঁচ প্রয়োগ করা শফির পক্ষে নিষেধ ছিল ও বিজিত ব্যক্তির পিঠ পুরো দু সেকেণ্ড মাটিতে লিপ্ত হলে

তবে ফল নির্ণয় হবে—এই ব্যবস্থা ছিল।" কিন্তু জনপ্রিয় ইওরোপীয় কুস্তি কখনো একবারের লড়াইতে মীমাংসিত হয় না। অথচ এক্ষেত্রে তাই হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিষয়টি ছিল আরো গোলমেলে। দৈনিক পত্রিকার সংবাদে দেখেছি, ৮ই নভেম্বর জলন্ধরের পুস্তি পালোয়ান পাতিয়ালার মোতা সিংয়ের সংগে '৮ মিনিট ৪০' সেকেণ্ড লড়বার পরে ফল অমীমাংসিত থেকে গিয়েছিল। আর ৯ই নভেম্বর কাত্যারির বাস্তা সিং ও লাহোরের গোলাম গউসের কুস্তি '১০ মিনিট ৫৯ সেকেণ্ড', এলাহাবাদের চৌধুরী পালোয়ান ও ইস্‌মাইল বেচামের লড়াই '৬ মিনিট ৩৩ সেকেণ্ড', অমৃতসরের নারায়ণ সিং ও লাহোরের মুসা পালোয়ানের যুদ্ধ '৬ মিনিট ৫৯ সেকেণ্ড' এবং কানপুরের আদ্ধা পালোয়ান এবং দিল্লীর খড়্গ সিংয়ের প্রতিযোগিতা '১৪ মিনিট ৩২ সেকেণ্ড' হবার পরে অমীমাংসিত অবস্থায় ছিল।

উল্লিখিত পাঁচটি কুস্তির মধ্যে সর্বশেষ লড়াইটি সুরু হয়েছিল ক্রেমার ও সর্দার খাঁয়ের কুস্তির পরে অধৈর্য, ক্ষিপ্ত ও উন্মত্ত জন কোলাহলের মধ্যে। বিচার বিভ্রাটের ফলে তখন এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল যে, সাম্প্রদায়িক দাংগার আশংকা করে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই ১৪ মিনিট ৩২ সেকেণ্ডে এই কুস্তিটি থামিয়ে দিতে হয়েছিল! অতএব একটি অস্বাভাবিক অবস্থায় এই যুদ্ধটি মিনিটের ভগ্নাংশ সময়ে অর্থাৎ ৩২ সেকেণ্ডে বন্ধ হওয়ায় বিস্মিত হবার কিছু ছিল না। কিন্তু বাকী চারটি কুস্তিও অনুরূপ কায়দায়, অর্থাৎ ৪০, ৫৯, ৩৩ এবং ৫৯ সেকেণ্ডের মাথায় কেমন করে অমীমাংসিতভাবে শেষ হোল, কেন সেসব কুস্তি পূরো মিনিট পার না ক'রেই বন্ধ করা হয়েছিল, তা সংবাদে

প্রকাশিত হয়নি। তাই, অগণিত লোকের মতো আমারও এই বিষয়ে গুরুতর সন্দেহ ও প্রশ্ন রয়ে গেছে। কারণ, একমাত্র জয়-পরাজয়ের ক্ষেত্র ছাড়া ও-রূপ সময়ে কোনো লড়াই কখনো বন্ধ হয় ব'লে আমার জানা নেই।

কোসিসের ভাগ্য বিড়ম্বনা

এলাহাবাদ দংগলের দুই সপ্তাহের মধ্যেই ২২এ নভেম্বর কলিকাতায় গোটা কয়েক উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক কুস্তি হয়। সেণ্ট পল্‌স্ ক্যাথিড্রেল গীর্জার নিকট হ্যাড়িংটন ষ্ট্রীটের শতাধিক গজ উত্তরে চৌরংগী রোডের পূর্ব পার্শ্বে একটি বিরাট অস্থায়ী মণ্ডপ তৈরী হয়েছিল এবং সেইখানেই এই লড়াইগুলির ব্যবস্থা হয়েছিল। এই প্রতিযোগিতার মধ্যস্থ ছিলেন প্রসিদ্ধ মুষ্টিক বলাইদাস চট্টোপাধ্যায় এবং বিচারক ছিলেন মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর।

২২এ নভেম্বর এই কুস্তিগুলি হয়েছিল। প্রথম কুস্তিতে নেমেছিলেন অ্যালেকজাণ্ডার এবং লাল উদ্দিন গরি। ৪ মিনিট ১৭ সেকেণ্ডে অ্যালেকজাণ্ডার গরিকে শূন্যে তুলে আছাড় মারেন এবং সম্পূর্ণ চিৎ করতে-না-করতেই মধ্যস্থ শেতাংগ মল্লের অনুকূলে জয়সূচক বাঁশী বাজিয়ে ফেললেন। ফলত গরি আইন সংগতভাবে চিৎ না হয়েও পরাজিত গণ্য হলেন। ১৯২৯ অব্দে কলিকাতায় গোবর বাবু ও ছোট গামার কুস্তিতেও এইরূপ নানা বিচার বিভ্রাট ঘটেছিল যার জন্য গোবর বাবুকে সেইবার অত্যন্ত অপদস্থ হ'তে হয়েছিল। বস্তুত এইরূপ অঘটন আমাদের দেশে হামেশাই ঘ'টে থাকে।

২২এ নভেম্বরের দ্বিতীয় কুস্তি হয়েছিল রোমেনীয়ার সাম্পত্ বাবিয়ান ও চন্দ্রদ্বীপ সিংয়ের মধ্যে। দুইজনই ১০ মিনিট কাল সমান লড়েছিলেন।

তৃতীয় জোড়ে নেমেছিলেন আর্নলদ্ কোসিস্ এবং রামপরিকা পণ্ডিত। প্রথমত ধীর পদক্ষেপে কোসিস্ মঞ্চে আরোহণ করলেন এবং অত্যন্ত শান্তভাবে কুস্তি সুরু হবার অপেক্ষা করতে লাগলেন। তার আধ মিনিট পরেই রামপরিকা লাফিয়ে মঞ্চের ওপর উঠ্‌লেন; প্রথম থেকেই তাঁকে কিন্তু চঞ্চল ও উত্তেজিত মনে হয়েছিল, যেনো মূহূর্ত বিলম্বও তাঁর সইছিল না। দুজনের দেহ-ভার প্রায় একই রকম ছিল; বোধ হয়, কোসিস্ কিছু ভাবী ছিলেন। তবে রামপরিকার দেহের বাঁধুনী বেশ শক্ত ও মজবুত ছিল; বিশেষত তাঁর দেহ পেশীবহুল ছিল ব'লেই তাঁকে সুন্দরতর দেখাচ্ছিল।—এবং হয়তো এইজন্যই তিনি ক্ষিপ্রতর হ'তে পেরেছিলেন।

বিকাল ৪টা ২৬ মিনিটে এঁদের কুস্তি সুরু হয়। বাঁশী বাজা মাত্র রামপরিকা তাঁর কোন্ থেকে ছুটে এসে কোসিস্‌কে ঠেলে এক পাশে নিয়ে যান এবং দড়ির কাছে সংকীর্ণ জায়গায় তিনি 'ঢাক' প্রয়োগ করেন। কিন্তু ৫০ সেকেণ্ডের সময় কোসিস্ এই প্যাঁচ কাটিয়ে রামপরিকাকে আছাড় মারবার জন্য দক্ষতার সংগে 'সেতু' করেন। তাঁর পিঠ তখন মাটি থেকে অন্তত ১০ ইঞ্চি উঁচু ছিল। এদিকে কোসিসের এই চিতানো অবস্থাটি দেখেই রামপরিকা নিজের জিত হয়েছে মনে ক'রে মঞ্চ থেকে নীচে লাফিয়ে পড়লেন এবং সমর্থকদের অভিনন্দন নেবার জন্য জনসমুদ্রের মধ্যে ঝাঁপাতে লাগলেন। শেষে ব্যাপারটা যখন তাঁকে বুঝিয়ে বলা হোল, তখন তিনি পুনরায় লড়তে এলেন।

দ্বিতীয় বারের কুস্তিতেও রামপরিকার সেই ধাক্কা এবং তার ফলে কোসিস্‌কে এবারও কোন্‌ঠাসা হ'তে হোল। রামপরিকা সেই অবস্থায় ডুব মেরে কোসিসের দুই উরু বেষ্টন ক'রে ধরলেন। রোমেনীয় মল্ল দড়ি ধ'রে ২০ সেকেণ্ড আত্মরক্ষা করলেন বটে, কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব হওয়ায় পুনরায় তিনি 'সেতু' করলেন। তখন লড়াইটা চলেছিল একেবারে এক পাশ ঘেসে; তাই দৈবাৎ দুজনই দড়ি গলিয়ে নীচে পড়ে গেলেন। এবার বাস্তবিকই জিত হয়েছে মনে ক'রে রামপরিকা সেখান থেকেই দ্বিতীয় বারের জন্য জনসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে সাঁতার কাটতে লাগলেন। আর চারিদিকেও তখন হৈ চৈ এবং উল্লাসের কোলাহল সুরু হোল। কিন্তু এবারেও কুস্তির মীমাংসা হয়নি।

তৃতীয় বার কুস্তি সুরু হ'লে রামপরিকা পুনরায় 'ঢাক' মারলেন। আত্মরক্ষার ইওরোপীয় সহজ পন্থা হিসাবে কোসিস্‌ও সংগে সংগেই সেতু করলেন। এইবারও তাঁর সেতু কম্‌সে কম ২।৫ ইঞ্চি উঁচু ছিল। কিন্তু কুস্তি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ বলাই বাবু ইওরোপীয় কুস্তির এই কৌশলটি ঠিকভাবে অর্থাৎ নীচু হ'য়ে দেখেননি। তাই রামপরিকা যখন কোসিস্‌কে ধরাশায়ী করতে সচেষ্ট ছিলেন, তখন কোসিসের পিঠ মাটি স্পর্শ ক'রেছে মনে ক'রে তিনি বাঁশী বাজিযে বস্‌লেন, আর রামপরিকাও তৃতীযবারের জন্য জনসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন!

এই কুস্তিটি আদৌ বিচারসংগত হয়নি। কুস্তির সাধারণ নিয়ম অনুসারে মধ্যস্থের বিনা অনুমতিতে রামপরিকা বার বার মঞ্চ ছেড়ে গিয়েছিলেন ব'লে বরং তাঁকেই পরাজিত গণ্য করা উচিত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে কোনো নীতির বালাই নাই।

ক্রেমার-বংশী কুস্তি-লীলা

এই দিনের প্রধান কুস্তিটি হয় বিহারের প্রসিদ্ধ মল্ল রাজবংশী সিং এবং ক্রেমারের মধ্যে। এই কুস্তিটি সব চেয়ে চিত্তাকর্ষক হবে মনে ক'রে যাঁরাই সেদিন উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁদের সকলকেই নিরাশ হ'তে হয়েছিল। কেননা, গোংগার কথা মনে ক'রে বংশী গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সব সময়ই ভয়ে ভয়ে কুস্তি লড়েছিলেন। কুস্তি উপলক্ষে যে এত বড় বিরাট জনসমুদ্র সৃষ্টি হতে পারে, ইতিপূর্বে আমি নিজেও তা কল্পনা করতে পারিনি। মণ্ডপের ভিতরে ও বাইরে কম্‌সে কম ৫০০০০ লোক সমবেত হয়েছিল। কেউ কেউ বলেছেন, লক্ষাধিক। তা হ'তেও পারে; বাইরের জনতা দেখা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবে গাছে গাছে এবং বাড়ীর ছাদে ছাদে বহু শত লোক আমি দেখেছিলাম। একজন বিশিষ্ট বন্ধুর কাছে শুনেছিলাম, সন্ধ্যার প্রাক্কালে চৌরংগী রাস্তার ওপর দিয়ে তাঁর গাড়ী চালিয়ে যেতে খুবই বেগ পেতে হয়েছিল। রাস্তার অপর পারেও তিনি উদ্বেলিত জনসমুদ্র দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলেন।

প্রথমত ক্রেমার মঞ্চে উঠ্‌লেন এবং দর্শকদের অভিনন্দন জানিয়ে মধ্যস্থ বলাই চ্যাটার্জির কাছে জয়-পরাজয়ের নিয়ম জিজ্ঞাসা ক'রে নিলেন। মিনিট খানেক পরেই বংশী একটা দৈত্যের মতো লাফ দিয়ে মঞ্চে আরোহণ করলেন! বিকাল ৩টা ৫০ মিনিটে এই কুস্তি সুরু হয়; এবং ২০ মিনিট কুস্তি চল্‌বার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। এই কুস্তি শেষ পর্যন্ত সমান হয়েছিল।

বংশীর কাছে গায়ের জোরে ক্রেমারকে শিশুতুল্য মনে হয়েছিল। কেননা, বংশী ক্রেমার অপেক্ষা প্রায় এক মাথা উঁচু ছিলেন এবং ওজনেও প্রায় ৮০ পাউণ্ড বেশী ছিলেন। বুঝবার সুবিধার জন্য এখানে এই দুই মল্লের মাপ পাশাপাশি দিচ্ছি :—

	ক্রেমার	বংশী সিং
তারিখ	৪ঠা মে, ১৯৩৬	৭ই জুন, ১৯৩৬
বয়স	৩০ বছর	৩৮ বছর
ভার	১৯৮ পাউণ্ড	২৭৫ পাউণ্ড
দৈর্ঘ	৬৭ ৩/[illegible] ইঞ্চি	৭[illegible] ১/৪ ইঞ্চি
গলা	১[illegible] ১/৪ ,,	১৮ ১/২ ,,
বাহু (স্বাভাবিক)	১[illegible] ৩/৪ ,,	১৫ ৩/৪ ,,
বাহু (সংকুচিত)	১৪ ৩/৪ ,,	১৬ ,,
গোছা (স্বাভাবিক)	১[illegible] ১/৪ ,,	১২ ৩/৪ ,,
কব্জি	৮ ১/৪ ,,	৮ ১/২ ,,
বক্ষ (স্বাভাবিক)	৪৪ ,,	৪৭ ১/২ ,,
বক্ষ (প্রসারিত)	৪৭ ১/২ ,,	*
কটি	৩৩ ১/২ ,,	৪৩ ,,
ঊরু	২৪ ,,	২৬ ১/২ ,,
হাঁটু	১৫ ,,	১৬ ,,
মোচা (স্বাভাবিক)	১৪ ১/২ ,,	১৫ ১/২ ,,
মোচা (সংকুচিত)	১৫ ৩/৪ ,,	১৬ ৩/৪ ,,
নলি	৮ ৩/৪ ,,	১০ ,,

* বংশী চেষ্টা ক'রেও তাঁর বুক ফোলাতে পারেন নি

সেলামী নিয়ে দুজনের মধ্যে কুস্তি আরম্ভ হ'লেও প্রথম দু মিনিট শুধু একে অন্যের ঘাড় ধরে শক্তির পরিমাপ করেছিলেন। তৃতীয় মিনিটে বংশীর শক্তিমান বাহুবেষ্টনী থেকে মুক্ত হবার জন্য ক্রেমার ছুটে দড়ির বাইরে চ'লে গেলেন। চতুর্থ মিনিটেও এর পুনরাবৃত্তি ঘটল। মোট কথা, বংশী তাঁর অপরিমিত দৈহিক বলের সাহায্যে জার্মানকে বারংবার আক্রমণ সুরু করলে তা এড়ানোর জন্য ক্রেমার সাধ্যমত চেষ্টা করতে লাগলেন। ৪ মিনিট ৪০ সেকেণ্ডে ক্রেমারের উপবিষ্টাবস্থায় বংশী যখন তাঁর জাংঘিয়া ধ'রে চাপছিলেন, তখন তা ছিঁড়ে যায়। জাংঘিয়া বদলে আবার সেই অবস্থা থেকে কুস্তি সুরু হয়। কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও বংশী ক্রেমারকে শোওয়াতে পারলেন না। অতএব নতুনভাবে আক্রমণ করবার জন্য বংশী ক্রেমারকে ছেড়ে দিলেন। ক্রেমারও দাঁড়িয়ে গেলেন। নবম মিনিটে ক্রেমারকে নীচে এনে তাঁর উপবিষ্টাবস্থায় বংশী আবার তাঁর জাংঘিয়া ছিঁড়তে সমর্থ হন। বাস্তবিক, তখনকার অবস্থা দেখে মনে হয়েছিল, ক্রেমারের জাংঘিয়া ছিঁড়ে তাঁকে অপদস্ত করাই যেন বংশীর আসল আকাংখা ছিল! কারণ, দ্বিতীয়বার জাংঘিয়া ছিঁড়বার পরে ভারতীয় পালোয়ান-মার্কা দলের মধ্যে বেশ একটা উল্লাস ধ্বনি উঠল এবং ক্রেমার পরিধেয় পরিবর্তনের জন্য সাজ-ঘরে যাবার সংগে সংগে সেই উল্লাসধ্বনিতে উৎসাহিত বংশী একটা বিকট চীৎকার ক'রে মঞ্চের ওপর গোটা কয়েক লাফ দিয়েছিলেন এবং জলদ-গম্ভীর স্বরে হেঁইও-হেঁইও ক'রে গোটা কয়েক বৈঠক দিয়েছিলেন! প্রধানত এইজন্যই তাঁকে তখন সাবধান ক'রে দেওয়া গেল যেনো তিনি আর তাঁর জাংঘিয়া না ছিঁড়েন।

ক্রেমার ফিরে এলে দ্বাদশ মিনিটে আবার কুস্তি সুরু হোল। ক্রেমার এতক্ষণ শুধু আত্মরক্ষা করছিলেন; কিন্তু যখন তিনি বুঝলেন, বংশী

বলীয়ান হ'লেও চতুর বা কুস্তি-বিজ্ঞানী নন, তখন তিনি পাল্টা আক্রমণের উদ্দেশ্যে বার কয়েক 'ঢাক' প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু পাহাড়সদৃশ বংশীকে ফেলা দূরে থাক, তিনি নাড়াতেও পারেন নি ; বরং প্যাচ লাগাতে গিয়ে একবার তিনি নিজেই নিজের বেগে উপুর হয়ে পড়েছিলেন। ১৭ মিনিট ৩০ সেকেণ্ডে বংশী সহসা ক্রেমারের বাঁ হাতখানাকে মোচড় দিয়ে পিছনের দিকে নিয়ে আসেন এবং ভেংগে ফেলবার চেষ্টা করেন ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ মধ্যস্থ তা ছাড়িয়ে দেন।

১৮ মিনিট ৪০ সেকেণ্ডের সময় ক্রেমার আর একবার দড়ি গলিয়ে নীচে প'ড়ে যান ; ধরাধরিভাবে থাকায় বে-টাল হয়ে বংশীও ক্রেমারের ওপর প'ড়ে যান। কুস্তির পূর্বে স্থানীয় ছেলেরা প্রদর্শনী হিসাবে যে-সব লোহার পাত বেঁকিয়েছিল, তার একটি মঞ্চের পাশেই নীচে প'ড়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে, ক্রেমার তাঁর বাঁ কাঁধ চেপে চার ফুট ওপর থেকে এই কুণ্ডলীকৃত লোহাটির ওপর পড়েছিলেন এবং তদুপরি বংশীর বিশাল দেহের হ্যাঁচকা চাপ তাঁকে সাংঘাতিকভাবে জখম করে দেয়। এইভাবে নানা কারণে কিছু সময় নষ্ট হওয়ায় ২০ মিনিটের জায়গায় ২৬ মিনিট কুস্তি চালানো হয়।

২১ মিনিট ৩০ সেকেণ্ডে ক্রেমার যখন ফের মঞ্চে উঠ্‌লেন, তখন দেখা গেল তাঁর কাঁধ, ঠোঁট, চিবুক বেয়ে প্রবল রক্তধারা বইছে। কুস্তি চল্‌ল! কিন্তু এবার ক্রেমারকে সত্যই দুর্বল মনে হতে লাগল এবং তিনি শুধু ডান হাতে কোনো রকমে আত্মরক্ষা করতে লাগলেন। আর একেই উপযুক্ত সুযোগ মনে ক'রে বংশী ক্রেমারের বাঁ কাধ ও বাঁ হাতের ওপর তীব্র আক্রমণ চালালেন। অত্যন্ত কষ্টে ক্রেমার তা প্রতিরোধ করতে লাগলেন। দ্বাবিংশ মিনিটে বংশীর ধাক্কা সামলাতে না পেরে ক্রেমার পুনরায় মঞ্চের নীচে পড়ে গেলেন। ২৪ মিনিটের সময় বংশীর

আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য ক্রেমার যখন হাঁটু মুড়ে মাটিতে বসেছিলেন, তখন অত্যধিক রক্তপাতের ফলে বার বার প্যাঁচ ফস্‌কে যায় দেখে বংশী আখড়া থেকে খানিকটা মাটি ক্রেমারের কাঁধ ও বুকে মেখে নিয়েছিলেন। ২৫ মিনিট ২০ সেকেণ্ডে ক্রেমার আবার নীচে প'ড়ে যান; ফিরে যখন এলেন, তখন তিনি দস্তুরমতো টল্‌ছিলেন—তাঁর শক্তি ও দম তখন প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছিল। এর কয়েক সেকেণ্ড পরেই ২৬ মিনিটে সমাপ্তি সূচক বাঁশী বাজানো হয় এবং কুস্তিটিকে সমান ঘোষণা করা হয়। কিন্তু অচিরাৎ ক্রেমারকে স্টেচারে ক'রে অ্যাম্বুল্যান্স যোগে হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছিল!

বংশীর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য এইদিন ক্রেমার বার বার দড়ি জাপ্টিয়ে ধরেছিলেন এবং বার বার ছুটে দড়ির বাইরে চলে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তিনি যে কৌশল, কষ্টসহিষ্ণুতা ও দুর্দমনীয়তার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা অতুলনীয় ও অভূতপূর্ব; বস্তুত কুস্তি-বিজ্ঞানের মান হিসাবে এই দিন বংশী ক্রেমারের অনেক, অনেক নীচে ছিলেন। তাঁর এই দিনকার কর্মাবলী অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং নিকৃষ্ট ভারতীয় কুস্তির পর্যায়ে পড়ে। আজ পর্যন্ত যত বৈদেশিক মল্ল ভারতের বুক পা দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে সব চেয়ে উন্নত ধরণের কুস্তি দেখিয়েছিলেন ক্রেমার। ভারতের পালোয়ানী ইতিহাসে ক্রেমারের নাম অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে এবং সর্বত্র কৃতকার্য না হ'লেও তাঁর ভারত পরিক্রমণ মোটামুটিভাবে সার্থক হয়েছিল, কুস্তি-বিজ্ঞানী মাত্রেই একথা স্বীকার করবেন।

লিউইসের আহ্বান

১৯৩৬, ডিসেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌ সহরে একটি প্রদর্শনী হয় এবং সেই উপলক্ষে সেখানে ২০এ ডিসেম্বর থেকে পরবর্তী বছর ১৯৩৭, ৩১এ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে একদিন ক'রে কুস্তি প্রতিযোগিতা হয়েছিল।

এই প্রতিযোগিতায় বিদেশীদের মধ্যে জার্মানির ক্রেমার, রোমেনিয়ার কোসিস্, অ্যামেরিকার হাডসন, অস্ট্রেলিয়ার আর্ট কাউন্সেল, তুরস্কের আলী বেগ ইত্যাদি অনেকে নেমেছিলেন ; কিন্তু কোনো প্রতিযোগিতাই ঠিক ঠিক প্রতিযোগিতার গুরুত্ব নিয়ে হয়নি। শুধু প্রদর্শনীকে জমকালো করবার জন্যই এইসব মল্লদের কিছু অর্থ দিয়ে এই কুস্তিগুলি করানো হয়েছিল। তাই এর আলোচনা করবো না।

এই প্রদর্শনীর পরেই ক্রেমার অস্ট্রেলিয়া চ'লে যান। সেখানে তিনি যে-কটি কুস্তি লড়েছিলেন, তার মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল গ্রেভাসের সংগে যুদ্ধটি। প্রায় সেই সময়ে বিশ্ববিশ্রুত অ্যামেরিকান মল্ল এড্ওয়ার্ড 'স্ট্র্যাংলার' লিউইস অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণে গিয়েছিলেন। সিড্নীতে অবস্থান সময়ে একটি স্ট্যাডিয়ামের ব্যবস্থা করে লিউইস্ হঠাৎ গামাকে এক হাজার পাউণ্ডের প্রতিশ্রুতিতে এক তারের মাধ্যমে 'আহ্বান' করে বসলেন। কিন্তু গামা এই তারের কোন জবাব না দেওয়ায় লিউইসের কর্মাধ্যক্ষ মিঃ টেড্ থাই অগাষ্ট মাসে সিড্নী থেকেই লাহোরের 'সিভিল অ্যাণ্ড মিলিটারি গেজেটে' এক পত্র লেখেন। এই পত্রে তিনি গামার জবাব না পাওয়ায় দুঃখ প্রকাশ ক'রে বলেছিলেন যে, লিউইস শীঘ্রই ভারতবর্ষে উপস্থিত হচ্ছেন। সেখানে লিউইস যে-কোনো ভারতীয় পালোয়ানের সংগে কুস্তি লড়তে প্রস্তুত থাকবেন।

লিউইসের 'আহ্বান' বিষয়ে এখানে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। গামার কাছে তার করে তার জবাব না পাবার কারণ অতি স্পষ্ট। তিনি গামাকে ১০০০ পাউণ্ড দিতে চেয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর অভিরুচি মতো কুস্তি হবে অস্ট্রেলিয়ার সিড্নী সহরে! সেখানে যাতায়াতের খরচপত্র সম্পর্কে ব্যবস্থা কি ছিল, তা প্রকাশিত হয়নি। তা ছাড়া প্রতিযোগিতার পূর্বে দু এক সপ্তাহের জন্য গামার কুস্তি অভ্যাস

করার ব্যবস্থাই বা সেখানে কি হয়েছিল ? সম্ভবত এসব প্রশ্ন চেপে রাখার জন্য গামা নীরব ছিলেন। বিশেষত মিঃ থাই সামান্য টাকার লোভ দেখিয়ে যেমন তাড়াহুড়া ক'রে গামাকে সিড্‌নী সহরে নিতে চেয়েছিলেন তা শুধু হাস্যকর প্রচেষ্টা ছিল। কারণ, গামা ছিলেন চির অপরাজিত মল্ল ; অন্যপক্ষে লিউইসের জীবন ছিল জয়-পরাজয়বহুল। এমতাবস্থায় উপযুক্ত চুক্তিবদ্ধ না হয়ে 'একটি আহ্বানের' জবাবে গামা বা সেই শ্রেণীর কোনো পালোয়ানের পক্ষে কোথাও ছুটে যাওয়া সম্ভব ছিল না। মিঃ থাই নিজেও কুস্তি-জগতের এইসব নিয়ম সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন ; তথাপি সেসব প্রশ্ন তিনি কৌশলে এড়িয়ে গিয়েছিলেন। অতএব গামার পক্ষে নীরব থাকা ছাড়া গত্যন্তরও ছিল না।

লিউইস ও পাশ্চাত্য মল্ল-সমাজ

এখানে লিউইস সম্পর্কে আরো একটু পরিচয় দরকার। তিনি জাতিতে জার্মান ; ১৮৯৮ অব্দে অ্যামেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়া প্রদেশে তাঁর জন্ম হয়। ছাত্র জীবনেই তিনি ব্যায়াম ও কুস্তিতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হন এবং অধ্যয়নের শেষে তিনি পেশাদারী কুস্তি গ্রহণ করেন। এই সময় থেকে তিনি ক্রমশ অ্যামেরিকার প্রসিদ্ধ মল্লদের সংগে প্রতিযোগিতা সুরু করেন এবং এইভাবেই মল্ল হিসাবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের দাবী ক্রমশ স্বীকৃত হতে থাকে। ১৯২১ অব্দে সর্বপ্রথম তিনি প্রসিদ্ধ মল্ল জোসেফ্ স্টেচারকে হারিয়ে 'জগজ্জয়ী মল্ল' খেতাব লাভ করেন। অবশ্য এর পরেও পুন পুন জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়ে তিনি আরো চারবার 'জগজ্জয়ী মল্ল' হয়েছিলেন যা পৃথিবীতে আর কোন মল্লই হ'তে পারেন নি।

একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, পশ্চিম জগতের এইসব বড় বড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবার সুযোগ একমাত্র গোবর বা ছাড়া আর কোনো ভারতীয় মল্লের হয়নি ; হ'লে অবস্থা নিশ্চয়ই অন্য রকম দাঁড়াতো। সে যা হোক, পাশ্চাত্য মল্লদের এই শক্তি-সংঘর্ষের ইতিহাস যেমন চমকপ্রদ, তেমনি হৃদয়গ্রাহী। আমি এখানে চুম্বক হিসাবে সেই সংঘর্ষের এ-মানুগতিক তালিকা উল্লেখ করছি যদিও পশ্চিম জগতেরই কিছু সংখ্যক বিশেষজ্ঞ এই তালিকা-শৃংখলকে আক্রমণ ক'রে মধ্যে মধ্যে অন্য দু একজন মল্লকে 'জগজ্জয়ী'র আসনে বসনোর চেষ্টা করেছিলেন।

বিগত শতাব্দীর কথা ছেড়ে দিয়ে এ শতাব্দী থেকে আমি এই 'জগজ্জয়ী'র তালিকা উল্লেখ করব। বর্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে অ্যামেরিকার টম্ জেংকিন্স মল্লযুদ্ধে অ্যামেরিকায় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। সেই সময় প্রসিদ্ধ রুশ-মল্ল জর্জে হাকেন্সমিথ্ ইওরোপের প্রাধান্য লাভ ক'রে অ্যামেরিকায় উপস্থিত হন এবং ১৯০৫, ৪ঠা মে নিউ ইয়র্কের মেডিসন্ স্কোয়ার গার্ডেনে টম্ জেংকিন্সকে দুবারে যথাক্রমে ৩১ মিনিট ১৫ সেকেণ্ড এবং ২২ মিনিটে পরাজিত ক'রে 'জগজ্জয়ী'র মুকুট লাভ করেন। ১৯০৮ অব্দে চিকাগোর ফ্র্যাংক্ অ্যালবার্ট গচ্চ্ হাকেন্স্মিথ্কে হারিয়ে 'জগজ্জয়ী' হন এবং ১৯১৩ অব্দে তিনি 'অপরাজিত' অবস্থায় অবসর গ্রহণ করেন। তখন গচ্চের ইচ্ছায় জেসি ওয়েস্টারগার্ড ও হেন্‌রি অর্ডিম্যানের মধ্যে 'জগজ্জয়ী' খেতাবের জন্য একটি প্রতিযোগিতা হয়। এই যুদ্ধে ওয়েস্টারগার্ড জয়ী হলেও অ্যামেরিকার মানুষ তাঁকে 'জগজ্জয়ী' স্বীকার করতে প্রস্তুত হোল না। কেননা, তখন অন্যতম খ্যাতনামা মল্ল চার্লস কাট্‌লার বেশী জনপ্রিয়

ছিলেন। এজন্য কার্যত অ্যামেরিকার লোক কাট্‌লারকে 'জগজ্জয়ী' ব'লে গ্রহণ ক'রেছিল।

১৯১১, ৫ই জুলাই কাট্‌লারকে হারিয়ে জোসেফ স্টেচার 'জগজ্জয়ী'র দাবীদার হন। ১৯১৭ অব্দে আর্ল ক্যাডক্ আবার স্টেচারকে হারিয়ে 'জগজ্জয়ী' হন; কিন্তু ১৯২০ অব্দে পাল্টা কুস্তিতে স্টেচার ক্যাডক্‌কে পরাভূত করেন। ১৯২১ অব্দে লিউইস্ স্টেচারকে হারিয়ে প্রথম 'জগজ্জয়ী' আখ্যা লাভ করেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই স্টানিস্‌লস্ বিস্কোর হাতে লিউইসের পরাজয় ঘটে। ১৯২২, ৩রা মার্চ উইচিটা সহরে পাল্টা কুস্তিতে লিউইস্ বিস্কোকে পরাজিত করেন। লিউইস্ দ্বিতীয়বার 'জগজ্জয়ী' হলেন। ১৯২৫, ৮ই জানুয়ারি উয়েইন 'বিপুল' মানের হাতে আবার লিউইসের পরাজয় হয়। পরবর্তী এপ্রিল মাসে বিস্কোর কাছে মান্ তাঁর 'মুকুট' হারালেন। এই বছরেই স্টেচারের হাতে বিস্কোও হার মানলেন। ১৯২৮ অব্দে স্টেচারকে হারিয়ে লিউইস্ তৃতীয়বারের জন্য 'জগজ্জয়ী' হলেন। পরের বছর গাস্ সোনেন্‌বার্গ লিউইস্‌কে চিৎ করেন। ১৯৩১ অব্দে এড্‌ওয়ার্ড ডোনাল্‌ড জর্জ সোনেন্‌বার্গকে পরাজিত করে 'জগজ্জয়ী' আখ্যা লাভ করলেও শীঘ্রই তিনি লিউইসের হাতে পর্যুদস্ত হন। এইভাবে লিউইস্ চতুর্থ বারের জন্য 'বিশ্ববীর' হলেন। কিন্তু একই বছরে ফ্রান্সের হেন্‌রি ডি গ্লেনের হাতে লিউইস্ মার খেলেন। এড্‌ওয়ার্ড জর্জ আবার গ্লেন্‌কে পরাজিত করে 'বিশ্বজয়ী' হলেন।

ঠিক এই সময়ে পেন্‌সিল্‌ভেনিয়া অঞ্চলে জন কয়েক বড় বড় মল্ল উদিত হন এবং তাঁরা অ্যামেরিকার নির্ধারিত এই কায়েমী 'বিশ্বজয়ী'র শৃংখল অস্বীকার করে নিজেরা স্বতন্ত্র প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। এই প্রতিযোগিতায় গ্রীক্ পালোয়ান জিমি লণ্ডস্‌কে পরাজিত করে

জার্মানির ডিক্ শিকাট্ 'বিশ্ববীর' বলে ঘোষিত হন। কিন্তু পাণ্টা যুদ্ধে লণ্ডসের হাতে শিকাট্ পরাভব স্বীকার করেন। ১৯৩২ অব্দে লিউইসের হাতে শিকাট্ পরাজিত হলে মার্কিন কুস্তি পরিচালকরা লিউইস্‌কে পঞ্চম বারের জন্য 'জগজ্জয়ী' ঘোষণা করেন। কিন্তু জর্জের সংগে লিউইসের কুস্তি না হওয়ায়, বিশেষত লণ্ডসের হাতে ইতিপূর্বে শিকাট্ পরাজিত হওয়ায় লণ্ডসের 'জগজ্জয়ী' দাবী বেশী লোকের সমর্থন পেয়ে যায়। ১৯৩৩ অব্দে জিমি ব্রউনিং লিউইস্‌কে পরাজিত ক'রে 'বিশ্ব প্রাধান্যের' দাবী করলেও তা জনসমর্থন পায়নি। ১৯৩৪ ২৫এ জুন ব্রাউনিংয়ের সংগে লণ্ডসের লড়াই হয় এবং এই যুদ্ধে লণ্ডস্ ব্রাউনিংকে হারিয়ে সন্দেহাতীতভাবে 'জগজ্জয়ী' ঘোষিত হন।

১৯৩৫ অব্দে আইরিশ্ পালোয়ান ড্যানো ওমাহোনির হাতে লণ্ডস্ হেরে যান। কিন্তু গ্লেন্‌কে হারিয়ে অবধি এড্‌ওয়ার্ড জর্জও নিজেকে 'বিশ্বজয়ী' বলে দাবী ক'রে আস্‌ছিলেন। অতএব ওমাহোনি এবং জর্জের মধ্যে একটি পরীক্ষা বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে উঠে এবং এঁদের সেই পরীক্ষায় ওমাহোনি জর্জকে ধরাশায়ী করে নির্বিবাদে 'জগজ্জয়ী'র পদ লাভ করলেন ১৯৩৬ অব্দে শিকাট্ আবার ওমাহোনিকে পরাজিত করেন। এর পরেই আলি বাবা নামে আর এক মল্লের হাতে শিকাট্ পরাভব স্বীকার করেন এবং বাবা 'বিশ্বজয়ী' স্বীকৃত হন। এই ঘটনার অল্পকাল পরে জামাইকার ডেভ্ লেভিনের সংগে বাবার কুস্তি হয়। কোনো বিশেষ কারণে নিউ জার্সি স্টেট্ অ্যাথ্‌লেটিক্ কমিশন্ প্রথমত বাবাকে বাতিল ক'রে তাঁর 'জগজ্জয়ী' খেতাব কেড়ে নিয়েছিল; কিন্তু সংগে সংগেই এই সিদ্ধান্ত ঘোরানো হয়। অতএব বাবাই 'বিশ্ববীর' থেকে গেলেন। এভারেট্ মার্শেল্ তখন বাবাকে হারিয়ে 'জগজ্জয়ী' হন। পরের বছর হুংগারির লোইস্

থেজের হাতে মার্শেলের পরাজয় ঘটে। ১৯৩৮ অব্দে আবার আয়ার্ল্যাণ্ডের স্টিভ্ 'ক্রাশার' কেজির হাতে থেজের হার হয়।

এই বিজয় লাভের পরেই কেজি অ্যামেরিকা ছেড়ে স্বদেশে চ'লে যান। তখন অ্যামেরিকায় 'ন্যাশন্যাল্ রেস্ট্‌লিং কন্‌ভেন্‌শন্' মন্ট্রিয়েল্ নগরের সভায় মার্শেলকে 'বিশ্ববীর' ঘোষণা করেন। কিন্তু কন্‌ভেন্‌শনের এই সিদ্ধান্ত অনেকেরই বোধগম্য হয়নি; কেননা, কেজির পূর্ববর্তী 'বিশ্ববীর' থেজ্‌কেই পুনরায় এই সম্মান দেওয়া উচিত ছিল ব'লে বিশেষজ্ঞগণ মত পোষণ করতেন। সে যাহোক, থেজ্‌ও ছাড়বার পাত্র ছিলেন না; তিনি মার্শেলকে লড়াইয়ে আহ্বান করলেন এবং যুদ্ধে তাঁকে পরাজিত ক'রে নির্বিবাদে 'জগজ্জয়ী'র মুকুট ধারণ করলেন। ১৯৩৯ অব্দে ব্রংকো নেগার্স্কি থেজ্‌কে পরাজিত ক'রে 'বিশ্বজয়ী' হন। ১৯৪০, ৭ই মার্চ সেণ্ট্ লোইস্ সহরে রে স্টীল্ নেগার্স্কিকে হারিয়ে দেবার পরে অ্যামেরিকান মল্ল-সমজে এক দারুণ গোলযোগের সৃষ্টি হয় এবং নানা দিকের নানা সূত্রে প্রায় একশ মল্ল 'জগজ্জয়ী'র দাবীদার হ'য়ে দাঁড়ালেন। আর বিভিন্ন কুস্তি-সংস্থাগুলোও তাঁদের দাবীর যৌক্তিকতা বা অনুপযুক্ততা বুঝে উঠতে পারল না। আসল কথা, সেই সময়ে অ্যামেরিকায় এক সংগে বহু মল্লের অভ্যুত্থান ঘটে এবং তাঁদের শক্তির পার্থক্য নিরূপণ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। 'বিশ্বজয়ী'র আসনও তখন শূন্য থাকে।

লিউইস কি 'বিশ্ব-শ্রেষ্ঠ'?

১৯৩৭, ২৪শে সেপ্টেম্বর কর্মাধ্যক্ষ মিঃ থাইকে সংগে নিয়ে লিউইস্ 'স্ট্র্যাথেয়ার্ড' জাহাজ যোগে বম্বেতে অবতরণ করেন। সাংবাদিকদের কাছে মিঃ থাই সেদিন বলেছিলেন, "Lewis is the best wrestler

in the world in the opinion of U S A and better than Stanislaus Zbysko whom Gama defeated some years ago". মিঃ থাইর এই কথার কতটা মুল্য আছে, একবার বিচার ক'রে দেখা দরকার।

মিঃ থাই ভেবেছিলেন, এদেশের কেউ পশ্চিমী মল্ল-জগত সম্পর্কে বিশেষ কোনো খবর রাখেননা। তাঁর ধারণা হয়তো সম্পূর্ণ ভুল ছিল না। তাই যুক্তরাষ্ট্রের মতামত শুনিয়ে তিনি সাক্ষাৎকারী সাংবাদিকদের স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন। বিশেষ ক'রে গামার হাতে বিস্কোর পরাজয় ঘটেছিল বলেই বিস্কোর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর প্রতিপন্ন ক'রে লিউইস্‌কে তিনি গামার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। অথচ লিউইস যে গোবরবাবুর হাতে পরাজিত হয়েছিলেন, সে কথা চেপে গিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে লিউইস্ কখনোই বিস্কোর সমকক্ষ ছিলেন না, যুক্তরাষ্ট্রের মতেও না। এসম্পর্কে বিস্তর প্রমাণ থাকলেও সব উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে নমুনা স্বরূপ দু একটি কথা বলা দরকার ঠিকই।

১৯২৫, ৮ই জানুয়ারি লিউইসের সংগে উয়েইন্ 'বিপুল' মানের তিনবার লড়াই হয় এবং তিনবারই লিউইস্ সাংঘাতিকভাবে পরাস্ত হন। প্রথমবার ২১ মিনিটে 'ক্রচ্চ্' এবং 'বডিহোল্ড' প্যাঁচের সাহায্যে মান্ লিউইসকে শূন্যে তুলে আছাড় মারেন এবং অতি সহজে গদীতে মিলিয়ে দেন। দ্বিতীয়বারের যুদ্ধ আরো সহজে হয়। এবারও মান্ ২২৮ পাউণ্ডের লিউইসকে দুহাতে ধরে একেবারে মাথার ওপরে তুলে ফেলেন। অব্যাহতি পাবার জন্য লিউইস তখন পাগলের মতো হাত-পা ছুঁড়তে লাগলেন। পর মুহূর্তে দেখা গেল, তিনি 'দড়াম্' করে মঞ্চের ধারে পড়েছেন এবং পরক্ষণে গড়িয়ে নীচে পড়ে গেলেন। সাংঘাতিক জখম হয়ে তিনি মঞ্চে ফিরে এসে অভিযোগ করলেন যে, মান তাঁকে অতি

নির্দয়ের মতো আছাড় মেরেছেন। কিন্তু মান্ প্রতিবাদে বললেন যে, তিনি তাঁকে স্বেচ্ছায় কিছু করেন নি। তিনি শুধু তাঁকে শক্তিহীন করবার জন্য শূন্যে আল্গা ক'রে ধরেছিলেন…"when Lewis wriggled out of his grasp and fell outside the ropes." তথাপি বে-আইনী আছাড়ের অভিযোগে মানের সেই জয় মঞ্জুর হোল না এবং কর্তৃপক্ষ আবার কুস্তির নির্দেশ দিলেন।

এদিকে তো লিউইসের অবস্থা কাহিল! তিনি সোজা সাজঘরে গিয়ে বললেন যে, তাঁর আর কুস্তি লড়বার ক্ষমতা নেই। কিন্তু মধ্যস্থ মিঃ বেট্স্ তাঁকে আর ১৫ মিনিটের মধ্যে তৈরী হতে নির্দেশ দিয়ে জানালেন যে, কুস্তি তাঁকে লড়তে হবে, নতুবা তাঁকে পরাজিত গন্য করা হবে। বাধ্য হয়ে তখন লিউইসকে রাজী হতে হোল এবং ২০ মিনিটের মাথায় তিনি মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন। এবার কিন্তু মান্ সত্য সত্যই উত্তেজিত হয়েছিলেন। তাই এবার বাঁশী বাজাবার সংগে সংগেই মান্ বাঘের মতো থাব্লা দিয়ে লিউইসকে ধরে আবার শূন্যে তুললেন এবং এক মিনিটের মধ্যেই আছাড় দিয়ে চিৎ করে দিলেন। লিউইসকে অবশ্য স্টেচারে শুয়ে তখুনি হাসপাতালে যেতে হয়েছিল।

অ্যামেরিকার সুপ্রসিদ্ধ এবং প্রবীণ কুস্তি বিশেষজ্ঞ মিঃ ফিলিপস এই প্রসংগে স্পষ্ট ভাষায় লিখেছিলেন, "Lewis as champion had earned many ill-wishers because of the brutality of his head lock, with which he crushed so many opponents into submission and there appeared to be few who wanted to see him emerge victorious." এবং এজন্যই তিনি সংগে সংগে মন্তব্যও করেছেন, "Munn thereby fulfilled his part of the biblical

saying about the fellow who draws the sword and who must perish by the sword, for Lewis had been the man in other days who sent his opponents on the mat to hospitals, sanitariums and bonesetters after he had finished wringing their necks." লিউইস অ্যামেরিকায় কি পরিমাণ 'জনপ্রিয়' ছিলেন, উপযুক্ত বিবরণ থেকে তার খানিকটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

এবার দেখা যাক মল্ল হিসাবে লিউইস বিস্কোর চেয়ে কতখানি উঁচুতে ছিলেন! যে দিন মানের কাছে লিউইস এরূপ নাস্তানাবুদ হন, তার ঠিক তিনমাস পরেই বিস্কোর সংগেও মানের লড়াই হয় এবং সেই যুদ্ধে বিস্কো মানকে দুবার যথাক্রমে ৮ মিনিট ১১ সেকেণ্ড এবং ৪ মিনিট ৫৩ সেকেণ্ডে পরাজিত করেছিলেন। এই যুদ্ধের বিবরণও চিত্তাকর্ষক। মিঃ ফিলিপস এই যুদ্ধ সম্পর্কে বলেছেন, "Munn was banking on his favorite crotch hold, the one with which he lifted Lewis high above his head and hurled him out of the ring. But the veteran Zbysko was wise to his tactics. He was prepared for this one, the one in which Munn was most proficient, and warded off all the giant's attempts to attain it.

,'Meanwhile, 'Zibby' was putting into play his years of experience and soon transfered his position from one of defence to offence, a situation which became immediately dangerous for the youngster···

"Stanislaus grappled for eight minutes, picked Munn up bodily and hurled him to the mat with a deafening thud.…

"The second fall was obtained in less time and with less effort. He lifted Munn from his feet to the length of his arm over his head, and again slammed him to the floor."

অ্যামেরিকার প্রখ্যাতনামা মল্ল চার্লস কাটলার 'জগজ্জয়ী' হয়েও বিস্কোর প্রসংগে একবার বলেছিলেন—"Whether I could have beaten the great Zbysko at the time, is debatable. Stanislaus was in Europe but, had he been on this side of the Atlantic, I undoubtedey would have accepted a match with him to decide the world title, even though I had my doubts about being able to beat him. He was a far greater wrestler than most critics have given him credit for, and must rate among the five leading grapplers of all time when selections of "the greatest' are made."

অতএব যুক্তরাষ্ট্রের মতানুযায়ী লিউইস 'বিশ্ব-শ্রেষ্ঠ' অথবা 'বিস্কোর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর পালোয়ান' ছিলেন, মিঃ থাইর এই কথা সত্যি নয়। এদেশে লিউইস এসে দিন কয়েক অবস্থানও করেছিলেন। কিন্তু কারু সংগেই তিনি কুস্তি লড়বার সুযোগ পাননি। এইভাবে বিফল মনোরথ হয়ে তিনি লণ্ডন রওনা হয়ে যান।

গামার সাড়া

জর্জ ইওনেস্কো এবং কলিকাতার মিঃ মার্টিরোজ মার্টিনের ব্যবস্থায় ১৯৩৭ অব্দের নভেম্বর মাসে বম্বেতে একটি উল্লেখযোগ্য কুস্তির দংগল হয়। এই দংগলে 'ভারতীয়', 'ক্যাচ্চ্-অ্যাজ ক্যাচ্চ্-ক্যান্', 'গ্রীকো-রোমান' এবং অল্-ইন্' এই চারটি বিভিন্ন নিয়মে প্রতিযোগিতা হয়েছিল। বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষের বুকে অ্যামেরিকান্ 'অল্-ইন্' কুস্তির আমদানি এটাই প্রথম।

ভারতবর্ষ ছাড়া ইংল্যাণ্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, স্পেন, হুংগারি, পর্তুগাল, মাল্টা, রোমেনীয়া, বুল্‌গারিয়া, অস্ট্রিয়া, পোল্যাণ্ড, এস্তোনিয়া, গ্রীস, লিথুয়া নিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, ফিন্‌ল্যাণ্ড, প্যালেস্টাইন্, চীন, তুরস্ক, সিরিয়া, মিশর, মরক্কো ও অ্যামেরিকা—এই ২৪টি দেশের মল্ল এই দংগলে সমবেত হয়েছিল বলে প্রকাশ।

বৈদেশিক পালোয়ানদের মধ্যে অধিকাংশই অখ্যাত ছিলেন বটে, তবে পোল্যাণ্ডের ভ্লাডেক বিস্কো এবং ফ্রান্সের চার্লস রিগ্যলট বিশ্ব-বিখ্যাত ছিলেন। তাছাড়া হুংগারির কিং কং, প্যালেস্টাইনের জেক্তি গোল্ডস্টেইন, চীনের ওয়াং বক্ চিয়ুং, ইংল্যাণ্ডের মিচেল্ গিল্ ইত্যাদি কিছুটা পরিচিত ছিলেন।

ড্লাডেক বিস্কো ছিলেন স্টানিস্লস্ বিস্কোর কনিষ্ঠ ভ্রাতা যিনি অ্যামেরিকায় গোবর বাবু এবং বনমালী ঘোষের সহিত শক্তির পরীক্ষা দিয়েছিলেন। ১৯৩৫, ২০এ জুন তিনিই আর্জেণ্টাইনের বিশ্ব-কুস্তি প্রাধান্য প্রতিযোগিতায় সমাগত কয়েক শত মল্লের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে 'বিশ্ববীর' হয়েছিলেন যদিও তখন তাঁর বয়স প্রায় ৫৫ বছরের কাছাকাছি ছিল।

ফ্রান্সের রিগ্যলট ভারোত্তোলক হিসাবে এক সময়ে সর্বজয়ী ছিলেন। প্রথম তিনি ১৯২৪ অব্দে প্যারিসের বিশ্ব অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ভারোত্তোলনে সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়েছিলেন ; পরে পেশাদার ভারোত্তোলক হিসাবেও সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। কুস্তির দিকেও তাঁর উৎসাহ বাড়ে এবং এবিষয়ে তিনি ইওরোপ ও অ্যামেরিকার জন কয়েক মল্লের সংগে শক্তির পরীক্ষা দিলেও সর্বত্র জয়ী হ'তে পারেননি।

এই দংগলে ভারতবর্ষ থেকেও বহু মল্ল নেমেছিল। তাতে যোগদানের জন্য কলিকাতার উপকণ্ঠে কাশীপুরে ১৬, ১৭ এবং ১৯ অক্টোবর কতগুলি প্রতিযোগিতা হয়েছিল এবং তাতে পূর্ব ভারতীয় মল্লদের বাছাই হয়েছিল। এর ফলে নিম্নোক্ত মল্লগণ নির্বাচিত হয়েছিলেন :—

নাম	ওজন	দৈর্ঘ	বয়স
হনুমান সিং	২৪২ পাঃ	৭১ ই	২৮ বছর
নবাব পালোয়ান	২৩৮ ”	৬৯ ”	৪০ ”
দেশরাজ ব্রাহ্মণ	২৩৪ ”	৭০ ”	২২ ”
শাস্তা সিং	২৩০ ”	৬৯ ”	৩৫ ”
জওলা সিং	২২৪ ”	৭৩ ”	২৫ ”
হরবংশ সিং	২২০ ”	৬৮ ”	২৪ ”
সর্দার খাঁ	২১০ ”	৬৯ ”	৩০ ”
কর্তার সিং	১৮৫ ,,	৬৯ ,,	৩০ ,,
রঘুবীর সিং	১৮২ ,,	৭০ ,,	২১ ,,
পোস্তি পালোয়ান	১৮০ ,,	৬৬ ,,	৩৫ ,,
অজগর সিং	১৭০ ,,	৬৭ ,,	৩০ ,,

দুঃখের বিষয় এইসব পালোয়ানদের মধ্যে অনেকেই চীন, ব্রহ্ম, শ্যাম, মালয়, সিংগাপুর, ফিজি, যাভা, বোর্ণিও, ফিলিপাইন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, অ্যামেরিকা ইত্যাদি নানা জায়গায় শক্তির পরীক্ষা দিয়ে থাকলেও মল্ল হিসাবে এঁদের মধ্যে কেউই প্রথম শ্রেণীর ছিলেন না।

এঁরা ছাড়াও দক্ষিণ ভারত এবং উত্তর ভারত থেকে কিছু সংখ্যক ভারতীয় পালোয়ান বম্বের দংগলে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরাও সবাই দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণার মল্ল ছিলেন। কাজেই ৩রা নভেম্বর থেকে বম্বের মেরিন্ ড্রাইভ্ স্ট্যাডিয়ামে প্রায় এক মাস পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতা চল্‌লেও সেগুলি নেহাৎ মামুলী ধরনের হয়েছিল ব'লে তার বিশদ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

এখানে একথা উল্লেখযোগ্য যে, মল্ল হিসাবে আগত বৈদেশিকদের মধ্যে ক্রেমার অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন হওয়ায় তাঁকে এই দংগলে নামতে হয়নি। কিন্তু দংগল চলার সময়ে একদিন শাস্তা সিং ক্রেমারকে ব্যক্তিগতভাবে কুস্তিতে আহ্বান করেন; ক্রেমার তা গ্রহণ করেছিলেন।

২০ এ ডিসেম্বর দংগলের সাধারণ কুস্তিগুলি হবার পরে এই বিশেষ লড়াইটি হয় ক্যাচ্চ্-অ্যাজ ক্যাচ্চ্-ক্যান প্রণালীতে। ১০ মিনিট হিসাবে তিন চক্র কুস্তি হবে, এরূপ ঘোষিত হয়েছিল। কিন্তু ক্রেমার ও শাস্তার কীর্তি পাশাপাশি তুলনা ক'রে অনেকেরই অনুমান হয়েছিল, এই যুদ্ধে ক্রেমারই জয়ী হবেন। কার্যতও তা-ই হয়েছিল। প্রথম দু চক্র দুজনই প্রায় সমান সমান লড়লেন। কিন্তু তৃতীয় চক্রে ক্রেমার আক্রমণ সুরু করলেন এবং শাস্তাকে এমন এক আছাড় মারলেন যে, শাস্তা আর লড়তে স্বীকৃত হলেন না। ফলে ক্রেমারকে বিজয়ীর সম্মান দেওয়া হয়।

বম্বের এই দংগলে গামাও দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। কেউ কেউ এই উপলক্ষে তাঁকেও তাঁর শক্তি সামর্থ্যের পরিচয় দিতে অনুরোধ

করেছিল। বিদেশী প্রতিযোগীদের মধ্যে কারু কারু ইচ্ছা ছিল গামার সংগে প্রতিযোগিতা করবেন। কারু কারু আবার এমন ধারণাও হয়েছিল যে, গামা এখন বুড়ো হয়ে গেছেন; অতএব লড়বার শক্তি বা সাহস তাঁর আর নেই এবং এই মর্মে বেশ একটা কানাঘুসাও চলেছিল ঠিকই। হয়তো তা ক্রমশ গামার কানেও গিয়ে থাকবে। তাই দংগল শেষ হবার মুখে একদিন গামা সত্য সত্যই সাড়া দিলেন! তিনি বিশ্রাম না নিয়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে দংগলে সমাগত সমস্ত বৈদেশিক পালোয়ানকে একে একে ধরাশায়ী করবেন ব'লে এক 'এক ল্যাংগটি আহ্বান' ঘোষণা করে বস্‌লেন! অথচ তখন তাঁর বয়স ৫৭ বছর পেরিয়ে চলছে। কিন্তু তা হলে কি হবে? তাঁর সামনে দাঁড়ানোর ক্ষমতা বা সাহস তাঁদের কারুই হয়নি।

গামার সর্ত

ভারতবর্ষে এসে অবধি ক্রেমারের প্রধান আকাংখা ছিল গামার সংগে একবার কুস্তি লড়বেন। কিন্তু তাতো সহসা হবার উপায় ছিল না; কুস্তির ক্ষেত্রে অসাধারণ নৈপুণ্য না দেখাতে পারলে গামা ক্রেমারের সংগে কেনই বা লড়তে যাবেন? এইজন্যই ক্রেমার এক বছরের জায়গায় দু বছর কাল ভারতবর্ষে ঘুরে বেড়ালেন এবং যে কোনো বড় ভারতীয় মল্লের সংগেও সব সময়েই তিনি লড়তে প্রস্তুত ছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে, খুব বড় ভারতীয় মল্লের সংগে বেশী লড়বার সুযোগ না ঘটলেও সাধারণ যুদ্ধগুলিতে তিনি মোটামুটি মন্দ ফল দেখাননি। তাই কেউ কেউ এবিষয়ে গামার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত গামা জানালেন যে, বম্বে-দংগলের সর্বজয়ীকে হারাতে পারলে ক্রেমারকে

'ভারতীয় প্রাধান্যে'র জন্য ইমাম বখ্‌শের সংগে লড়াই করতে হবে এবং সেই যুদ্ধে জয়ী হ'লে গামা সানন্দে ক্রেমারের আকাংখা পূরণ করবেন।

আমি যত দূর জানি, গামা এ-ই সর্বপ্রথম তাঁর প্রাচীর-বেষ্টনীর কড়াকড়িকে লঘু ক'রে ক্রেমারকে একবারেই শেষ ফটক-স্বরূপ ইমাম বখ্‌শের সম্মুখে হাজির হবার সুযোগ দিয়েছিলেন। ইমাম্‌ বখশের সম্মুখবর্তী যেসব ফটক ছিল, তার দ্বারোয়ান ছিলেন হমিদ পালোয়ান এবং ছোট গামা। অবশ্য ইমামের কাছে দাঁড়ানোর ক্ষমতা ক্রেমারের নেই, একথা গামা বিলক্ষণ জানতেন।

বম্বের দংগলে যে দুইজন প্রধান মল্ল যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন ভারতের হরবংশ সিং এবং চীনের ওয়াং বক্‌ চিয়ুং। এঁরা দুজন দুটি স্বতন্ত্র ধারায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছিলেন। ১০ই ডিসেম্বর বম্বের 'ইণ্টারন্যাশন্যাল্‌ রেস্‌ট্‌লিং স্ট্যাডিয়ামে' এই দুই মল্লের মধ্যে 'অল্‌-ইন' প্রথায় ১০ মিনিটের ছয় চক্র যুদ্ধ ঠিক হয়। তিনবারের মধ্যে দু বার জয়ী হ'লেই তাঁকে বিজয়ী সাব্যস্ত করে একটি রৌপ্যাধার সহ ১০০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে বলেও স্থির হয়। আর, হার-জিত যা-ই হোক না কেন, শ্রেষ্ঠতর কীর্তির জন্য হরবংশকে অগ্রিম ১০০৲ টাকা দেওয়া হয়। বিজয়ী হলে চৈনিক মল্ল প্রাপ্য অর্থের দশ শতাংশ 'চাইনিজ ওয়ার রিলিফ্‌ ফাণ্ডে' দান করবেন ব'লে ঘোষণা করেছিলেন। সেই সময় চীনের সংগে জাপানের যুদ্ধ চল্‌ছিল। কিন্তু তাঁর সে সাধ পূরণ হয়নি।

এই দিন প্রথম তিন চক্র দুজনই প্রায় সমান সমান লড়েছিলেন। অবশ্য এই সময়ের মধ্যে চৈনিক মল্ল কিল-চড়-ঘুসি মেরে, কামড় বসিয়ে এবং পার্শ্ববর্তী দড়ির সাহায্যে ফাঁসি দেবার চেষ্টা ক'রে হরবংশকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলেন। এই বর্বরোচিত কাজের জন্য মধ্যস্থ চৈনিককে বার কয়েক সাবধান করে দিয়েছিলেন।

চতুর্থ চক্রের চতুর্থ মিনিটে ওয়াং বক্ চিয়ুং হরবংশকে একবার চিৎ করেন। কিন্তু সপ্তম মিনিটে দীর্ঘাবয়ব চিয়ুং যখন মাথা নীচু করে ভীষণ বেগে হরবংশকে আক্রমণ করেন, তখন হরবংশ তাঁকে ধোকা দিয়ে পাশ কেটে যান এবং চিয়ুংয়ের বেগের সংগে নিজেও বেগ দিয়ে তাঁকে সজোরে ঠেলে দেন। তার ফলে চৈনিক মল্ল দড়ি গলিয়ে মঞ্চের বাইরে একদম নীচে পড়ে যান। ২৩০ পাউণ্ড দেহের ভারে শক্ত মাটিতে মাথা প্রতিহত হওয়ায় চিয়ুং সংগে সংগে অচৈতন্য হয়ে যান এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মঞ্চে ফিরে আসতে অসমর্থ হওয়ায় তাঁকে পরাজিত গণ্য করা হয়।

এই বিজয় লাভের পরে গামার সর্তানুযায়ী হরবংশ ক্রেমারের সংগে শক্তি পরীক্ষায় অগ্রসর হন। বম্বের 'ব্র্যাবোর্ণ স্ট্যাডিয়ামে' ৩১এ ডিসেম্বর ক্রেমার ও হরবংশ 'ক্যাচ্চ-অ্যাজ ক্যাচ্চ-ক্যান্' প্রণালীতে লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হন। ১০ মিনিটের তিন চক্র যুদ্ধ হবার কথা ঘোষিত হয় এবং একজনকে পরিস্কারভাবে ৩ সেকেণ্ড চিৎ রাখতে হবে, এটাও খুব কড়াকড়িভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়। মধ্যস্থ নির্বাচিত হলেন কুস্তিগীর ওয়াং বক্ চিয়ুং।

প্রথম চক্রে হরবংশের হাতে ক্রেমার খুবই অপদস্থ হন এবং অতি কষ্টে হরবংশের গোটা কয়েক মারাত্মক প্যাঁচ থেকে অব্যাহতি লাভ করেন। দ্বিতীয় চক্রে ক্রেমার আক্রমণাত্মক হয়ে হরবংশকে কাবু করে ফেলেন এবং তিনি যুগপৎ হাত ও পায়ের বন্ধনী (Locks) লাগান। তথাপি হরবংশ তাকে ব্যর্থ করে ক্রেমারকে পাল্টা 'মোক্কা' লাগান; এবং তাতে ক্রেমার কিছুটা চোটও পান।

তৃতীয় চক্র শেষ লড়াই বলে দুজনই দুজনকে অতিশয় সাংঘাতিকভাবে আক্রমণ করলেন। ক্রমশ উভয় পক্ষ থেকেই অবৈধ আঘাত-প্রত্যাঘাত চলতে সুরু করল এবং দু এক মিনিটের মধ্যেই সেটা এমন অবস্থায়

গিয়ে পৌছল যে, মধ্যস্থের হাঁক-ডাক বা সাবধান বাণীতেও তাঁদের কেউ কর্ণপাত করলেন না। তখন গায়ের জোরে তাঁদের ছাড়াতে গিয়ে মধ্যস্থ নিজেও এমনভাবে আট্‌কা প'ড়ে গেলেন যে, তিনজনই একসংগে মঞ্চে গড়াগড়ি খেতে লাগলেন। এমন সময় সমাপ্তিসূচক ঘণ্টা পড়ায় সেই দিনের মতো দুজনকে সমান ঘোষণা করা হল।

পরবর্তী ১৯৩৮, জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে বম্বেতেই আবার ক্রেমার ও হরবংশ মিলিত হলেন। এইবার গোড়া থেকেই দুজন এমন বিপুল শক্তিতে লড়াই সুরু করেছিলেন যে, দুজনই সীমাতিরিক্ত পরিশ্রমে শেষ পর্যন্ত অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন! অতএব এই কুস্তিকেও সমান ঘোষণা করতে হয়েছিল।

এর পরে ১৬ই জানুয়ারি হরবংশ সিংয়ের সংগে ওয়াং বক্ চিয়ুংয়ের একটি স্বতন্ত্র কুস্তি হয়। সেই সময় হরবংশ কণ্ঠাস্থিতে চোট পেয়ে দিন কয়েক বিশ্রাম করেন। এই বিশ্রামের পরেই তিনি ক্রেমারের সংগে তৃতীয় বারের জন্য শক্তি পরীক্ষায় অগ্রসর হয়েছিলেন যদিও তাঁর কণ্ঠাস্থি সম্যকরূপে আরোগ্য হয় নি। তার অনিবার্য ফলস্বরূপ হরবংশ ক্রেমারের সংগে লড়তে গিয়ে পুনরায় কণ্ঠাস্থিতে চোট পান এবং সহজেই পরাজয় স্বীকার করেন। অতএব সর্তানুসারে ক্রেমার এবার ইমাম বখ্‌শের সংগে যুদ্ধ করবার সুযোগ পেয়ে গেলেন।

ক্রেমারের সংগে ইমাম বখ্‌শের কুস্তিও বম্বেতেই হয়েছিল। দৈহিক পরিধিতে ক্রেমার কিন্তু ইমামের কাছে বালকের মতো ছিলেন, শক্তি ও কুস্তি-বিজ্ঞানে তো বটেই। তবু সেদিনের কুস্তির যে বিবরণ আমি শুনেছি, তাতে ইমামের ব্যবহার অন্যায়, অবৈধ এবং প্রহসনস্বরূপ মনে হয়েছিল। কেননা, সেলামী নিয়েই অনেকটা অবহেলার মনোভাব নিয়ে

ইমাম ক্রেমারের দিকে এগিয়ে যান। ক্রেমার খানিকটা পিছু হ'টে দড়ির কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালেন। সেই অবস্থায় ইমাম কিছুটা সামনে ঝুঁকে ক্রেমারের কপালে নিজের কপাল ঠেকিয়ে বাঁ হাতের তালু দ্বারা ক্রেমারের ঘাড়ের পিছন দিকটা চেপে ধরলেন। ইমামের আড়াইশ পাউণ্ড ভারী বিরাট দেহটাকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য ক্রেমারকে তখন স্বাভাবিক ভাবেই দুপায়ে খুঁটি ক'রে সাম্‌নে ঝুঁকে নিজের দেহ ও কপাল দিয়ে তাল সাম্‌লাতে হচ্ছিল। এইভাবে ক্ষণকাল কাটবার পরেই ক্রেমারের পায়তাড়ার দুর্বল মুহূর্তে অর্থাৎ পদক্ষেপ পরিবর্তনের মুখে ক্রেমার যখন ডান পা সাম্‌নে ও বাঁ পা পিছনে রেখেছিলেন, তখন ইমাম ক্রেমারের গর্দানে এমন হ্যাঁচ্‌কা মারলেন যে, ক্রেমার ইমামের ডান পাশ দিয়ে পিছন দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন; আর ইমাম বিদ্যুৎবেগে ঘুরে গিয়ে পা বাড়িয়ে নেহাৎ অবহেলায় অর্থাৎ দাঁড়িয়ে থেকেই ক্রেমারকে উল্‌টিয়ে দিলেন! কিন্তু ক্রেমার সত্য সত্যই চিৎ হলেন কিনা বা তাঁর পিঠ মাটিতে ঠেকল কিনা সেই দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে ইমাম্ বখ্‌শ্‌ এমন একটা তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে সেখানে থেকে নেমে এলেন যার অর্থ ছিল, এইসব বাজে লোকের সংগে লড়তে আসাটা তাঁর মতো ভুবন বিজয়ী বীরের পক্ষে নেহাৎ অশোভন এবং মর্যাদাহানিকর!

কুস্তির সুরু থেকে ইমামের নিষ্ক্রান্তি মাত্র আধ মিনিটের মধ্যে ঘটেছিল। অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মধ্যস্থও অবশ্য ইমামকেই জয়ী ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু ন্যায় বিচারের দৃষ্টিতে দেখলে একথা বল্‌তেই হবে যে, ক্রেমার পরাজিত হননি। কেননা ক্রেমারের পিঠ যথাযথভাবে ভূতলবদ্ধ হয়নি। ইমাম সম্পর্কে প্রশ্ন করলে ক্রেমার কিন্তু খাঁটি বীরের মতো বলেছিলেন, "Yes, splendid, my double, unbeatenable!"

এর পরে ক্রেমার গামার সংগে লড়বার আর সুযোগ পান নি।

'জীবন্ত টিলা' কিং কং

জন কয়েক ইওরোপীয় ব্যবসায়ীর চেষ্টায় ১৯৩৭, ১৯এ ও ২০এ ডিসেম্বর কলিকাতায়, তথা বাংলা দেশে প্রথম 'অল-ইন্' কুস্তির প্রদর্শনী হয়। এক সময়ে সভ্য মানুষের চেষ্টায় গ্রীস থেকে 'প্যাংক্রাশন' এবং রোম সাম্রাজ্য থেকে 'গ্লাডিটরিয়' কুস্তি লোপ পেয়েছিল। কারণ তাঁরা তখন বুঝেছিলেন 'শক্তির পরীক্ষা' আর 'অমানুষিক' বা 'পৈশাচিক উন্মাদনা' এক কথা নয়। আজও সভ্য সমাজে এই নীতি স্বীকৃত হয়ে আস্‌ছে। কিন্তু পূর্বে যেমন, আজো তেমনি সভ্য সমাজের মধ্যেও এমন এক শ্রেণীর লোক বাস করছে, যারা অমানুষিকতা বা পৈশাচিক উল্লাসকেই বেশী পছন্দ করে এবং তারা নানা কায়দায় রং চাপিয়ে সভ্য সমাজের মধ্যেও সেই অমানুষিকতাকে চালানোর চেষ্টা করছে। বর্তমান যুগের 'অল্-ইন' কুস্তির ধারাটিও সেই রকম। পূর্বেই ব'লে এসেছি, এটির উদ্ভব হয়েছে অ্যামেরিকায় এবং সেই থেকে বহু অর্থের অপচয়ে এর প্রচারও চলেছে দিকে দিকে!

কলিকাতার গ্লোব থিয়েটারে এই 'অল্-ইন্' কুস্তির প্রদর্শনীতে যে দশজন মল্ল যোগদান করেছিলেন, তাঁদের সবাই ছিলেন শ্বেতাংগ। এঁরা ছিলেন যথাক্রমে হুংগারির কিং কং, রোমেনীয়ার জান্ ড্রাঘিশোম্, চেকোশ্লোভাকিয়ার এমার করসেংকো, বুল্‌গারিয়ার কন্‌স্টান্‌টিন্ বিল্‌শিউ, আল্‌বানিয়ার কন্‌ষ্টান্‌টিন্ ষ্টান্‌শিউ, জার্মানির অ্যাল্‌ফ্রেড্ বেল্‌গার্ড, অস্ট্রিয়ার আর্নল্ড্ ভেবার, তুরস্কের জীন্ রিজা বে্য, প্যালেষ্টাইনের জেজি গোল্ড্‌ষ্টেইন এবং বম্বের স্কট্।

এই উপলক্ষে কিং কংয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়টি চিত্তাকর্ষক হ'বে বলে মনে হয়।

কিং কংয়ের আসল নাম এমিল জাইয়া। পশ্চিম দেশে বিভিন্ন মল্ল, মুষ্টিক এবং শক্তিবীররা তাঁদের ব্যবসার সুবিধার জন্য বহু রং-বেরংয়ের বা বিদ্‌ঘুটে নাম গ্রহণ ক'রে থাকেন। 'কিং কং' নামীয় প্রসিদ্ধ ইংরেজী ছায়া-চিত্রখানি সারা পৃথিবীতে যখন অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, এমিল জাইয়া তখন বুদ্ধি ক'রে ঐ নামখানি নিজে গ্রহণ করেন এবং ছবির কিং কংয়ের সংগে কিছু সংগতি রাখবার জন্য তিনি গোঁফ-দাড়ি রাখতে থাকেন। দেহটি অবশ্য তাঁর স্বাভাবিকভাবেই লোমস ও বিরাটাকৃতি হয়েছিল; এমন বিরাট যে তাঁকে 'জীবন্ত টিলা' বল্‌লে বেশী ভুল হবে না। অবশ্য কিং কংয়ের পূর্বেই অ্যামেরিকায় 'মানুষ পর্বত' (Man Mountain) ডীনের অভ্যুত্থান ঘটেছিল। তাঁর চেহারাও বিরাট ছিল এবং তিনিও দাড়ি-গোঁফ রাখ্‌তেন। যাক্।

কিং কংয়ের বাড়ী ছিল হুংগারিতে। বুদাপেস্ত নগরে তাঁর জন্ম হয়েছিল ব'লে তিনি বলেছিলেন। বাল্যকালে তাঁর দেহ সাধারণ রকমই ছিল। তাঁর বাবা নামজাদা মল্ল ছিলেন এবং মা একটা সার্কাসে গায়ের জোরের কস্‌রৎ দেখাতেন। মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও তাই সার্কাসে তিনি 'জোয়ান মরদ' (Strong Man) নামেই পরিচিত ছিলেন। কিং কংয়ের দুই দাদাও প্রসিদ্ধ বলী ও কুস্তিবীর ছিলেন। তবে এই বিষয়ে কিং কংয়ের খ্যাতি ছিল সব চেয়ে বেশী।

গোড়ার দিকে কিং কংয়ের চেহারা সাধারণ রকম হ'লেও বংশের ধারা বজায় রাখবার জন্য তাঁর বাবা তাঁকে নিয়মিতভাবে ডন-কুস্তি শিক্ষা দিতে থাকেন। দেখতে দেখতে ১৮।১৯ বছর বয়সের মধ্যে শক্তি ও দৈহিক বৃদ্ধিতে কিং কং বিশাল হ'য়ে উঠলেন। অবশ্য বিশালতায়

তিনি তাঁর বড় দাদার সমান কখনো হ'তে পারেন নি; তাঁর দাদার ভার ও দৈর্ঘ ছিল যথাক্রমে ৩৬৫ পাউণ্ড ও ৭৬ ইঞ্চি।

কিং কংয়ের মল্ল জীবনের প্রথম অবস্থায় তিনি গোটা কয়েক কুস্তিতে হেরেছিলেন ঠিকই। কিন্তু তার পরে ইওরোপে আর তিনি হারেন নি। ভারতবর্ষে তিনি আসেন প্রথম ১৯৩৭ অব্দে এবং এখানেও সাধারণ ভারতীয় মল্লরা তাঁকে আয়ত্ত করতে পারেন নি; সেইসব কুস্তিতে হয় তিনি জয়ী হয়েছেন, নয়তো সমান থেকেছেন। কিন্তু যেদিন তিনি হামিদ পালোয়ানের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন, সেদিন তিনি প্রথম বুঝতে পারলেন, "ভারতীয় কুস্তি এক আলাদা ব্যাপার!" আজো তাঁকে সবিস্ময়ে ভাবতে হয়, ঐ টুকুন ছোট্ট মানুষ কেমন ক'রে তাঁর মতো জীবন্ত পাহাড়কে আছাড় মারলেন! কেননা, কিং কং ও হামিদ পালোয়ানের মধ্যে দৈহিক ব্যবধান ছিল বিরাট,—ওজনে প্রায় দেড়শ পাউণ্ড এবং উচ্চতায় প্রায় ৮ ইঞ্চি! এই ব্যবধানের মাত্রা কি পরিমাণ ছিল, সেটা বুঝবার সুবিধার জন্য আমি এখানে উভয়ের মাপ পাশাপাশি তুলে দিচ্ছি।

১৯৩৩, ১০ই ডিসেম্বর আমি হামিদ পালোয়ানের মাপ নিয়েছিলাম; এখানে সেই মাপটিই দেবো। দুর্ভাগ্যের বিষয়, নানা কারণে কিং কংয়ের মাপ নেবার অবসর আমার হয়নি। কিং কংয়ের এই আংশিক মাপ কোনো একটি প্রসিদ্ধ ইংরেজি দৈনিক থেকে আমি সংগ্রহ করেছিলাম। মাপ দুটি এই:—

	হামিদ	কিং কং
ভার	২২০ পাউণ্ড	৩৫০ পাউণ্ড
দৈর্ঘ	৬৭$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি	৭৫ ইঞ্চি
গলা	১৬$\frac{৩}{৪}$,,	২৮ ,, (?)
বাহু (স্বাভাবিক)	১৫$\frac{৩}{৪}$,,	*
গোছা (,,)	১৩ ,,	*
	৭$\frac{৩}{৪}$,,	*
বুক (স্বাভাবিক)	৪৬$\frac{১}{৪}$,,	*
বুক (প্রসারিত)	৪৮$\frac{১}{২}$,,	৫৭ ইঞ্চি
কটি	২৮	*
পাছা	৪২ ,,	*
উরু	২৬$\frac{১}{২}$,,	*
হাঁটু	১৬$\frac{১}{৪}$,,	*
মোচা (সংকুচিত)	১৫$\frac{[illegible]}{৪}$,,	*
নলি	৯$\frac{৩}{৪}$,,	*

আমার বিশ্বাস, কিং কংয়ের পেটের মাপ ৫০ ইঞ্চির ওপরে ছিল। তাঁর রাক্ষুসে খাওয়াও দেখবার মতো ছিল! কিন্তু তাঁর প্রচারিত প্রাত্যহিক খাদ্য তালিকাটি অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য মনে হবে। যেমন :—

ব্রেক্ ফাষ্ট (প্রভাতী ভোজন)

৪৮টি সিদ্ধ ডিম
৩টি ছোট মুরগীর রোষ্ট
২ পাউণ্ড শূয়ারের মাংস
২ পাউণ্ড মাখন
৩টি কাঁচা ডিম মিশিয়ে
১ কোয়ার্ট দুধ
১ পেগ্ ব্র্যাণ্ডি

লাঞ্চ (মধ্যাহ্ন ভোজন)

৫ পাউণ্ড গরুর মাংস
৩টি বড় মুরগীর রোষ্ট
২টি পূর্ণ থালা ঝোল
১২টি মর্তমান কলা
৬টি কমলা
১ পাউণ্ড মাখন
৩টি কাঁচা ডিম মিশিয়ে
১ কোয়ার্ট দুধ

ডিনার (সান্ধ্য ভোজন)

৫ পাউণ্ড গরু বা শূয়ারের মাংস
৩টি বড় মুরগীর রোষ্ট
২টি পূর্ণ থালা ঝোল
১২টি মর্তমান কলা
৬টি কমলা

১ পাউণ্ড মাখন
৩টি কাঁচা ডিম মিশিয়ে
১ কোয়ার্ট দুধ
৫০টি সিদ্ধ ডিম

মনে রাখা দরকার, এই সবের সংগ্নে প্রত্যেক বেলাই তাঁকে আনুপাতিক শাক-শব্জি খেতে হোত যার আনুমানিক ওজন অন্তত ৪।৫ পাউণ্ড হবার কথা।

অবশ্য তাঁর প্রদত্ত এই খাদ্য তালিকাটি বেশ কিছুটা অতিরঞ্জিত হওয়াই সম্ভব। কিন্তু মুস্কিল এই যে, তাতে সন্দেহ প্রকাশ করবারই বা উপায় কি? সন্দেহজনক দৃষ্টিতে তাকালেই তিনি হেসে বলবেন, "বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি! বেশ, বেশ, আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে বল্‌বো না, মিষ্টার! তুমি বরং আমাকে একটা হোটেলে নিয়ে এখুনি পরীক্ষা করো, কেমন?" কাকেও তাঁর খাওয়ার ফর্দ বিশ্বাস করানোর এই প্রস্তাব বা উপায় অমোঘ। তাতে যে-কোনো ব্যক্তিই একটু চিন্তিত হ'তে বাধ্য। এই অপ্রস্তুত অবস্থায় আপনি হয়তো কিং কংয়ের আকস্মিক উচ্চ একটি 'হাঃ হাঃ হাঃ' হাসির দমকে চমকে উঠবেন! সংগে সংগে কিং কং তাঁর বিরাট থাবা দিয়ে আপনার কাঁধে মৃদু আঘাত করতে করতে বল্‌বেন, "খুব ব্যয় সাপেক্ষ বুঝি! থাক্, থাক্—ঘাবড়িও না বন্ধু!"

কিং কংয়ের খাওয়ার বহর প্রসংগে একজন বাঙালী তরুণের কথা মনে এলো। ইনি ভারতের 'জিম্‌নাস্টিক্ কিং' প্রসিদ্ধ নরেন গলের ছাত্র অজিত কোটাল। অজিত অ-পেশাদার বলী। শক্তির কাজ স্বরূপ তিনি লোহার বলের খেলা দেখিয়ে থাকেন। তাঁর খাওয়ার বহরও বিরাট এবং তা আমি নিজে না দেখলে হয়তো বিশ্বাস করতাম না; এই

ব্যাপারে তিনি নিঃসন্দেহে কিং কংয়ের জোড়া। তাঁকেও একদিন তাঁর খাওয়ার শেষ সীমানা কি, জিজ্ঞাসা করে লজ্জিত হয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, আমি যেখানে নিয়ে সীমানা বেঁধে দেবো, তিনিও সেখানে গিয়েই থামবেন, তার আগে নয়।

অজিতের দেহখানাও অবশ্য বিশাল; তবে তাঁর ভোজন পটুতার তুলনায় তা কিছুই নয়।

দৈনন্দিন জীবনে কিং কং সত্যই অত্যন্ত রসিক, আমুদে এবং চমৎকার লোক। কথায় কথায় তিনি লোককে হাসিয়ে মারবেন! তিনি বলেন, রাস্তায় বার হওয়া তাঁর পক্ষে মুস্কিল। ছেলেরা তাঁর পিছনে লাগে! তাদের জ্বালায় টিকতে না পেরে চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ হয়তো ফিরে দাঁড়িয়ে তিনি ভেংচি কাটেন, কিংবা তাদের ধরবার ভয় দেখান! ভয়ে ছেলেরা তখন পড়ি-মরি ব'লে ছোটে! অবশ্যি তাতে কাজ না হ'লে অগত্যা কিং কং নিজেই ট্যাক্সিতে উঠে পালান! আবার সময়ে নাকি তাঁকে দেখে ট্যাক্সিওয়ালাও ট্যাক্সি নিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালায়—হয়তো বা ছবির 'কিং কং' মনে ক'রেই! অথবা হয়তো তাঁর ভারে গাড়ী ভেংগে যাবার আশংকায়!

পেশাদার মল্ল হিসাবে কিন্তু কিং কং পূরাদস্তুর হিসেবী; সেখানে দেনা-পাওনায় তিনি পাকা লোক—কোনো ভুল ঘটে না।

আর মল্লক্ষেত্রে তিনি নিষ্ঠুর, হিংস্র, অমানুষ। অন্তত 'অল্‌-ইন্‌' কুস্তির ক্ষেত্রে তাঁকে যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা এই কথা স্বীকার করতে বাধ্য। মান্দ্রাজে একবার এমনি এক প্রতিযোগিতার সময়ে মধ্যস্থের রায়ে ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি তাঁকে পর্যন্ত থাব্‌লা দিয়ে ধ'রে মঞ্চের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন! ইদানিং 'অল্‌-ইন্‌' কুস্তির নাম বদলানো হয়েছে—এখন ওটা 'অ্যামেরিকান্‌ ফ্রী স্টাইল' নামে চল্‌ছে। এইজন্যই সভ্য

মানুষের দাবি যে, যে পৈশাচিক কুস্তি একটা সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষকে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে একটা হিংস্র জানোয়ারে রূপান্তরিত করতে পারে, তাকে অবিলম্বে বন্ধ করা হোক।

কলিকাতার 'দংগল'

১৯৩৮, জানুয়ারি মাসে মিঃ মার্টিন কলিকাতায় আর একটি কুস্তির দংগলের অনুষ্ঠান করেছিলেন। ২২এ জানুয়ারি সন্তোষের মহারাজা তার উদ্বোধন করেন। প্রথম দিনই ইংল্যাণ্ডের খ্যাতনামা মল্ল মিচেল্ গিলের মধ্যস্থতায় 'অল্-ইন্' প্রথায় তিনটি আন্তর্জাতিক কুস্তি হয়। তিন চক্রের প্রতি চক্র ৭ মিনিট ঘোষণা করা হয় এবং একজনকে গদীতে ৪ সেকেণ্ড চিৎ ক'রে রাখতে হবে বলা হয়। তাছাড়া এই দিনকার কুস্তিতে শুধু 'চুল টেনে ছেঁড়া' নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

প্রথম কুস্তি হয় জলন্ধরের সর্দার খাঁ ও পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার আর্টি কাউন্সেলের মধ্যে। সর্দারের দেহ ছিল মেদবহুল, আর কাউন্সেলের শরীর ছিল দৃঢ়বদ্ধ, পৈশিক। প্রথম চক্রে তিন মিনিটের মধ্যে কাউন্সেল সর্দারকে তিনবার ধরাশায়ী ক'রেছিলেন বটে, তবে কোনবারেই তিনি ৪ সেকেণ্ড চেপে রাখ্‌তে পারেন নি। এর পরে কাউন্সেল সর্দারের হাত ও হাতের আংগুল মুচ্‌ড়ে তাঁকে বাগে আনবার চেষ্টা করতে থাকেন।

দ্বিতীয় চক্রে সর্দার পাল্টা কাউন্সেলকে আক্রমণ করতে থাকেন; একবার তিনি কাউন্সেলের বাঁ হাত ধ'রে 'ধোবীপাট' ক'সে চিৎ করেছিলেন; কিন্তু মুহূর্ত মধ্যে কাউন্সেল ঘুরে যান এবং সর্দারের দুটো

কান ধ'রে এক অভিনব কৌশলে দাঁড়িয়ে যান! পরক্ষণেই এক সাংঘাতিক ঝট্‌কায় তিনি সর্দারকে দূরেও ফেলে দেন।

তৃতীয় চক্রেও সর্দারই আক্রমণ চালালেন এবং কাউন্সেলকে মাটিতে আছড়ে ফেলে দুই হাঁটুর চাপে তাঁর মাথাটাকে ধ'রে রাখলেন। অনেক কষ্টে অস্ট্রেলিয়ান নিজেকে মুক্ত করলেও সংগে সংগে সদারের গোটা কয়েক 'রদ্দা' খেয়ে টল্‌তে লাগলেন। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে সহসা তিনি 'ফ্লাই মেয়ার' (ধোবীপাট) প্রয়োগ ক'রে সর্দারকে ভূপাতিত করেন এবং সেই অবস্থায় যখন তিনি সর্দারকে চিৎ করবার জন্যে সচেষ্ট ছিলেন, তখন কুস্তি শেষ হয়ে যায়। অতএব এই যুদ্ধটিকে সমান ব'লে ঘোষণা করা হোল।

দ্বিতীয় যুদ্ধে ইতালির টনি লা মারোর প্রতিদ্বন্দ্বী পঞ্জাবের অজগর সিং উপস্থিত না থাকায় পঞ্জাবের অন্যতম মল্ল জগত সিংকে মারোর বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয়েছিল। এইদিন মারো অতিশয় নিন্দনীয় মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন।

কুস্তির সুরুতেই জগত মারোকে এক আছাড় মারেন ; কিন্তু মারো ক্ষিপ্রবেগে উঠেই জগতকে পাণ্টা এমন জোরের সংগে ছুঁড়ে মারেন যে, জগত মঞ্চের দড়ি গলিয়ে একদম নীচে পড়ে যান। জগত ফিরে আসবার পরে দুজনের মধ্যে বেশ এক চোট 'রদ্দা মারামারি' হয়ে যায়।

দ্বিতীয় চক্রে জগত মারোকে এমনভাবে আক্রমণ করেছিলেন যে, মারো হন্তদন্ত হয়ে চতুর্দিকে ছুটাছুটি করতে থাকেন ; প্রতি মুহূর্তেই তাঁর পরাজয়ের আশংকা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত একটি 'ধোবী পাটের' কবলে প'ড়ে তাঁকে এক প্রচণ্ড আছাড়ও খেতে হয়।

তৃতীয় চক্রে পরাজিত হবার ভয়ে গোড়া থেকেই মারো রুদ্রমূর্তি ধারণ করেন। 'চুল টানা' নিষিদ্ধ থাকা সত্বেও মারো প্রথমেই এক হাতে

জগতের চুল টেনে ধ'রে আর একহাতে সোজাসুজি একটি ঘুসি চালিয়ে দেন। জগত মারোর 'মার'কে অগ্রাহ্য ক'রে তাঁর ঘাড়টিকে ঠেসে ধরেন এবং মারোর বাঁ হাতখানাকে দুপায়ের মধ্যে এমনভাবে চেপে ধরেন যে মারো যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করতে থাকেন। মারো তখন আত্মসমর্পণ করতে চান কি-না, মধ্যস্থ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে অস্বীকার করেন। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পরে তিনি নিজের হাত মুক্ত করতে সমর্থ হন। এইবার মারো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এবং সম্পূর্ণ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যখন তিনি জগতকে আক্রমণ করলেন, তখন কুস্তির শেষ ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল। কিন্তু মারো তখন রাগে সমস্ত রীতিনীতি ভুলে গেছেন; তাই কুস্তির শেষে নিয়মানুযায়ী প্রতিদ্বন্দ্বীর সংগে তিনি বন্ধুত্বমূলক করমর্দন না করেই মঞ্চ ছেড়ে চ'লে যাচ্ছিলেন। সেই অবস্থায় মধ্যস্থ তাঁকে জগতের সংগে করমর্দনের কথা স্মরণ করিয়ে দেন; কিন্তু তিনি মধ্যস্থের নির্দেশকেও অমান্য ক'রে ক্ষিপ্তভাবে মঞ্চ থেকে লাফিয়ে পড়লেন!

ঘৃণ্যতম মল্ল চিয়ুং

১৯৩৮, ২২এ জানুয়ারি তৃতীয় কুস্তিটি হয় পঞ্জাবের মেহের সিং ও চীনের ওয়াং বক্‌ চিয়ুংয়ের মধ্যে। এই যুদ্ধে চিয়ুং জয়ী হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তিনি সেদিন যে জঘন্য বর্বরতার পরিচয় দিয়েছিলেন, আজ পর্যন্ত বিদেশী আর কোনো মল্লই ভারতে এসে তা করেন নি।

প্রথম চক্রে মেহের বেশ কায়দা মতো বার কয়েক চিয়ুংকে নীচে ফেলেন। চীমা চ'টে গিয়ে তখন নিষেধ সত্ত্বেও থাবলা দিয়ে মেহেরের

বাব্‌রি চুল ও লম্বা দাড়ি ধ'রে ঝাঁকানি দিতে সুরু করেন। মধ্যস্থ গিল্‌ নিজে তখন তা ছাড়িয়ে দিয়ে তাঁকে সাবধান করে দিলেন।

দ্বিতীয় চক্রেও মেহের চিয়ুংকে নীচে ফেলেন এবং তাঁকে মাথার ঢুঁসে বে-দম করতে প্রয়াসী হন। যাতনায় তখন চীনাকে বার দুই চাপা আর্তনাদ করতেও শোনা গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ চীনা নিজেকে মেহেরের কবলমুক্ত ক'রে নিলেন এবং সরোষে মেহেরকে গর্দান ধ'রে দড়ির কাছে নিয়ে গেলেন।

পর মুহূর্তেই দুইটি দড়ির সাহায্যে বিদ্যুৎবেগে মেহেরের গলায় ফাঁস লাগিয়ে তিনি এমনভাবে কসতে লাগলেন যে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে মেহের কিছুটা নিস্তেজ হয়ে পড়লেন। মধ্যস্থ মহাবলী গিল্‌ তখন খুবই বেগ স্বীকার করে এই বিপদ থেকে মেহেরকে মুক্ত করে দেন। ছাড়া পেয়ে মেহেরও পাল্টা আক্রমণ করে চীনাকে শূন্যে তুলে ফেলেন এবং প্রচণ্ড জোরে মঞ্চের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেন।

নিয়মানুযায়ী কোনো প্রতিযোগী কুস্তির সময়ে নিক্ষিপ্ত হয়ে বা অন্য যেভাবেই হোক, মঞ্চের বাইরে গিয়ে ১০ সেকেণ্ডের মধ্যে ফিরতে না পারলে তাকে পরাজিত গণ্য করা হয়। এক্ষেত্রে ৪ সেকেণ্ড গোণার পরেই চিয়ুং মঞ্চে ফিরে এসেছিলেন; এসেই তিনি প্রথম মেহেরের হাতের আংগুল চিরে ফেলবার চেষ্টা করেন। তারপরে দেহের যেখানে-সেখানে চিমটি কেটে, এবং নিজের মুঠো, কনুই, হাঁটু এবং গোঁড়ালির আঘাতে মেহেরকে ঘায়েল করতে সচেষ্ট হলেন।

তৃতীয় চক্রে চিয়ুং মেহেরকে নীচে ফেল্‌তে সমর্থ হন এবং ক্ষিপ্রহাতে দুটি পা ধ'রে তাঁকে শূন্যে তুলে চতুর্দিকে সাংঘাতিকভাবে ঘোরাতে থাকেন। অবস্থা দেখে মনে হয়েছিল, আমরা যেনো হঠাৎ চার হাজার বছর পিছিয়ে অর্ধ বর্বর যুগে গিয়ে পৌছেছি এবং জরাসন্ধ ও জীমূত বধের

'ভীমসেনী কুস্তি' দেখ্‌ছি, যে লড়াইয়ে ভীমসেন জরাসন্ধ ও জীমূতকে ঠিক এমনিভাবে 'একশ পাক' দিয়েছিলেন! এর ফলে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মেহের আবার নিস্তেজ হয়ে পড়লেন! এই অবস্থার সম্যক সুযোগ নিয়ে অর্থাৎ ঘোরাতে ঘোরাতেই চিয়ুং মেহেরকে পুনরায় প্রচণ্ড আছাড়ে নীচে ফেললেন এবং অনায়াসে তিনি তাঁকে চিৎ করতেও সমর্থ হলেন।

কিন্তু চীনা মল্ল তখন এমনি উন্মত্ত হয়েছিলেন যে, বিজয়-সূচক বাঁশী শোনার পরেও তিনি মেহেরকে ছাড়লেন না; বরং ধরাশায়ী মেহেরকে উপর্যুপরি লাথি মারতে লাগলেন। ফলে মেহেরও চটে গিয়ে চিয়ুংকে পাল্টা আক্রমণ করলেন। তখন মিচেল্ গিল্ তাঁর সহকারীদের সাহায্যে অতি কষ্টে চিয়ুং-মেহেরের এই 'ষণ্ড-যুদ্ধ' থামিয়ে দেন। এই হচ্ছে 'অল্-ইন্' বা 'অ্যামেরিকান্ ফ্রী ষ্টাইল্' কুস্তির বর্বরোচিত প্রতিক্রিয়া যা সভ্য সমাজ কর্তৃক সব সময়েই ধিকৃত হয়ে আস্‌ছে।

এখানে মার্শাল চিয়াং কাইশেকের একান্ত ভক্ত এই চীনা পালোয়ানটির সামান্য পরিচয় দেওয়া দরকার।

কুস্তি-বিজ্ঞান সাধারণত কৌশল, দম এবং শক্তির ওপর ভিত্তি ক'রে উদ্ভাবিত হয়েছে। এই তিনটি বিষয়ের যে-কোনো একটির অভাব ঘটলে কারু পক্ষে প্রথম শ্রেণীর মল্ল হবার সৌভাগ্য হয় না। চিয়ুংএর শক্তি ও দমের বিশেষ অভাব ছিল না বটে, কিন্তু কৌশলের ঝোলা ছিল তার শূণ্য। পৃথিবীতে বহু রকমের কুস্তির ধারা প্রচলিত আছে এবং তার ভাল-মন্দ সব রকম দিকই আছে। এমন কি, চীনের মংগোলিয়া এবং আফ্রিকার কংগো অঞ্চলের আদিম অর্ধশিক্ষিত সমাজেও তাদের নিজস্ব কুস্তির ঢং প্রচলিত আছে। সেইসব কুস্তির মধ্যেও কিছু কিছু হিংস্রতার পরিচয় পাওয়া যায় বটে, এবং তাতেও কৌশল অপেক্ষা গায়ের

জোরের ক্রিয়াকাণ্ডই বেশী বটে, কিন্তু 'অল্-ইন্' কুস্তির স্থান এই বিষয়ে সকলের ওপরে। বোধ হয়, সেইজন্যই চিয়ুং অন্যান্য কুস্তির চেয়ে 'অল্-ইন্' কুস্তিকেই বেশী পছন্দ করেন এবং এই নিয়মে তিনি বেশ দক্ষ মল্ল বটে। অন্যান্য কুস্তিতে তাঁর কোন দক্ষতার পরিচয় মিলে নি।

মল্ল হিসাবে তাঁর অবৈধ কাজের জন্য তিনি সর্বত্রই দুর্নাম অর্জন করেছেন এবং প্রায় সর্বত্রই ধিকৃতও হয়েছেন। বিশেষ ক'রে মঞ্চের পার্শ্ববর্তী দড়ির সাহায্যে প্রতিপক্ষের গলায় মারাত্মক ফাঁস পরাতে তিনি সিদ্ধহস্ত এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী; চোখের পলক ফেলবার পূর্বেই তিনি এই ক্রিয়াটি অত্যন্ত যোগ্যতার সংগে সম্পাদন করতে পারেন, এবং তা করছেনও নানা জায়গায় অসংখ্য বার।

১৯৩৭, নভেম্বর মাসে বম্বের দংগলে তিনি প্যালেস্টাইনের মল্ল জেজি গোল্ডস্টেইনের সংগে দৈহিক শক্তিতে না পেরে তাঁকেও ঠেলে এক কোণে নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রতি চক্র যুদ্ধের পরে প্রতিযোগীদের দেহের ঘাম মোছানোর জন্য যে-সব তোয়ালে থাকে, তার একখানা সেই কোণে খুঁটির সংগে ছিল। চিয়ুং পলকের মধ্যে সেই তোয়ালের দ্বারা পার্শ্ববর্তী দড়ির সংগে গোল্ডস্টেইনের গলায় ফাঁস পরিয়ে এমন কস্থনি দিয়েছিলেন যে, গোল্ডস্টেইনের মতো জোয়ান মল্লেরও জিব বেরিয়ে গিয়েছিল। সেদিনের যুদ্ধেও মধ্যস্থ ছিলেন এই মিচেল গিল্, এবং চিয়ুংয়ের এই বর্বর আক্রমণ থেকে গোল্ডস্টেইনকে রক্ষা করতে গিয়ে সেদিনও তাঁকে গলদঘর্ম হ'তে হয়েছিল।

হরবংশ সিংয়ের সংগে কুস্তির সময়েও চিয়ুং তাঁকে দুইটি দড়ির সাহায্যে ফাঁসী দিয়েছিলেন।

চিয়ুং দৈহিক শক্তিতে বলবান পুরুষ সন্দেহ নেই। কৌশল-বিজ্ঞানে তাঁর দখল থাকলে তিনি নিঃসন্দেহভাবে পৃথিবীর একজন উল্লেখযোগ্য মল্ল হতে পারতেন। তাঁর দৈহিক উচ্চতা ৭১ ইঞ্চি, এবং ওজন ২৩৫ পাউণ্ডের মধ্যে।

শোচনীয় উদাসীনতা

কলিকাতা দংগলের দ্বিতীয় দিনে ২৭ এ জানুয়ারি আর্টি কাউন্সেলের মধ্যস্থতায় টনি লা মারো পঞ্জাবের ইউসুফ মোহাম্মদকে ‘ক্যাচ্চ্-অ্যাজ্ ক্যাচ্চ্-ক্যান্’ ঢংয়ের কুস্তিতে পরাজিত করেছিলেন। প্রথম দুই চক্র দুজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লড়লেও মোহাম্মদ মারোর সমকক্ষ ছিলেন না। তৃতীয় চক্রে মারো প্রতিপক্ষকে তড়িৎ গতিতে আক্রমণ করেন এবং তার ফলে মোহাম্মদ ৩৩ সেকেণ্ডে চিৎ হয়ে যান।

এই দিন ‘ক্যাচ্চ্-অ্যাজ ক্যাচ্চ্-ক্যান্’ ধারার দ্বিতীয় কুস্তিটি হয়েছিল ইংল্যাণ্ডের মিচেল্ গিল্ ও কর্তার সিংয়ের মধ্যে। কুস্তির সুরু থেকেই অনুমান করা গিয়েছিল যে, এই যুদ্ধে কর্তার গিলের কাছে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারবেন না। কার্যত তা-ই হয়েছিল। প্রথম চক্রের ৩ মিনিট ৫৩ সেকেণ্ডে গিল্ কর্তারকে মারাত্মক ‘বোস্টন্ ক্র্যাব্’ প্যাঁচ দ্বারা পরাজয় স্বীকারে বাধ্য করেছিলেন। এই প্যাঁচের ফলে কর্তার মেরুদণ্ডে বিষম চোট পান এবং সংগে সংগে তাঁকে স্টেচারে শুয়ে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল।

মিচেল্ গিলের বাড়ী ইংল্যাণ্ডের ইয়র্ক শায়ারে। মল্ল হিসাবে তাঁর খ্যাতি মন্দ নয়; কিন্তু শান্ত মেজাজে কুস্তি লড়ার জন্য তাঁর জনপ্রিয়তা সমধিক। পরবর্তী সময়ে মল্ল হিসাবে তিনিও একটি মজার নাম নিয়েছিলেন,—সেটি হোল ‘রেড্ স্করপিয়ন্’ অর্থাৎ ‘লাল বিছে’।

তৃতীয় কুস্তিটি হয়েছিল ‘অল্-ইন’ প্রথায়; তাতে প্রতিযোগী ছিলেন ওয়াং বক্ চিয়ুং এবং সর্দার খাঁ। এই যুদ্ধটি সমান ছিল। অন্যান্য দিন অপেক্ষা এই দিন চৈনিক মল্ল অনেকটা সংযতভাবে লড়াই করেছিলেন এবং মধ্যস্থ কর্তৃক ‘মাত্র বার কয়েক’ সতর্কিত হয়েছিলেন।

২৯এ জানুয়ারি ক্যাচ্-অ্যাজ ক্যাচ-ক্যান্ ঢংয়ে আর্ট কাউন্সেল্ দ্বিতীয় চক্রের ১ মিনিট ২৫ সেকেণ্ডে পঞ্জাবের অজগর সিংকে হারিয়েছিলেন।

৩০এ জানুয়ারির কুস্তিতে একটি অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে যা দংগল-পরিচালকদের দুর্ব্যবস্থা ও শোচনীয় দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছিল। এই দংগলে গোড়া থেকেই বৈদেশিক ঢংয়ে প্রতিযোগিতাগুলি হচ্ছিল যদিও কোনো কুস্তির ঢংই পূর্ব থেকে স্থিরীকৃত হোতনা। ভারতীয় মল্লরাও প্রথমাবধি বিদেশী প্রথায় লড়ে ভেবে নিয়েছিলেন, দংগলের শেষ দিন পর্যন্ত হয়তো এই রকম বিদেশী ঢংয়েই লড়তে হবে। কিন্তু ৩০এ জানুয়ারি টনি লা মারো এবং মেহের সিং প্রতিযোগিতা করার জন্য মঞ্চের ওপর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াবার পরে কুস্তিটি 'ভারতীয় ঢং'য়ে ৩০ মিনিট হবে বলে ইংরেজি ভাষায় 'মাইকে' ঘোষণা করা হোল। মারো তখন ভারতীয় প্রথার জন্য তৈরী হলেন বটে, কিন্তু মেহের ইংরেজী না জানায় তিনি তা বুঝতে পারলেন না, ভারতীয় নিয়মে লড়ার জন্য প্রস্তুতও হলেন না। তার ফলে সেদিন মেহেরকে মাত্র ২৪ সেকেণ্ডে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল!

এইসব আন্তর্জাতিক কুস্তির ক্ষেত্রে যেখানে জাতির কতকটা মর্যাদার সংগে ব্যক্তিগত হার-জিত ও আর্থিক লাভালাভের প্রশ্নও জড়িত, সেখানে কর্তৃপক্ষের এই শোচনীয় উদাসীনতা শুধু দায়িত্বজ্ঞানহীনতাই নয়, অমার্জনীয় অপরাধ। কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল পরিবর্তিত নিয়মের কথা 'মাইকে' ঘোষণা করার পরেও ব্যক্তিগতভাবে উভয় প্রতিযোগীকে সেই কথা বুঝিয়ে বলা। তাহলে আর এরূপ অঘটন ঘটতো না এবং উভয় প্রতিযোগীর সত্যিকার শক্তির পরীক্ষাও হ'তে পারত।

কলিকাতায় প্রথম মহিলা মল্ল

৬ই ফেব্রুয়ারি বিকানীরের নাথু সিং এবং আর্টি কাউন্সেলের মধ্যে একটি কুস্তি হয়। অনেকের ধারণা হয়েছিল, এই কুস্তিটি বিশেষ উপভোগের হবে। কিন্তু কার্যকালে তা হয়নি। প্রথম চক্রের মাত্র ১ মিনিট ১২ সেকেণ্ডেই নাথু সিং 'ধোবী পাটে'র সাহায্যে কাউন্সেল্‌কে চিৎ ক'রে ফেলেছিলেন।

বাস্তবিক পক্ষে, ২২ এ জানুয়ারি থেকে প্রতি শনি ও রবিবারে এই কুস্তির দংগল অনেক দিন পর্যন্ত চলেছিল। সবগুলি লড়াই উল্লেখযোগ্য ছিলনা এবং শেষের দিকের লড়াইগুলি 'নামকাওয়াস্তে' হয়েছিল বলা চলে। তবে ৫ই মার্চ কলিকাতার কুস্তিপ্রিয়রা একটি নতুন ধরনের কুস্তি দেখেছিল। এই কুস্তিতে একজন পুরুষ প্রতিযোগীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন মধ্য ভারতের মহিলা মল্ল ওমেদা বানু এবং ওমেদা তাঁকে পরাজিতও করেছিলেন, যদিও সে ব্যক্তি তেমন প্রসিদ্ধ বা দক্ষ মল্ল ছিলেন না। বস্তুত বাংলা দেশে নারী-পুরুষের প্রকাশ্য পেশাদারি কুস্তি প্রতিযোগিতা এটাই ছিল প্রথম।

করাচি দংগল

১৯৩৯ অব্দের এপ্রিল মাসে নিখিল ভারত 'কুটির শিল্প প্রদর্শনী' উপলক্ষে করাচি সহরেও একটি কুস্তির দংগল হয়। এখানেও অধিকাংশ কুস্তিতে ভারতীয় মল্লরাই পরাজিত হয়েছিলেন।

১৯ এ এপ্রিল গোল্ড্‌স্টেইনের সংগে লাহোরের হানিফ পালোয়ানের পাঁচ চক্র সমান কুস্তি হয়। ত্যজব সিংয়ের সংগেও গোল্ডষ্টেইন সমান সমান লড়েছিলেন।

পঞ্জাবের নূর মোহাম্মদ আর্ট কাউন্সেলের হাতে মার খান এবং টনি লা মারোর হাতেও তিনি পরাজিত হন। লাহোরের তরুণ মল্ল ভেলোও মারোর কাছে তিন চক্রে পরাভব স্বীকার করেন।

কিং কংয়ের সংগে ভেলো এবং মংগল সিংয়ের কুস্তি হয়। দুটি কুস্তিতেই কিং কং জয়ী হন; মংগলকে পরাস্ত করতে কিং কংয়ের এক মিনিট সময়ও লাগে নি।

পঞ্জাবের ভাগল সিং একদিন কিং কংকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করেন; কিং কং সে আহ্বান গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের এই বিশেষ কুস্তিতেও কিং কং সহজেই জয়লাভ করেছিলেন।

২৬এ এপ্রিল হানিফ পালোয়ানের সংগে ক্রেমারের কুস্তি হয়; তাতে ক্রেমার অতি সহজে হানিফকে পর্যুদস্ত করেছিলেন।

এখানে ভেলো পালোয়ান সম্পর্কে দুই একটি কথা বলা দরকার। ভেলো প্রসিদ্ধ ইমাম্ বখশের জ্যেষ্ঠ পুত্র, আসল নাম মঞ্জুর হুসেন। ১৯২১ অব্দে তাঁর জন্ম হয়; করাচির দংগলে যখন তিনি নামেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৭ বছর পেরিয়েছে। অতএব সেই তরুণ বয়সে তাঁর চেয়ে অনেক বেশী বয়স্ক ও অভিজ্ঞ পালোয়ানদের কাছে তাঁর পরাজয় তেমন কিছু অগৌরবের হয়নি। পরে ভেলোর আরো উন্নতি হয়েছে শুনেছি এবং তাঁকে ক্রমশ পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ মল্ল ব'লে স্বীকার করা হচ্ছে।

১৯৩৩ অব্দে আমি যখন কলিকাতায় চুণীলাল গোয়ালার আখড়ায় কুস্তি অভ্যাস করছিলাম, তখন গামার দলও সেখানে কিছুদিন কুস্তির মহড়া দিয়েছিল। সেই সময়ে মঞ্জুর ১২ বছরের বালক মাত্র। আর প্রসিদ্ধ পালোয়ান দীন মোহাম্মদের ছেলে গোলাম মোহাম্মদের বয়স ছিল ১৪ বছর। মঞ্জুর ও গোলাম এক জোড়ে প্রত্যহ কুস্তি লড়তেন। তখনি দেখেছিলাম, এঁরা দুজনে এক ঘণ্টা-দেড় ঘণ্টা পর্যন্ত লড়তেন।

এঁরা তখন গোবরবাবুর পরিচালনায় শ্রীরংগমেও কুস্তির প্রদর্শনী দিয়েছিলেন এবং দর্শকরা তাঁদের কুস্তি দেখে খুব খুসীও হয়েছিলেন। আমার তখন মনে হয়েছিল, সুযোগ পেলে গোলাম ও মঞ্জুর বড় দরের মল্ল হতে পারবেন যদিও ৪০।৫০ বছর আগেকার ভারতীয় মল্লদের মান স্পর্শ করা তাঁদের র কারু পক্ষে সম্ভব বলে আমার মনে হয় নি।

ভারতে প্রথম মল্ল-মুষ্টিক সংঘর্ষ

এবার একটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক লড়াইর বিবরণ দেব; সেটি মল্ল-মুষ্টিক সংঘর্ষ। অবশ্য ইতিপূর্বে এই ধরনের লড়াই পৃথিবীর অন্যান্য দেশে অনেকবার হয়েছিল এবং প্রায় সব সময়ে মল্লরা জয়লাভ করেছিল। কিন্তু আমাদের দেশে অনেকেই সেকথা জানত না। বরং তাদের ধারণা ছিল, মল্ল-মুষ্টিক সংঘর্ষে মুষ্টিকরাই জয়ী হতে পারে। তাই ১৯৪০, ৯ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতার গ্লোব থিয়েটারে এরূপ একটি লড়াইর ব্যবস্থা হয়। এই যুদ্ধে একদিকে ছিলেন যুক্ত প্রদেশের প্রসিদ্ধ মল্ল প্রিন্স রঞ্জি, আর অন্যদিকে ছিলেন সুদূর প্রাচ্যের একচ্ছত্র মুষ্টিবীর ফ্রাংক মেলিনো। এ ধরনের প্রতিযোগিতা ভারতে এটাই প্রথম।

প্রিন্স রঞ্জি ছিলেন আগ্রার অধিবাসী। এই যুদ্ধের পূর্বে মল্ল হিসাবে অ্যামেরিকায় সুনাম অর্জন ক'রে থাকলেও দেশে তিনি তেমন খ্যাতির প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি যদিও পলবান হিসাবে তিনি নিঃসন্দেহভাবে একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন।

পক্ষান্তরে মেলিনো চীন, জাপান, ফরমোজা, ফিলিপাইন, যাভা, সুমাত্রা, বোর্নিও, ইন্দোচীন, শ্যাম, মালয় ইত্যাদি পূর্ব এশিয়ার প্রায়

সমস্ত দেশের প্রায় সর্বত্র জয়ী হয়েছিলেন। ১৯২৯ অব্দে ভারতবর্ষে এসে অবধি এখানকারও বহু বড় বড় মুষ্টিককে তিনি পরাভূত করেছিলেন। একমাত্র নিগ্রো মুষ্টিক গান্ বোট্ জ্যাক্ ছাড়া এখানেও তাঁর যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। গান্ বোট জ্যাক ছাড়া দক্ষিণ ভারতের আর একজন মুষ্টিক, আর্থার সোরেজও অবশ্য একবার মেলিনোকে বিশেষ বেগ দিয়েছিলেন। ১৯৩৯, ৫ই মে কলিকাতায় বেহালার 'গ্রে হাউণ্ড রেসিং স্ট্যাডিয়ামে' সোরেজ মেলিনোর বিরুদ্ধে তিন মিনিটের বারো চক্র মুষ্টিযুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন এবং আট চক্র তিনি সমানই লড়েছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে দড়ির ধারে লড়তে লড়তে সোরেজ দৈবাৎ দড়ি গলিয়ে নীচে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যান এবং পরাজিত গণ্য হন।

অনেকের ধারণা হয়েছিল, প্রিন্স রঞ্জি ও মেলিনোর লড়াইটি বেশ জমকালো হবে। তাই প্রতিযোগিতা পরিচালকবা পাঁচ মিনিটের পাঁচ চক্র অর্থাৎ ২৫ মিনিট লড়াই হবার কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু সমস্ত রকম উৎসাহ ও উত্তেজনার পরিসমাপ্তি ঘটল মাত্র দেড় মিনিটে যখন প্রিন্স রঞ্জি মেলিনোকে এক আছাড়েই ভূপাতিত করেছিলেন।

প্রারম্ভিক বাঁশীর শব্দ হতেই তাঁরা তাঁদের কোণ থেকে এগিয়ে এসে নমস্কারী দেন। তারপরে স'রে গিয়ে তুজনই তুজনকে আক্রমণ করবার জন্য নিজ নিজ কায়দায় পায়তাড়া দিতে থাকেন। মুষ্টিক তুহাতে ঘুসি বাগিয়ে এমনভাব দেখিয়ে ধীরে ধীরে চক্রাকারে ঘুরতে লাগলেন যে, একখানা হাত যদি দৈবাৎ মল্লের কবলিত হয়ও, তবেও যেনো দ্বিতীয় হাতের ঘুসি খেয়ে তাঁকে মাটিতে পড়তে হয়। প্রিন্স রঞ্জিও স্বাভাবিক ভাবেই যে কোন মুহূর্তে মেলিনো-নিক্ষিপ্ত ঘুসি ধরবার জন্য নিজের হাত তুখানি বাগিয়ে সমান তালে ঘুরতে লাগলেন। এইভাবে প্রায় দেড় মিনিট কেটে গেল। শেষে যে মুহূর্তে মেলিনো প্রথম ঘুসটি ছাড়লেন, সেই

মুহূর্তেই প্রিন্স রঞ্জি তাঁর সেই হাত ধরেই তাঁকে চিৎ করে ফেললেন। ঘড়ির কাঁটা তখন মিনিটের ঘর পার হয়ে ৩০ সেকেণ্ডের ঘরে এসেছিল মাত্র।

এই ঘটনায় সাধারণ দর্শকরা উল্লাসে মেতে উঠলেন বটে, কিন্তু মুষ্টিকরা উঠলেম ক্ষেপে! তাঁরা হৈচৈ করে বলতে লাগলেন যে, মেলিনো তাঁর ক্ষমতা দেখানোর কোনো সুযোগই পাননি—ফের যুদ্ধ হওয়া উচিত। কর্তৃপক্ষ তখন সর্বসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য প্রিন্স রঞ্জিকে আর একবার লড়তে অনুরোধ জানালেন। রঞ্জি বিনা দ্বিধায় রাজী হলে আবার দু চক্র খেলার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু এবারও এক চক্র খেলা হোল না।

একবার যুদ্ধ করেই প্রিন্স রঞ্জি মেলিনোর শক্তি আন্দাজ করে নিয়েছিলেন। তাই এবার ইচ্ছা করেই তিনি মেলিনোর সংগে একটু কৌতুককর খেলা সুরু করলেন। এবারও যখন মেলিনো আক্রমণ করলেন, প্রিন্স রঞ্জি তখুনি তাঁকে 'ধোবীপাটে'র দ্বারা আছাড় মারলেন! কিন্তু মেলিনো তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে প্রিন্স রঞ্জিকে পুনরাক্রমণ করলেন। প্রিন্স রঞ্জি তাঁকে জাপ্টে ধ'রে দ্বিতীয়বারের জন্য আছাড় মারলেন! ইচ্ছা করলে প্রিন্স রঞ্জি কিন্তু দুইবারই তাঁকে চিৎ করতে পারতেন। কিন্তু খেলাটাকে নেহাৎ উপভোগ্য করবার জন্যই তিনি তা করেন নি। দ্বিতীয় আছাড়ের পরে মেলিনো উঠতে-না-উঠতেই প্রিন্স রঞ্জি আর একটি হ্যাঁচকা টানে মেলিনোকে দূরে ছিট্‌কে ফেলে দিলেন।

তৃতীয় আছাড়ের পরে দেখা গেল, মেলিনো সত্য সত্যই নিরাশ হয়ে পড়েছেন এবং চতুর্থবার নিজে আক্রমণ না করে আক্রমণ ঠেকাবার আশায় দূরে দূরে পায়তাড়া করছেন! এতে দর্শকদের মনোভাব গেল বদ্‌লে, তাঁরা উল্লাসে হৈচৈ করতে লাগলেন। অনেককে উচ্চৈঃস্বরে

বলতে শোনা গেল, "Down with your boxing!" "Wrestling must win!" "Pin him down, Ranji!" কারণ তখন মল্ল-মুষ্টিক সংঘর্ষের ফলাফল লোকের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। প্রিন্স রঞ্জিও তখন আর কালক্ষেপ করলেন না!—বাঘের মতো লাফিয়ে পড়ে তিনি মেলিনোকে ধরলেন এবং নিমেষ মধ্যে তাঁকে মঞ্চে চিৎ ক'রে রেখে এক হাত তুলে সমাগত দর্শকদের অভিনন্দন গ্রহণ করলেন।

শেষের যুদ্ধটিও ২ মিনিটেই শেষ হয়েছিল। মল্ল-মুষ্টিক সংঘর্ষ ইতিপূর্বে ভারতের বাইরে বহু জায়গায় বহু বার হলেও কোন মল্লই মুষ্টিককে এরূপ বারবার আক্রমণ করবার সুযোগ দিয়ে পরাজিত করেন নি।

প্রীতি-কুস্তি

অ্যাংলো-ভারতীয়দের উদ্যোগে এই বছর মার্চ মাসে কলিকাতার এম্পায়ার থিয়েটারে আর একটি আন্তর্জাতিক কুস্তির দংগল হয়; ২৯এ মার্চ থেকে ৫ই এপ্রিল পর্যন্ত এই কুস্তি চলেছিল। অবশ্য একে কুস্তি প্রতিযোগিতা না বলে প্রীতি-কুস্তি বলাই উচিত যদিও জয়-পরাজয়ের ভিত্তিতে বিজয়ীকে একটি স্বর্ণপদক সহ ৫০০৲ টাকা উপহার দেওয়া হয়েছিল।

এই কুস্তি প্রতিযোগিতায় বারোজন মল্লের মধ্যে মোট ৩১টি কুস্তি হয়েছিল; তার মধ্যে ৩০এ মার্চ ঠাকুর সিং ও মেহের সিংয়ের কুস্তি এবং ৩১এ মার্চ মংগল সিং ও বক্সী সিংয়ের কুস্তি হয়েছিল ভারতীয় প্রথায়; বাকী ২৯টি হয়েছিল 'অল্-ইন্' প্রথায় আন্তর্জাতিক লড়াই। অথচ বারো জন প্রতিযোগীর মধ্যে মাত্র চার জন ছিলেন ইওরোপীয়।

পাঠকের সুবিধার জন্য আমি এখানে তারিখ সহ প্রতিদিনকার আন্তর্জাতিক কুস্তিগুলি উল্লেখ করছি এবং বিজেতাকে ২, সমান বিবেচিতকে ১ এবং বিজিতকে ০ সংখ্যা দিয়ে সমগ্র প্রতিযোগিতাগুলির প্রকৃতিগত আলোচনা করবো।

২৯এ মার্চ, ১৯৪০

হরবংশ সিং	(২)	বনাম	গোল্ডষ্টেইন	(০)
কিং কং	(২)		বক্সী সিং	(০)
করসেংকো	(২)		মংগল সিং	(০)
ঠাকুর সিং	(১)		মিলানোভিচ্	(১)

৩০এ মার্চ, ১৯৪০

গন্দা সিং	(২)		গোল্ডষ্টেইন্	(০)
কিং কং	(২)		মংগল সিং	(০)
করসেংকো	(২)		বক্সী সিং	(০)

৩১এ মার্চ, ১৯৪০

হরবংশ সিং	(২)		মিলানোভিচ্	(০)
কিং কং	(২)		মেহের সিং	(০)
ঠাকুর সিং	(১)		করসেংকো	(০)

১লা এপ্রিল, ১৯৪০

গোল্ডষ্টেইন	(২)		বক্সী সিং	(০)
করসেংকো	(২)		মেহের সিং	(০)
গন্দা সিং	(১)		কিং কং	(১)
ঠাকুর সিং	(১)	,,	মিলানোভিচ্	(১)

২রা এপ্রিল, ১৯৪০

গন্দা সিং	(২)	বনাম	করসেংকো	(০)
কিং কং	(২)	,,	ঠাকুর সিং	(০)
গোল্ডষ্টেইন	(২)	,,	মংগল সিং	(০)
মিলানোভিচ্	(২)	,,	বক্সী সিং	(০)

৩রা এপ্রিল, ১৯৪০

গন্দা সিং	(২)	,,	মিলানোভিচ্	(০)
করসেংকো	(২)	,,	বক্সী সিং	(০)
গোল্ডষ্টেইন	(২)	,,	মেহের সিং	(০)

৪ঠা এপ্রিল, ১৯৪০

হরবংশ সিং	(২)	,,	করসেংকো	(০)
কিং কং	(২)	,,	ফতে সিং	(০)
মিলানোভিচ্	(২)	,,	মংগল সিং	(০)
ঠাকুর সিং	(১)	,,	গোল্ডষ্টেইন	(১)

৫ই এপ্রিল, ১৯৪০

করসেংকো	(২)	,,	মংগল সিং	(০)
গোল্ডষ্টেইন	(২)	,,	বক্সী সিং	(০)
রহমান সিং	(১)	,,	কিং কং	(১)
ফতে সিং	(১)	,,	মিলানোভিচ্	(১)

এইবার জয়-পরাজয়ের ভিত্তিতে প্রাপ্ত সংখ্যার হিসাবে কে কি স্থান লাভ করলেন, দেখা যাক্ ঃ—

প্রতিযোগীরা নাম	কুস্তি	জিত	হার	সমান	মোট সংখ্যা
১। কিং কং	৭	৫	০	২	১২
২। করসেংকো	৮	৫	২	১	১১

৩।	গোল্ডষ্টেইন	৭	৪	২	১	৯
৪।	গন্দা সিং	৪	৩	০	১	৭
৫।	মিলানোভিচ্	৭	২	২	৩	৭
৬।	হরবংশ সিং	৩	৩	০	০	৬
৭।	ঠাকুর সিং	৫	০	১	৪	৪
৮।	রহ্‌মান সিং	১	০	০	১	১
৯।	ফতে সিং	২	০	১	১	১
১০।	মেহের সিং	৩	০	৩	০	০
১১।	মংগল সিং	৫	০	৫	০	০
১২।	বক্সী সিং	৬	০	৬	০	০

ওপরোল্লিখিত তালিকা দুটি বিচার করলে স্পষ্টই দেখা যাবে, প্রথম স্থানাধিকারী কিং কং গন্দা সিং ও রহ্‌মান সিংয়ের সংগে কুস্তিতে জয়ী হতে পারেন নি; তাছাড়া তাঁকে হরবংশ সিংয়ের সংগেও লড়ানো হয়নি—অথচ নিম্নস্তরের মল্লদের সংগে তাঁকে বার বার লড়ানো হয়েছিল! আবার এমার করসেংকো এবং জেজি গোল্ডষ্টেইন যথাক্রমে গন্দা সিং ও হরবংশ সিংয়ের কাছে হেরে এবং ঠাকুর সিংয়ের সংগে সমান থেকেও বেশীবার লড়বার সুযোগ পাওয়ায় দিব্যি গন্দা সিং এবং হরবংশ সিংয়ের ওপরে জায়গা করে নিয়েছেন! সেই রকম বিস্কো মিলানোভিচ্ হরবংশ সিং ও গন্দা সিংয়ের কাছে হেরে এবং ঠাকুর সিংয়ের সংগে দুবার ও ফতে সিংয়ের সংগে একবার সমান থেকেও হরবংশ সিংয়েব ওপরে উঠে গেছেন! আসলে রহ্‌মান সিংকে একবারের বেশী লড়তে দেওয়া হয়নি যিনি নিঃসন্দেহভাবে করসেংকো, গোল্ডষ্টেইন ও মিলানোভিচের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ছিলেন। একথা অতি নির্বোধও বুঝতে পারে যে, কাকেও বেশী বার লড়বার সুযোগ দিলে

সে একাধিক কুস্তিতে হেরেও অন্যান্য কুস্তিতে সমান থাকলে তার সেই সংখ্যার যোগফল যে-ব্যক্তি কমবার লড়ে জয়ী হয়েছে, তার চেয়েও বেশী হতে পারে। মিলানোভিচ এবং হরবংশ সিংয়ের স্থান পর্যালোচনা করলেই একথা স্পষ্ট হয়ে যাবে। অতএব, এই দংগল কি উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তা অনুধাবন করা সাধারণ লোকের পক্ষে খুবই কঠিন।

পঞ্চম অধ্যায়

পরাজয়

(১৯৪১-১৯৫৬)

'ভারতীয় কুস্তি-প্রাধান্য' প্রতিযোগিতা

১৯৪১, ৩১এ জানুয়ারি থেকে ৩রা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কলিকাতার "কলিকাতা ফুটবল ক্লাবে' একটি বিরাট কুস্তির দংগল হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লিপ্ত তৎকালীন বৃটিশ সরকারকে সাহায্য করাই ছিল এই দংগল অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য এবং সেই উপলক্ষে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মল্ল নির্ণয় করাও অন্যতম লক্ষ্য ছিল। স্যর জাফর উল্লা খাঁয়ের অনুপস্থিতিতে বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ৩১এ জানুয়ারি এই দংগল উদ্বোধন করেছিলেন। মধ্যস্থের কাজ করেছিলেন সুপরিচিত মুষ্টিক বলাইদাস চট্টোপাধ্যায় এবং রামগড়ের মহারাজ কুমার। অবশ্য ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ মল্ল নিরূপণ করার জন্য এই দংগলের অনুষ্ঠান হলেও এখানে প্রত্যহই দু একটি আন্তর্জাতিক কুস্তিও হয়েছিল।

প্রথম দিন অর্থাৎ ৩১এ জানুয়ারি রোমেনিয়ার সম্পত বাবিয়ানের সংগে দ্বারবংগের আব্দুল হকের কুস্তি হয় এবং মাত্র ১১ সেকেণ্ডে আব্দুল হক্ পরাভূত হন।

দ্বিতীয় দিন ১লা ফেব্রুয়ারি শিয়ালকোটের স্বনামধন্য মল্ল গোংগার ছোট ভাই মোহাম্মদ হোসেনের সংগে ইতালির টনি লা মারোর কুস্তি হয়। হোসেন দ্বিতীয় শ্রেণীর মল্ল হয়েও অতি সহজে মারোকে চিৎ করেছিলেন।

২রা ফেব্রুয়ারি দুটি আন্তর্জাতিক কুস্তি হয়েছিল। প্রথম জোড়ে লাহোরের জিজা থৈওয়ালা সার্জেণ্ট জার্ডিনকে ১০ মিনিটে পরাভূত করেন এবং দ্বিতীয় জোড়ে লাহোরের গোলাম গউস মাত্র ১৮ সেকেণ্ডে

প্যালেস্টাইনের গোল্ডষ্টেইন্‌কে ধরাশায়ী করেছিলেন। শেষোক্ত কুস্তিটি হয়েছিল 'অল্-ইন্' প্রথায়।

দংগলের শেষ দিনে অর্থাৎ ৩রা ফেব্রুয়ারি নারায়ণ সিং ও টনি লা মারোর মধ্যে 'অল্-ইন্' ঢংয়ে ১০ মিনিটের দুই চক্র লড়াই হয়। প্রথম চক্রে নারায়ণ মারোকে নীচে ফেলতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং তারপরে আরো বার কয়েক আছাড় মেরেছিলেন। একবার তিনি মারোকে উপবিষ্ট অবস্থায় 'শোয়ারি' লাগিয়ে বেশ খানিকটা কাবু করেছিলেন বটে; তবে চিৎ করতে পারেন নি। শেষ সময়ে দুজনই দুজনের পায়ে 'কাঁচি' লাগিয়েছিলেন। দ্বিতীয় চক্রের সুরুতেই মারো নারায়ণকে নীচে ফেলে এমন সাংঘাতিকভাবে আটকে ধরলেন যে, হাজার চেষ্টা করেও নারায়ণ তা থেকে মুক্ত হ'তে পারলেন না। মধ্যস্থ ও বিচারক যখন নিশ্চিতভাবে বুঝলেন যে, এই 'খিল' থেকে নারায়ণের পরিত্রাণের আর কোনো উপায় নেই, তখন ৪ মিনিটে তাঁরা মারোকেই বিজয়ী ঘোষণা করেছিলেন।

কেলেংকারির একশেষ!

এইদিন অতিশয় শোচনীয় ও কলংকজনক অবস্থার মধ্যে দিয়ে 'ভারতীয় কুস্তি-প্রাধান্য' প্রতিযোগিতার পরিসমাপ্তি ঘটে যা দেশের প্রত্যেক সভ্য এবং চিন্তাশীল ব্যক্তির স্মরণ রাখা দরকার।

কলংকজনক অবস্থাটা কি, তা বলছি। শেষ দিন 'ভারতীয় কুস্তি-প্রাধান্য কমিটি' ভারতের শ্রেষ্ঠ মল্ল নির্ণয় করবার জন্য সাতজন প্রসিদ্ধ

ভারতীয় মল্লকে পরস্পর প্রতিযোগিতার জন্য আহ্বান করেছিলেন। এঁরা ছিলেন—

হামিদ পালোয়ান
ছোট গামা
গোংগা পালোয়ান
গোলাম গউস
বংশী সিং
সোহন সিং
ছোট পূরণ সিং

কিন্তু বারংবার নাম ডাকার পরেও তাঁদের কেউ মঞ্চে উঠলেন না; অথচ গোংগা কাছেই বসেছিলেন। শেষে খাঁ সাহেব রসিদ সাহেব ব্যক্তিগতভাবে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে বৃদ্ধ পিতা গামু পালোয়ানের নির্দেশে তাঁর ছেলে গোংগা পালোয়ান মঞ্চে আরোহণ করলেন। তিনি প্রথমত দুহাতে তাঁর দুই বিপরীত কাঁধ ধ'রে মুহূর্তকাল স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং শেষে ডান হাতে ইশারায় গলা কাটার ভংগী ক'রে যা বোঝালেন, তার অর্থ এই, যদি তিনি আজ এখানে এই প্রতিযোগিতার জন্য দণ্ডায়মান হন, তবে গামার দল নিশ্চিতভাবেই তাঁকে মেরে ফেলবেন। কেননা, যে-কারণেই হোক, তাঁরা প্রতিযোগিতায় নামতে ইচ্ছুক নন,—এই অবস্থায় অন্য কেউ নেমে বিজয়ী হলে তাঁরা সহ্য করবেন না। গামু পালোয়ান তখন স্পষ্টভাবেই জানালেন যে, যদি পুলিস তাঁর ছেলের জীবনের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত থাকে, তবেই তাঁর ছেলে প্রতিযোগী হিসাবে দাঁড়াতে পারেন।

পুলিস কর্তৃপক্ষ তখন গোংগার এবং অন্যান্য সমস্ত প্রতিযোগীর জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত হ'লে পুনরায় সকল প্রতিযোগীর নাম

ডাকা হোল; কিন্তু একমাত্র গোংগাই তখনো মঞ্চে দাঁড়িয়ে রইলেন। পরে আরো দুবার সবাইকে ডাকা হোল, তাতেও কোনো ফলোদয় হোল না। তখন অন্যান্য প্রতিযোগীকে অনুপস্থিত জ্ঞান ক'রে প্রতিযোগিতা করতে ইচ্ছুক একমাত্র গোংগাকেই সরকারিভাবে 'ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মল্ল' বলে ঘোষণা করা হয় এবং বিজয়ীর প্রাপ্য রৌপ্য গদা, স্বর্ণহার ও পদক উপহার দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানান্তে পুলিস-ট্রাকে ক'রে গোংগাকে অবশ্য নিরাপদে বাড়ী পাঠানো হয়েছিল।

হীন দলীয় নীতির ফলেই যে গোংগা এতদিন গামার সংগে শক্তির পরীক্ষা দিতে পারেন নি, এই কলংকজনক ঘটনার পরে সে সন্দেহের অবসান হয়। গামার দল একথা বুঝেছিল যে, বর্তমান প্রতিযোগিতায় গামা ও ইমামকে অবসর প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ মল্ল রূপে গণ্য ক'রে কমিটি তাঁদের দলের আর যাঁদের নাম ডেকেছিলেন, সেই হামিদ এবং ছোট গামাকে গোংগার পক্ষে পরাজিত করা হয়তো কঠিন ব্যাপার হবে না। তাছাড়া, অন্যতম উদীয়মান মল্ল গোলাম গউস্‌ও সেদিন উপস্থিত ছিলেন; অতএব হামিদ ও ছোট গামার প্রাধান্য খর্ব হবার খুবই আশংকা ছিল! তাহলে তো এতদিনকার শৃংখলিত দলীয় প্রাধান্য বিপর্যস্ত হয়ে যাবে! এ অসহ্য ব্যাপার! তাই প্রতিযোগিতায় যোগ না দেওয়াকেই তাঁরা শ্রেষ্ঠ পন্থা মনে ক'রে নিয়েছিলেন। কিন্তু পুলিসের সক্রিয় সহায়তায় সেদিন তাঁদের সেই ফন্দি ভেস্তে গিয়েছিল এবং তার ফলে গোংগাকে 'ভারতের প্রাধান্য' লাভ করতে দেখে ভারতের প্রায় সকল নিরপেক্ষ ব্যক্তিই আনন্দিত হয়েছিলেন।

কুস্তি-প্রদর্শনী

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ক্রমশ তীব্রতর হতে থাকায় স্বাভাবিকভাবেই দেশে দেশে জন-জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে থাকে; ভারতবর্ষেও হয়েছিল। তদুপরি 'স্বাধীনতা'র নেশা—সাম্প্রদায়িক বীভৎসতা এবং দেশ বিভাগ ভারতের মানুষকে ক্রমশ মহা বিপর্যয়ের মুখে নিয়ে যায়। এইসব কারণে ১৯৪৪ অব্দে বম্বের দংগল ছাড়া দীর্ঘকাল এদেশে আর কোনো ভালো বা বড় আন্তর্জাতিক কুস্তি প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান সম্ভব হয় নি। শেষে ১৯৪৮ অব্দের মার্চ-এপ্রিলে কলিকাতার ইডেন গার্ডেনে যে প্রসিদ্ধ মেলা হয়, কিছু সংখ্যক উৎসাহীর চেষ্টায় সেখানে কতকগুলি কুস্তির ব্যবস্থা হয়েছিল। এইসব কুস্তিতে বৈদেশিকরাও নেমেছিল বটে, তবে কোনো কুস্তিই ঠিক প্রতিযোগিতামূলক হয়নি। অবশ্য এই প্রদর্শনীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল যে, এতে জন কয়েক বিদেশী মহিলা মল্লও অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

১৯৫২ অব্দের নভেম্বর মাসে মাদ্রাজেও এই ধরনের প্রদর্শনী কুস্তির অনুষ্ঠান হয়; তারপরে ১৯৫২-৫৩ এবং ১৯৫৩-৫৪ অব্দের শীত ঋতুতে কলিকাতার ফোর্টেও অনুরূপ প্রদর্শনী হয়েছিল। ১৯৫৪ অব্দে গরমের সময় বম্বেতেও হয়েছে। মাদ্রাজ, বম্বে এবং কলিকাতার এইসব প্রদর্শনী কুস্তিকে যদিও প্রতিযোগিতার কুস্তি বলে চালানো হয়েছিল, তথাপি একথা বুঝতে কারুই অসুবিধা হয়নি যে, একদল ব্যবসায়ী লোক দেশী-বিদেশী কিছু সংখ্যক পালোয়ানকে কিছু কিছু অর্থের বিনিময়ে কুস্তি লড়তে রাজী করিয়েছিলেন এবং সেইসব মল্লরা প্রতি সপ্তাহে লড়ে পর্যায়-ক্রমে জয়-পরাজয় বরণ করেছিলেন। কারণ তাতে অর্থের দিক থেকে

তাঁদের কারুই লোকসান হয়নি। বলা বাহুল্য, এঁদের কেউ প্রথম শ্রেণীর মল্ল ছিলেন না যদিও এঁদের মধ্যে হুংগারির কিং কং, ইংল্যাণ্ডের বার্ট আসিরাটি, অ্যামেরিকার নিগ্রো-মল্ল সীলি সামারা এবং ভারতের হরবংশ সিং, 'টাইগার' যোগীন্দর, দারা সিং ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত উল্লেখযোগ্য পালোয়ান ছিলেন।

এইসব কুস্তি 'অল্-ইন্' বা 'অ্যামেরিকান্ ফ্রী স্টাইল' কায়দায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিজ্ঞাপনের জোরে আকৃষ্ট হযে অনেকে এইসব কুস্তি দেখতে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু ফেরার পথে অনেককে বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছিল এবং 'ঠকিয়ে পয়সা লোটা'র অভিযোগ করতেও শোনা গিয়েছিল। কেননা, বহু লোকই এগুলিকে 'আপোষ' বা 'মিল কুস্তি' বলে বুঝতে পেরেছিলেন।

প্রসংগক্রমে বলা দরকার যে, কলিকাতায় এই কুস্তি-কর্তৃপক্ষ গোবর বাবুকে শুধু মঞ্চের পাশে ব'সে থাকার বিনিময়ে ২০০০্ টাকা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু গোবর বাবু পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছিলেন যে, দু লাখ দিলেও তিনি এই 'হুল্লোড়' দেখতে প্রস্তুত নন। গোবর বাবুকে ডাকার অর্থ ছিল এর প্রতি সর্বসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করা।

'বিশ্ব অলিম্পিক কুস্তিতে' ভারত

১৯৩৬ অব্দে বার্লিন অলিম্পিক খেলার পরে ১৯৩৯ অব্দে দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ সংঘটিত হয়; তার ফলে ১৯৪০ ও ১৯৪৪ অব্দের অলিম্পিক খেলা বন্ধ ছিল। যুদ্ধান্তে ১৯৪৮ অব্দে প্রথম লণ্ডন নগরে অলিম্পিক খেলা

হয়। সেই বছর ভারতবর্ষ থেকে সর্বপ্রথম একটি অলিম্পিক কুস্তির দল পাঠানো হয়। কিন্তু ভারতীয়রা তাতে কোনো কৃতিত্বই দেখাতে পারেননি।

এর পরে ১৯৫২ অব্দে হেল্‌সিংকির অলিম্পিক খেলায় আবার ভারতীয় কুস্তির দল পাঠানো হয়েছিল। তখন 'ক্যাচ্চ্‌-অ্যাজ ক্যাচ্চ্‌-ক্যান' প্রথার 'ব্যাণ্টাম' বিভাগে ২০ জন প্রতিযোগীর মধ্যে কে-ডি যাদব ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে তৃতীয় স্থান দখল ক'রে ভারতের ইতিহাসে সর্বপ্রথম অলিম্পিক 'ব্রোঞ্জ পদক' লাভ করেছিলেন। আর 'ফেদার' বিভাগে ২১ জন প্রতিযোগীর মধ্যে কে-ডি মাংগেভও ব্যক্তিগত কৃতিত্বের জোরে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছিলেন।

এই প্রসংগে আমাদের দেশের দুরবস্থা সম্পর্কে গোটা কয়েক কথা বলা দরকার।

প্রথমত, আমাদের দেশে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নেই; তার ফলে বেকার সমস্যা এবং আর্থিক দুরবস্থা চূড়ান্ত। যাঁরা ব্যায়ামকে জীবিকার পথ হিসাবে গ্রহণ করেননি, স্বাভাবিকভাবেই তাঁদেরকে জীবিকার জন্য অন্য রকম কাজে লিপ্ত থাকতে হয় বেশীক্ষণ। এই অবস্থায় দেহ ও শক্তি-চর্চার জন্য তাঁরা যেটুকু সময় পান, তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। অনেক অ-পেশাদার শরীর-সাধকের শুধু জীবন ধারণের মতো আর্থিক সংস্থানও নেই। অতএব, এই প্রতিকূল অবস্থায় আমাদের দেশের কেউ যদি বিদেশীদের সংগে প্রতিযোগিতায় হেরেও যান, তথাপি তাতে তাঁর ব্যক্তিগত কোনো অগৌরব হতে পারে না, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই তা স্বীকার করবেন।

দ্বিতীয়ত, অলিম্পিক খেলা বা অন্য যে-কোনো রকম আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় আমাদের দেশ থেকে যাঁরাই যোগ দিতে বিদেশে

গিয়েছেন, তাঁদেরকে হয় ব্যক্তিগত ব্যয়ে, না হয়তো বন্ধু-বান্ধবদের সাহায্যের ওপর নির্ভর করে যেতে হয়েছে! এসব ক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় সরকার বা ভারতীয় ক্রীড়া সংস্থাগুলি হয় নীরব, না হয়তো অত্যন্ত কৃপণ থাকে ; তার একমাত্র অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আমাদের দেশ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গৌরব অর্জন করুক, বা না করুক, কিংবা অপমানিতই হোক, তাতে দেশীয় সরকার বা ক্রীড়া-সংস্থাগুলির কোনো গ্রাহ্য নেই—মাথা ব্যথা তো নেই-ই। এটা দেশের দুর্নীতির পরিচয়। অতএব, এ-বিষয়ে আমার স্পষ্ট ও দৃঢ় অভিমত যে, এই দুর্নীতি দূরীভূত না হ'লে শুধু খেলাধূলা বা শরীর-চর্চা নয়, কোনো বিষয়েই আমাদের দেশ কোনো দিন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় আসন অধিকার করতে পারবে না, তা তার জন্য অন্য যেভাবে যতোই কেন চেষ্টা চলুক ; এবং ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটানো ছাড়া সেই দুর্নীতি রোধের আর অন্য কোনো উপায়ও নেই।

এই প্রসংগে সোবিয়েৎ রাশিয়ার নজির উত্থাপন করা অন্যায় হবে না। সেখানে সারা দেশে সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করবার ফলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আজ সোবিয়েৎ রাশিয়ার অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। শরীর-চর্চার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। সে দেশের ক্রীড়া সংস্থাগুলি অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশের ক্রীড়া সংস্থা থেকে মূলতই তফাৎ। সোবিয়েৎ রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক বৈশিষ্ট এই যে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সেখানে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। তাই শরীর সাধনাকে সর্বাত্মক পথে পরিচালিত করবার জন্য সারা দেশে তাকে কড়াকড়িভাবে (Strictly) অ-পেশাদারি ও গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। তথাপি তাদের শত্রু-শিবির বিগত হেল্‌সিংকির অলিম্পিক খেলায় সমাগত সোবিয়েৎ খেলোয়াড় ও ব্যায়ামীদের 'পেশাদার' অপনাম দিয়ে বাতিল করবার চেষ্টা করেছিল!

এইসব কুচক্রীরা সোবিয়েৎ দলের বিরুদ্ধে আরো বহু রকম কূটনৈতিক দুশ্চেষ্টার আশ্রয় নিয়েছিল যা অলিম্পিকের সাম্য, মৈত্রী ও শান্তির আদর্শকে সাংঘাতিকভাবে কলুষিত করেছিল! কিন্তু তাদের সর্বরকম অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে সোবিয়েৎ দল তাঁদের বিজয় নিশান উড়িয়ে দিয়ে গেছেন! দুনিয়ার মানুষ সোবিয়েৎ দলের সেই অবিস্মরণীয় কীর্তি বিস্ময়ের সংগে লক্ষ্য করেছে।

১৯৫৬ অব্দের মেলবোর্ণ অলিম্পিক খেলা সমাগত প্রায়।—তার ফলাফলের দিকেও দুনিয়ার মানুষের লক্ষ্য থাকবে নিশ্চয়।

'মিচিগান হারকিউলিস'এর পরাজয়

প্রথম অধ্যায়ে ব'লে এসেছি কুস্তির মত 'পাঞ্জা-লড়া'ও পশ্চিম দেশে যথেষ্ট সমাদৃত এবং সেখানে তা 'রিস্ট্-টারনিং' বা 'রিস্ট্-রেস্‌ট্‌লিং' নামে পরিচিত। অতএব এ বিষয়ের দু একটি চিত্তাকর্ষক সংবাদ এখানে নিশ্চয়ই অপ্রাসংগিক হবেনা।

পাঞ্জা-লড়া অনেক রকম হলেও পশ্চিম দেশে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও চলতি নিয়ম হোল টেব্‌লের ওপর কনুই রেখে ডান হাতে ডান হাত কিংবা বাঁ হাতে বাঁ হাত দিয়ে প্রতিপক্ষের পাঞ্জা ধ'রে তার হাতকে চিৎ করা। আমাদের দেশে পাঞ্জা-লড়ার রেওয়াজ নেই; অতএব কারু গুণাগুণ বা ক্ষমতার বিষয়ে পরিস্কারভাবে কোনো কথাই বলা চলে না। তবে ঘটনার স্রোতে দু একজনের ক্ষমতার যা দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে, তাতে মনে হয়, সুযোগ পেলে তাঁরা এ বিষয়েও নিশ্চয়ই আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করতে পারতেন।

বোস ঠাকুরের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে যিনি ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বপ্রথম ১৮৯৯ অব্দে বিদেশীর বিরুদ্ধে পাঞ্জায় জয়ী হয়েছিলেন। আমাদের দেশে বে-সরকারিভাবে তিনিই ছিলেন তখন শ্রেষ্ঠ পাঞ্জা-বীর (Wrist wrestling Champion).

এই ঘটনার বহুকাল পরের অধিকতর মূল্যবান আর একটি সংবাদ আমার সংগ্রহে আছে। সেটি হোল সুপ্রসিদ্ধ অ্যামেরিকান বলী 'মিচিগান্ হারকিউলিস' নামে পরিচিত জন্ ভ্যালেণ্টাইনের পরাজয় এবং এর সমস্ত কথা ভ্যালেণ্টাইনের লেখা থেকেই সংগ্রহ।

তখন ভ্যালেণ্টাইনের দৈহিক ওজন ছিল ১৮২ পাউণ্ড এবং তিনি নিজেই বলেছেন যে, যদিও তাঁর গোছার শক্তি বিশেষ ধরনের ছিল, তবু একদিন সামান্য একটি ভারতীয় ছাত্রের কাছে এ কাজে তিনি অতি সাংঘাতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিলেন।

ছাত্রটির বয়স ছিল প্রায় ১৯ বছর, দৈর্ঘ মাত্র ৬১ ইঞ্চি, ওজনও মাত্র ১১৫ পাউণ্ডের মতো ছিল। যে-কোনো মানুষের সংগে পাঞ্জা-লড়া ছিল তার বাতিক। কোনো লোকের কথায় ছেলেটি একটি বার-বেল কিনে তার সাহায্যেই ব্যায়াম করত যদিও ১২০ পাউণ্ড বার-বেলটাকে সে দুহাতে ঠিকমতো ওপরে তুলতে পারত না। একদিন সে ভ্যালেণ্টাইন্‌কে তার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে। ৭৩ ইঞ্চি উঁচু আর এক শক্তিমান লিথুয়ানিয়ান বন্ধুকে নিয়ে ভ্যালেণ্টাইন একদিন এই ভারতীয় ছাত্রটির বাড়ী যান। সেখানে তিনি প্রায় ৭২ ইঞ্চি উঁচু তার তিন ভাইর সংগে পরিচিত হলেন এবং তিনি লক্ষ্য করলেন, তাদের মধ্যে এই ক্ষুদে ভাইটিই যেনো মাতব্বর গোছের লোক।

ছেলেটি তখন ঘরের মাঝখানে একখানা নীচু টেব্‌ল্ রেখে তার দুপাশে দুখানা চেয়ার আনিয়ে তার সংগে ভ্যালেণ্টাইন ও তাঁর বন্ধুকে

পাঞ্জা লড়তে আহ্বান করল। ভ্যালেণ্টাইন্ তো অবাক! ভাবলেন, ছেলেটির ধৃষ্টতা তো বড় সাংঘাতিক! ছেলেটি কিন্তু সহাস্যে জানালো যে, সে কোনোদিন কারু কাছেই পাঞ্জায় হারেনি। যা-ই হোক, তার পীড়াপীড়িতে প্রথমত লিথুয়ানিয়ান বলীটি এগুলেন। এই ব্যক্তি 'কার্লিং' ও 'রেক্টেংগুলার ফিক্স্' নামক কঠিন ভারতোলায় যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন যাতে তাঁর পুরোবাহুর শক্তি প্রমাণিত হত; তাছাড়া তাঁর হাত এমন লম্বা ছিল যে, তিনি শুধু হাতের পাতা ও আংগুল প্রসারিত করলেই তা ছেলেটির প্রায় সম্পূর্ণ পুরোবাহুর সমান দীর্ঘ হোত; অথচ সামান্য চেষ্টায়ই তিনি ছেলেটির কাছে পরাভূত হয়ে গেলেন!

ভ্যালেণ্টাইন্ বলেছেন যে, এই ঘটনায় তাঁর সামান্য মানসিক চঞ্চলতা এলেও ছেলেটি কার পাল্লায় পড়েছে, সেইটি ঠিকমতো বুঝিয়ে দেবার জন্য কৃতসংকল্প হয়েই তিনি তার হাতে হাত দিলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য! ভ্যালেণ্টাইনের দেহে 'যা-কিছু ছিল', তার সবই তিনি তার ওপর প্রয়োগ করলেন, দুজনের চাপাচাপিতে ছোট্ট টেব্‌ল্‌টা প্রায় ভেংগে যাবার উপক্রম হোল, তবু কিছু হোল না! শেষ পর্যন্ত ভ্যালেণ্টাইন্‌কেই ছেড়ে দিতে হয়েছিল! তাই তিনি রহস্য করে বলেছিলেন, "If that fellow was a strong man, then I'm a clown. I've met plenty of wrist-turners of all weights from 8 st. to 18 st. but that 'runt' was *the* wrist-turner."

মনোহরের 'অবিস্মরণীয় পাঞ্জা-যুদ্ধ'

ভ্যালেণ্টাইনের পরাজয়ের কুড়ি বছরাধিক পরে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলী 'বিশ্বের বিস্ময়' মনোহর আইচ্ পাঞ্জা লড়ে পশ্চিমীদের স্তম্ভিত করে দিয়েছিলেন যদিও তিনি কখনো পাঞ্জা লড়বার উদ্দেশ্যে

সেদেশে যাননি। কিন্তু যে ঘটনার স্রোতে তিনি পাঞ্জা-লড়তে বাধ্য হয়েছিলেন, তা সামান্য হলেও নিশ্চিতভাবে অবিস্মরণীয় ইতিহাস রচনা করেছে।

১৯৫২, ২২এ মার্চ ইণ্টার্ন্যাশন্যাল ষ্টীল্ স্ট্র্যাণ্ড্ পুলিং অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থায় স্কট্ল্যাণ্ডের এবারডিন্ সহরে 'বিশ্ব স্ট্র্যাণ্ড পুলিং প্রতিযোগিতা' হয়েছিল এবং তাতে 'টেরি অফিসিয়েল প্যাটার্ণ স্টীল্ স্ট্র্যাণ্ড' ব্যবহৃত হয়েছিল। পৃথিবীর নানা দেশের বড় বড় বলীরা এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিলেন; ভারতবর্ষ থেকে একমাত্র মনোহর ছিলেন এখানকার প্রতিযোগী এবং দশ স্টোন বিভাগের তিনটি স্বতন্ত্র টানেই তিনি প্রথম স্থান দখল করেন; এমন কি, শেষ দুইটি টানে তিনি নতুন 'বিশ্ব-তালিকা' সৃষ্টি করে ইংল্যাণ্ডর বব্ ফসেট্ ও স্কট্ল্যাণ্ডের ডেভ্ উয়েব্স্টারের কীর্তিকে নীচে ফেলে দিয়েছিলেন। এইদিন তাঁর রেকর্ড ছিল—

দুহাতি ফ্রণ্ট চেস্ট্ পুল্ (ফ্রী স্টাইল)	১৪০ পাউণ্ড
বাঁ হাতি মিলিটারি প্রেস্	২৫০ ,,
দুহাতি ব্যাক্ প্রেস্ (ফ্রী স্টাইল)	৩১৮ ,,

এই ঘটনার কিছুদিন পরে আমন্ত্রিত হয়ে আয়র্ল্যাণ্ডের বেল্ফাস্ট সহরে মনোহর স্ট্র্যাণ্ড পুলিংয়ের প্রদর্শনী দিয়েছিলেন। সেখানে স্ট্র্যাণ্ড পুলিংয়ের অব্যবহিত পরেই হঠাৎ দর্শকদের মধ্যে মনোহরের বাহু ও পাঞ্জার শক্তি সম্পর্কে এক দারুণ ঔৎসুক্য জন্মে, এবং জন পাঁচেক বলী তাঁর সংগে পাঞ্জা লড়তে চাইলেন। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন আয়র্ল্যাণ্ডের পাঞ্জা-বীর (Wrist Turning Champion) মারভিন্ কটার। 'ন্যাশন্যাল অ্যামেচার বডি বিল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের' অন্যতম সদস্য জর্জ গ্রীন্উড্ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মনোহরের

পাঞ্জার শক্তি পূর্ব থেকেই জানতেন। তাই তিনি তাঁদেরকে একে একে মনোহরের সংগে পাঞ্জা লড়তে বললেন।

প্রচণ্ড হাততালি ও বিপুল উল্লাসের মধ্য দিয়ে প্রথম চারজন বলী পর পর অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মনোহরের কাছে পরাজিত হয়ে গেলেন। সর্বশেষে এলেন মারভিন্ কটার। তাঁর ওপর অবশ্য সকলেরই যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল। পাঞ্জার সময় দেখা গেল, প্রথমটা কেউ কারু হাত দোলাতে পারছেন না! চতুর্দিকে তখন দারুণ উত্তেজনা আর আনন্দের কোলাহল চলতে লাগল, তার যেনো আর বিরাম নেই। মিনিট পার হয়ে চলল— দুজনেব হাতই থর্ থর্ করে কাঁপছে; তবু হার-জিতের লক্ষণ নেই! প্রেক্ষাগৃহে দমকে দমকে উচ্চধ্বনি ও হৈ-হুল্লোড় চল্তে লাগল!

তারপরেই মারভিন্ কটারের হাত একটু একটু ক'রে দুলতে লাগল এবং আরো কয়েক মুহূর্ত পরে দেখা গেল, তাঁর হাত চিৎ হয়ে যাচ্ছে! দেখতে দেখতে দেড় মিনিটের পরে তাঁর হাত একেবারেই চিৎ হয়ে গেল! আবার হল্-ফাটা চীৎকার! সেই চীৎকারের মধ্যে হঠাৎ গ্রীনউড্ দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগলেন,—"বন্ধুগণ, আশা করি, এ-বিষয়ে আপনারা সকলেই আমার সংগে একমত যে, আজ যদি মিঃ আইচ মিঃ কটারের কাছে পাঞ্জায় হেরেও যেতেন, তাতেও তাঁর কোনো অ-গৌরব হোতনা। কেননা, আপনারা কিছুক্ষণ আগেই দেখেছেন, মিঃ আইচ কিভাবে বার-বার স্ট্র্যাণ্ড পুলিংয়ের প্রদর্শনী দিয়েছিলেন! এই অসাধারণ কাজে নিশ্চয়ই তাঁর অনেক শক্তি ব্যয় হয়েছিল। ঠিক তারপরেই তাঁকে আমাদের দেশের পাঁচজন শ্রেষ্ঠ জোয়ানের বিরুদ্ধে পাঞ্জা লড়তে হয়েছে! এবং তাঁদের মধ্যে একজন এ-বিষয়ে আমাদের দেশের গৌরব স্থল। একই জায়গায়, একই সন্ধ্যায় এবং একই সময়ে পর পর এরূপ শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়ে মিঃ আইচ আজ যে অতুলনীয় দমের

(Stamina) দৃষ্টান্ত দেখালেন, তা আমাদের প্রত্যেকেরই স্মরণ রাখা দরকার। মিঃ আইচ নিঃসন্দেহে ভারতের গৌরব।"

মিঃ গ্রীণউডের এই ছোট্ট বক্তৃতাটি শুনতে শুনতে সমাগত দর্শকরা ক্রমশ শান্ত, বিস্মিত ও নির্বাক্ হয়ে গিয়েছিলেন।

মনোহরের বৈশিষ্ট্য

অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যের জন্য মনোহর আইচ 'বিশ্বের বিস্ময়' নামের যথার্থ অধিকারী হয়েছেন।

প্রথমত, তাঁর পাঞ্জার এই অভাবনীয় শক্তি।

দ্বিতীয়ত, স্ট্র্যাণ্ড পুলিংয়ে অসামান্য কৃতিত্ব এবং ভারতবর্ষে এ-বিষয়ে তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ। ১৯৫৫, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি বম্বেতে তিনি দুহাতি ফ্রণ্ট চেস্ট পুলে বে-সরকারিভাবে ১৪৫ পাউণ্ডের এক নতুন কীর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন।

তৃতীয়ত, নতুন ধরনের শক্তির কীর্তি 'বেঞ্চ প্রেসে' প্রাধান্য অর্জন। ১৯৫২, ২২ এ অগাস্ট ন্যাশন্যাল অ্যামেচার বডি বিল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত প্রতিযোগিতায় ক্লাফাম্ ওয়েট লিফ্‌টিং ক্লাবে মিঃ গ্রীনউডের মধ্যস্থতায় তিনি ১৪০ পাউণ্ড দৈহিক ওজনে ২৮৪ পাউণ্ড ভার ঠেলেছিলেন। তারপরে ১৯৫৫, ৩০ এ জানুয়ারি জব্বলপুরে তিনি ৩১১ পাউণ্ড তুলে সমগ্র এশিয়ায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে আছেন।

চতুর্থত, ন্যাশন্যাল অ্যামেচার বডি বিল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত 'শ্রীজগৎ' (Mr. Universe) প্রতিযোগিতায় তিনি তিনবার যোগদান করেছিলেন; প্রথমবার, ১৯৫১ অব্দে তিনি তৃতীয় দলে বিশেষ কারণে

প্রথম স্থান দখল করতে না পারলেও দ্বিতীয় হয়েছিলেন; পরের বছর ১২ই জুলাই তিনি তৃতীয় দলে প্রথম হয়ে 'শ্রীজগত' উপাধি লাভ করেছিলেন। তারপরে ১৯৫৫ অব্দেও তিনি 'শ্রীজগত' প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। এদেশের মধ্যে এত বেশী বয়সে আর কেউ 'শ্রীজগত' প্রতিযোগিতায় এরূপ বার বার যোগ দিয়ে প্রত্যেক বারই এমন কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি।

পঞ্চমত, দৈহিক উচ্চতার অনুপাতে দৈহিক পুষ্টিতে তিনি যে আসন অধিকার করেছেন, তা সমগ্র পৃথিবীতেই অভূতপূর্ব, সৃষ্টির সুরু থেকে পৃথিবীর বুকে তা কস্মিন্‌কালেও কেউ দেখেনি! তাই পশ্চিম জগত তাঁকে 'বিশ্বের সেরা ক্ষুদ্র পৈশিক মানুষ' (Most Muscular Short Man in the World) নামে অভিহিত করেছিল। পূর্বে এই নামের অধিকারী ছিলেন ক্যানাডার এড্‌ওয়ার্ড থেরিয়ল্ট্‌, যদিও তাঁর উচ্চতা ছিল মনোহরের চেয়েও দু ইঞ্চি বেশী!

অতএব মনোহরের দৈহিক মাপ এখানে নিশ্চয়ই বিশেষ চিত্তাকর্ষক হবে; তাঁর এই মাপটি ১৯৫২ অব্দে 'শ্রীজগত' প্রতিযোগিতার সমক্ষ লণ্ডনে নেওয়া হয়েছিল :—

বয়স	৩৬ বছর
ভার	১৩৫ পাউণ্ড
দৈর্ঘ	৫৯ ইঞ্চি
গলা	১৭ ,,
বাহু (সংকুচিত)	১৭ ,,
গোছা (,,)	১৪ ,,
কব্জি	৬¾ ,,
বুক (প্রসারিত)	৪৭½ ,,

কটি	২৭½ ,,
পাছা	৩৫ ,,
উরু	২৪½ ,,
মোচা (সংকুচিত)	১৫½ ,,
নলি	৮ ,,

বাঙালীর পাঞ্জা-শক্তি

পাঞ্জা-লড়ার কথা আলোচনা প্রসংগে আরো জন কয়েক বাঙালীর নাম না বললে চলেনা যদিও তাঁদের কেউ বিদেশীর সংগে শক্তির পরীক্ষা দেননি। বাংলার সুপ্রসিদ্ধ বলী ক্যাপ্টেন জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি অত্যন্ত পরিণত বয়সে দেখেছিলাম। কিন্তু সেই বয়সেও তাঁর মুঠোর গড়ন যা দেখেছিলাম, তা সচরাচর ইওরোপীয় বলীদেরও হয়না। তাঁর মুষ্টি বা পাঞ্জার কথা আমি অনেকের কাছেই শুনেছিলাম। দুর্ভাগ্য, তাঁর সে শক্তির কোনো প্রত্যক্ষ নজির নেই।

সূর্যকুমার সরকার নামে ফরিদপুর জেলার আর একজন প্রচণ্ড বলীকে আমি জানি, যাঁকে শক্তি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে নামানোর জন্য রাজেন্দ্রনারায়ণ গুহ ঠাকুরতা যথেষ্ট চেষ্টা করেও কৃতকার্য হননি। রাজেনবাবু বলেছিলেন, তাঁকে সংগী হিসাবে পেলে তিনি বিশ্ব-জয় করতে পারেন। তিনি যথাক্রমে প্রসিদ্ধ বলী অশ্বিনীকুমার গুহ এবং বোস ঠাকুরের ছাত্র ছিলেন, বয়স এখন তাঁর ৬৮ বছর।

বস্তুত এই বয়সেও সূর্যবাবুর মতো এমন অদ্ভুত পাঞ্জা আমি আর কারু দেখিনি! আংগুল সমেত হাতের পাতাখানা দৈর্ঘে-প্রস্থে প্রায় সমান এবং সে হাতের চামড়ার কাছে আর মানুষের পায়ের তলার

চামড়াও বুঝি তুচ্ছ! সহসা সে হাতকে বন-মানুষের বলে ভ্রম হ'তে পারে। সূর্যবাবু বলেছিলেন, একমাত্র বোস ঠাকুর ছাড়া পাঞ্জা-লড়ায় আর কাকেও তিনি কোনো দিন গ্রাহ্য করেন নি। এই বয়সেও তাঁর হাতখানা কাঠের মতো শক্ত মনে হয়।

তারপরেই বরিশালের অন্যতম শ্রেষ্ঠবলী সুরেন্দ্রনাথ দাসের কথা বলতে হয়। তাঁর বয়স এখন ৬৫ বছর বটে, কিন্তু মনে হয় বয়স যেনো তাঁর কাছে হার মেনেছে। কেননা, তাঁকে দৃশ্যত এখনো ৫০ বছরের কম বলেই মনে হয় এবং তাঁর দেহের গড়ন এখনো সম্পূর্ণ অটুট আছে। বয়স তাঁর যেমনি হোক, যে-কোনো ধরনে যে-কোনো জোয়ানের সংগে শক্তির পরীক্ষা দিতে এখনো পর্যন্ত তিনি উদগ্রীব এবং আমি জানি, বহু নামজাদা বলী ও ব্যায়ামীকে তিনি পাঞ্জায় পরাজিত করেছেন।

মনোহরের পাঞ্জার কথা শুনে তিনি কিন্তু একদিন আমাকে ছেলেমানুষের মতো বলেছিলেন, "দোহাই আপনার সমরবাবু, আপনি দয়া করে আমাকে তাঁর সংগে একবার একটু লড়িয়ে দিন। বন্ধুভাবে আপনি চেষ্টা করলে মনোহর নিশ্চয়ই রাজী হবেন। নানা অসুবিধার কারণে আমি তাঁদেরকে কাছাকাছি ফেলতে পারিনি। সুরেনবাবু আজো পর্যন্ত কারু কাছে পাঞ্জায় হারেননি।

এঁদের পরেই উল্লেখযোগ্য মাখন গাংগুলীর নাম। ঢাকা জেলায় তাঁর বাড়ী, বয়স এখন ৪৭; দেখতে শুনতে নেহাৎ নিরীহ ভদ্রলোক। অনেক দিনই তাঁকে আমি দেখেছিলাম,—অনাবৃত দেহও তাঁর বহুবার দেখেছিলাম। কিন্তু কোনো সময়েই দেহগতভাবে তাঁর কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল বলে আমারও মনে হয়নি।

একদিন তাঁদেরই অফিসে আমি বসেছিলাম। এমন সময় দেখলাম, খুবই বলিষ্ঠ এক ভদ্রলোক সেখানে ঢুকলেন এবং দুজনেই প্রথম দর্শনের

রীতি অনুযায়ী সহাস্তে করমর্দন করলেন। করমর্দন করলেন বটে, কিন্তু লক্ষ্য করলাম, কেউ কারু হাত ছাড়ছেন না। শুধু তা-ই নয়, মনে হোল যেনো তাঁদের মধ্যে নীরবে একটা শক্তির পরীক্ষা চল্‌ছে যদিও মাখনবাবুর চোখে-মুখে শক্তি প্রয়োগের কোনো লক্ষণ ছিল না। বরংচ তাঁর চোখ হাসি-হাসি ছিল। আধ মিনিটেরও পরে হঠাৎ আগন্তুক ভদ্রলোক তাঁর হাতখানা সরিয়ে নিয়ে হাসিমুখে বললেন, "নাঃ! ঠিকই আছেন তাহলে।"

হঠাৎ আমার উৎসুক্য বেড়ে গেল। আমি তখন তাঁদেরকে পশ্চিমী এবং ভারতীয় প্রথায় (প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত প্রথম ও দ্বিতীয় নিয়মে) আবার পাঞ্জা লড়তে অনুরোধ করলাম। তখন আস্তিন গুটাতে গুটাতে মাখনবাবু বললেন, "বলেন তো আবার ধরতে পারি; তবে কোনো বাঙালীর কাছে হারবো, এটা একেবারেই অসম্ভব কথা!" তারপর দু রকমেই পরীক্ষা হোল বটে, কিন্তু দেখলাম, কোনো রকমেই সেই ভদ্রলোক মাখনবাবুর হাত দোলাতে পারলেন না যদিও ভদ্রলোককে দস্তুরমতো বলশালী মনে হয়েছিল। মাখনবাবু আমাকে অতি সহজভাবে বললেন যে, কোনো বাঙালী তাঁকে কখনো পাঞ্জায় হারাতে পারবে ব'লে তিনি বিশ্বাস করেন না। প্রথম মনে হয়েছিল, উপস্থিত পাঞ্জায় জয়ী হয়েই বুঝি তাঁর দম্ভ বেড়ে গেছে! কিন্তু পরে দেখেছিলাম, ওটা তাঁর দম্ভ নয়; বরং তিনি দেখতে চান, সত্য সত্যই এমন কোনো বাঙালী আছেন যাঁর কাছে তিনি পাঞ্জায় হেরেও খুসী হতে পারেন।

মাখনবাবুর হাত আমি দেখেছি; কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, একেবারে নরম, মাখনের মতোই নরম। দেহখানাও তাঁর অনেকটা সেই রকম।

ঢাকা জেলার আর একজনকে আমি জানতাম। তাঁর নাম কামাখ্যা গাংগুলী; বয়স এখন তাঁর ৪৫ বছর হতে পারে। তাঁর হাতখানাও

ভয়ানক রূঢ়, সূর্যবাবুর হাতেরই একখানা ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা যায় যদিও তাঁর হাতের পাতা ও আংগুলের গড়ন অস্বাভাবিক নয়। কামাখ্যাও একদিন কথায় কথায় আমাকে জানিয়েছিলেন যে, কোনো বাঙালীই তাঁকে পাঞ্জায় হারাতে পারবে না। কামাখ্যার কুস্তিতেও বিশেষ অভ্যাস ছিল।

নানা সূত্রে আমার মনে হয়েছে, সূর্যবাবু, সুরেনবাবু, মাখনবাবু এবং কামাখ্যাবাবু, প্রত্যেকেরই পাঞ্জার জোর অসাধারণ। এঁদের মধ্যে পরস্পর পাঞ্জা-যুদ্ধ সম্ভব হলে বা যে-কোনো বৈদেশিক বলীর সংগে পাঞ্জায় ফেলতে পারলে এঁদের শক্তির পরিমাপ বোঝা যেতে পারত। কিন্তু সে ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রায় নেই।

কেউ কেউ বলেন, অংগ-প্রত্যংগ খর্ব হলে সেসব লোক পাঞ্জায় জয়ী হতে পারে। সূর্যবাবু, কামাখ্যা, মনোহর, আর সেই অজ্ঞাতনামা ভারতীয় ছাত্রটি, যে ভ্যালেণ্টাইন্‌কে হারিয়েছিল, বেঁটে ছিল বটে, কিন্তু বোস ঠাকুর, সুরেনবাবু বা মাখনবাবুর সম্পর্কে সেই কথা চলেনা।

ভারতীয় কুস্তি বিপর্যস্ত কেন?

মল্ল-জগতে ভারতের স্থান নির্ণয় প্রসংগে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনায় আমরা দেখলাম, ভারতীয় পালোয়ানেরা দুর্জয় এবং দিগ্বিজয়ী হয়েও এক সময়ে তাঁরা নিজেদের সেই ক্ষমতা সম্পর্কে নিজেরাই সচেতন ছিলেন না। কিন্তু ১৮৭৯ থেকে ১৯০০ অব্দের মধ্যে ছোটো-বড়ো জন কয়েক বৈদেশিক বলী ও মল্লের সংগে নানা সূত্রে শক্তি পরীক্ষা হবার পরে তাঁদের আত্ম-বিশ্বাস বেড়ে যায়; হোল তাঁদের 'জাগরণ'।

তারপর মল্ল-জগতে নিজেদের আসন প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তাঁদের আগ্রহ গেল বেড়ে ; তারই ফলে তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন দেশ-দেশান্তরে। সুরু হোল তাঁদের 'অভিযান'।

কিন্তু শুধু অভিযান চালিয়েই ভারতীয় পালোয়ানেরা তখন ক্ষান্ত থাকেন নি ; ১৯১০-১১ থেকে ১৯৩৫ অব্দ পর্যন্ত সরকারিভাবে স্বীকৃত হোক বা না-হোক, শত সহস্র লড়াইর মধ্য দিয়ে ভারতীয় পালোয়ানেরা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, কুস্তি-জগতে একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করতে পারেন একমাত্র তাঁরাই যদিও এঁদের মধ্যে গোবর বা সরকারিভাবেও 'বিশ্ব-প্রাধান্য' অর্জন করেছিলেন। বিদেশীরাও মানসিক চেতনা দিয়ে অন্তরে অন্তরে ভারতীয় পালোয়ানদের সেই 'শীর্ষস্থানাধিকার' স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

কিন্তু তারপরেই ভারতীয় কুস্তির ইতিহাসে ঘটল পট পরিবর্তন। বৈদেশিক কুস্তিবীরেরা দলে দলে এদেশে আসতে লাগলেন এবং তাঁদের হাতে অধিকাংশ ভারতীয় পালোয়ানরা নাস্তানাবুদ হতে থাকেন যদিও গামার সাড়া এবং ইমাম ও হামিদ পালোয়ানের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে ভারতীয় কুস্তির ইজ্জৎ তখনো পুরোপুরি নষ্ট হয়নি। তবে ভারতীয় কুস্তিতে যে 'বিপর্যয়' এসে গেছে, একথা বুঝতে কারু অসুবিধা হয়নি।

তারপরে অবস্থা আরো খারাপ হয়। ১৯৪১ অব্দ থেকে ভারতীয়রা কি দেশে, কি বিদেশে, বিদেশীদের সংগে যত লড়াই করেছিলেন, তার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁরা পরাজয় স্বীকার করেছিলেন তা সেই কুস্তিগুলি প্রীতি-কুস্তির আকারে হোক কিংবা প্রদর্শনীর ধরনেই হোক। ভারতীয় মল্লদের এই 'পরাজয়' অনস্বীকার্য।

অতএব প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি ও দেশাত্মবোধীর মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, যে ভারতীয় পালোয়ানেরা এককালে সারা

পৃথিবীতে ছিলেন দিগ্বিজয়ী ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী, দেখতে দেখতে তাঁরাই আবার বিদেশীদের অভিযানের মুখে দিশেহারা ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন কেমন করে? ভারতীয় কুস্তির উত্থান-পতনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে তার কারণ নির্ণয় করা কঠিন হবে না।

ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র বা সমাজের নিয়মই এই। যেখানে অর্থনৈতিক কাঠামো ধ্বসে যাবার ফলে অর্থ নৈতিক সমস্যা প্রবল আকার ধারণ করে, সেখানে জীবিকানির্বাহের দায়িত্ব সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত সমস্যায় পরিণত হয়। কেননা, ধনতান্ত্রিক সরকার শুধু শোষণ ব্যবস্থা চালু রেখে নিজ নিজ স্বার্থ সাধনেই মত্ত থাকে। কতকগুলি বিশেষ বিশেষ কারণে ভারতবর্ষে আজ এই অবস্থা অত্যন্ত উৎকট আকার ধারণ করেছে এবং তার পরিণামে ভারতীয় জনসাধারণের অবস্থা অত্যন্ত মর্মান্তিক ও ভীতিজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এককালে বড় বড় রাজা-মহারাজা ও নবাব-জমিদারেরা প্রচুর মাসোহারা দিয়ে বড় বড় পালোয়ান পুষে রাখত; এবং সেই সব পালোয়ানেরা একবার শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবার পরে তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই আর যার-তার সংগে প্রতিযোগিতা করবার কোনো তাগিদ অনুভব করতেন না,—আগ্রহও ছিল না। আবার, এরই একটা বিপরীত অবস্থা দেখা যেত অন্যান্য মল্লদের মধ্যে। এই শেষোক্ত শ্রেণীর পালোয়ানদের রাজা-মহারাজা বা নবাব-জমিদারদের পৃষ্ঠ পোষকতায় সুলভ জীবন যাপন করবার সুবিধা না থাকায় অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই জীবিকার জন্য বা অর্থ-লোভে বড়-ছোট ভেদাভেদ না রেখে তাঁরা যে-কোনো বিদেশী মল্লের সংগে প্রতিযোগিতায় এগিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁদের কাছে নিজেদের জয়-পরাজয়ের মূল্য ছিল শুধু নিজ নিজ পসার বাড়া-কমার মধ্যে। অতএব দেখা যাচ্ছে, অর্থ নৈতিক অ-সমতার জন্য যখন এ দেশের শ্রেষ্ঠ মল্লরা

প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন, তখন নিম্ন স্তরের মল্লরা সেখানে এগিয়ে এসে পরাজয় বরণ করেছেন।

ভারতীয় পেশাদার মল্লদের অবস্থাই যখন এই, তখন অ-পেশাদার মল্লদের আলোচনা না করলেও চলে।

তারপরে আছে আমাদের জাতিগত চারিত্রিক ত্রুটি।

আমাদের পালোয়ানেরা ব্যক্তিগত, দলগত, প্রদেশগত এবং সম্প্রদায়গত এতবেশী সংকীর্ণমনা যে, অবশ্য দেশের অর্থ নৈতিক বনিয়াদ না থাকলে তা হতেও বাধ্য, তাঁরা জাতির স্বার্থের কথা চিন্তা করতে ভুলে যান ; তাই, নিজেদের বিদ্যা অপরকে শিক্ষা দিতে কুণ্ঠিত ও পরাঙ্মুখ হন। সব চেয়ে সাংঘাতিক এবং মারাত্মক কথা যে, নিজেদের প্রাধান্য খর্ব হবার ভয়েই অনেকে নিজেদের বিদ্যা অপরকে শিক্ষা দেননা। এই মানসিক দৈন্যের কারণে ইতিমধ্যেই ভারতের বহু প্রাচীন সম্পদ লুপ্ত হয়ে গেছে ; কুস্তিও যাবে, তাতে বিস্মিত হবার কি আছে ? সারা ভারতে আমার দৃষ্টিপথে এ-বিষয়ে একমাত্র গোবরবাবুই ব্যতিক্রম। দেশের দুর্ভাগ্য, দেশবাসীরা তাঁর উদার দান গ্রহণ করেনি।

আবার সম্প্রদায়গত ও প্রদেশগত ভেদাভেদ থাকায় পালোয়ানদের মধ্যে গোঁড়ামিও আছে প্রচুর। পরস্পরের মধ্যে আন্তরিক যোগাযোগ না থাকায় তাঁরা আপন আপন খেয়াল মতোই চলেন। উপযুক্ত 'কুস্তি নিয়ামক সংঘ' গঠন করে তাঁদেরকে এক নিয়মের অধীন করতে পারলে এই ব্যাধির হাত থেকে তাঁরা কথঞ্চিৎ নিষ্কৃতি লাভ করতে পারতেন। কিন্তু 'কুস্তি নিয়ামক সংঘ' না থাকায়, বিশেষত ইতিমধ্যে দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থা অধিকতর বিপর্যস্ত হওয়ায় ভারতীয় পালোয়ানেরাও স্বেচ্ছাচারী হতে বাধ্য হয়েছেন।

আরো একটি কারণ এই যে, প্রথমাবস্থায় ভারতীয় মল্লদের হাতে বৈদেশিকদের পর পর পরাজয় লক্ষ্য করে শেষের দিকে ভারতীয়েরা মনে মনে বিদেশীদের সম্পর্কে একটা সাধারণ উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্যের ভাব পোষণ করতে থাকেন। সেই কারণেও বহু অপ্রত্যাশিত বিপর্যয় ঘটেছিল।

তাছাড়া, শেষের দিকে এদেশের কুস্তি প্রতিযোগিতাগুলি প্রায়শ বিদেশী ব্যবসায়ীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাদের খেয়াল-খুসীমতো তাদেরই স্বার্থ সাধনের ভিত্তিতে। এসব ক্ষেত্রে কুস্তির প্রদর্শনী দিয়ে অর্থ লুণ্ঠন ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্যই ছিল না।

সর্বশেষ কারণ হচ্ছে, উন্নত কলা-কৌশলপূর্ণ বিজ্ঞান-সম্মত ভারতীয় কুস্তির জায়গায় কলা-কৌশলবর্জিত অ্যামেরিকান্ 'জংলী কুস্তি'র আমদানি এবং তারি ঘন ঘন অনুষ্ঠান করা। ভারতীয় কুস্তির ভিত্তিমূলে শেষ আঘাত করেছে এই 'জংলী কুস্তি' যা বহু অর্থের অপচয়ে এ-দেশে চালানোর জন্য এক শ্রেণীর মানুষ উঠে-পড়ে লেগেছে। এটিও সম্ভব হচ্ছে শুধু ভারতের অর্থ নৈতিক অসহায়তার স্বুবর্ণ স্বুযোগেই।

অতএব ভারতীয় কুস্তি বিপর্যস্ত হবার কারণগুলি সংক্ষেপে দাঁড়াচ্ছে এই রকম :—

প্রথম : জনপ্রিয়তা ও শ্রেষ্ঠত্বের সুনাম এবং অত্যধিক স্বচ্ছলতার স্বুযোগ থাকায় দাবীমতো অর্থ ছাড়া ধনিকপুষ্ট বড বড় পালোয়ানরা শেষের দিকে বিদেশীদের সংগে লড়তেন না।

দ্বিতীয় : বিদেশী মল্লদের ক্ষমতা সম্পর্কে অতিমাত্র উপেক্ষা ও অবহেলার দরুন ভারতের শ্রেষ্ঠ মল্লরা তাঁদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেন না।

তৃতীয় : বিদেশী মল্লদের হীনতর জ্ঞানে নিম্নস্তরের ভারতীয় মল্লরা তাঁদের সংগে লড়তে গিয়ে পরাজিত হয়েছিলেন।

চতুর্থ : জীবিকা সংস্থানের গরজে নিম্নস্তরের মল্লরা যে-কোন অর্থের বিনিময়ে তাঁদের সংগে লড়াই করতেন।

পঞ্চম : অর্থের লোভেও বহু সময়ে ভারতীয় মল্লরা বিদেশী মল্লদের কাছে স্বেচ্ছায় পরাজয় স্বীকার করেছিলেন।

ষষ্ঠ : ব্যক্তিগত, দলগত, প্রদেশগত বা সম্প্রদায়গত সংকীর্ণতার জন্য বড় বড় মল্লরা অধিকাংশ সময়ই উপযুক্ত ছাত্র তৈরী করেন নি।

সপ্তম : শক্তিশালী কুস্তি নিয়ামক সংঘ গঠিত না হওয়ায় দেশ বা জাতির গৌরবের দিকে লক্ষ্য রেখে বিদেশীদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী নির্বাচিত হয়নি।

অষ্টম : অধিকাংশ কুস্তি প্রতিযোগিতা বিদেশীদের দ্বারা তাদের স্বার্থ সাধনের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

নবম : বৈজ্ঞানিক কলা-কৌশলযুক্ত ভারতীয় কুস্তিকে নষ্ট করবার জন্য অ-বৈজ্ঞানিক 'অ্যামেরিকান জংলী কুস্তি' চালানোর পরিকল্পিত ধারাবাহিক প্রচেষ্টা।

উপযুক্ত কারণগুলি বিচার করে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, ভারতের শেষ গৌরব স্থল বিদ্যো, গামা, গোবর, গোংগা, ইমাম, হামিদ, ছোটগামা, যাংকাপ্পা বুরুদ, প্রিন্স রঞ্জি, গোলাম গউস, বংশী সিং ইত্যাদির পরে এদেশে এমন আর একজন মল্লেরও অভ্যুত্থান ঘটছে না, যিনি ভারতীয় কুস্তির সম্মান রক্ষা করতে পারেন। এখন যাঁরা ভারতীয় কুস্তির প্রতিনিধি হিসাবে বিদেশীদের বিরুদ্ধে প্রায়শ লড়াই করছেন, সেই হরবংশ সিং, দারা সিং ইত্যাদি গামা, গোংগা বা গোবরবাবুর মানের সিকি ভাগও উত্তীর্ণ করতে পারেন নি। কেননা, যে হরবংশ সিং দু দু বার সমান থাকবার পরে তৃতীয় বারে ক্রেমারের কাছে মার খেয়েছিলেন, সেই

ক্রেমারকে ৫৪ বছর বয়সেও ইমাম অতি অবহেলায় দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন !

পক্ষান্তরে পশ্চিমী মল্লরা দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ছেন বিভিন্ন দেশের কুস্তি-বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য জানবার জন্যে ; এবং এবিষয়ে তাঁরা কিছু কিছু সফলতাও লাভ করেছেন ।

পশ্চিমী মল্লরা এ-দেশে এসে একটা বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন যে, এ-দেশের পেশাদার পালোয়ানেরা প্রায় সবাই বংশ-পরম্পরা কুস্তি লড়েন এবং একেবারে শিশুকালেই এ-বিষয়ে তাঁদের 'হাতে-খড়ি' হয়। মাত্র ৩।৪ বছর বয়স থেকেই তাঁরা আখড়ার মাটি গায়ে মেখে বাপ-ঠাকুরদার সংগে দস্তুরমতো পায়তাড়া দিয়ে কুস্তি লড়েন। সংগে সংগে যুক্ত হয় বাপ-ঠাকুরদার প্রত্যক্ষ শিক্ষার হাত। মাত্র ১০।১২ বছরের এইসব ছেলেদের এক ঘণ্টা, দু ঘণ্টা বা আরো বেশী সময় পুরো দমে কুস্তি লড়তে দেখে ইওরোপীয় পালোয়ানেরা বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে গেছেন বৈকি ! কার্যত, এইসব ছেলেরা যখন ১৮।১৯ বছর বয়সে কোনো ইওরোপীয় মল্লের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেন, তখন দেখা যেত সেই বয়সেই তাঁদের অন্তত ১৫ বছরের কুস্তির জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও অভ্যাস আছে।

এদিকে পশ্চিমী মল্লদের প্রায় কেউ বংশ-পরম্পরা মল্ল ছিলেন না। তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রথম জীবনে স্কুল-কলেজের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন ; এবং সেই পাঠ্য জীবনে সাধারণ শরীর-চর্চার সংগে হয়তো ধীরে ধীরে কুস্তির দিকেও এগিয়েছিলেন। তখন হয়তো তাঁদের বয়স ১৫ থেকে ২০ বছরের মধ্যে ছিল। ভারতীয় মল্লদের সংগে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও অভ্যাসগত এই গুরুতর প্রভেদ তাঁদের মনকে সাংঘাতিক ভাবে নাড়া দিয়েছিল। তাই ইদানিং বহু পশ্চিমী পালোয়ান

তাঁদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদেরও কুস্তি শিক্ষা দিতে ব্রতী হয়েছেন। তাঁরা একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসও করেন যে, আগামী সিকি শতাব্দীর মধ্যে তাঁরা ভারতীয় পালোয়ানদের সর্বক্ষেত্রেই পিছনে ফেলে দেবেন এবং তাঁদের সেই আশা যে ভিত্তিহীন নয়, তা বলাই বাহুল্য।

অবশ্য এ বিষয়ে একমাত্র সোবিয়েৎ রাশিয়া ব্যতিক্রম। কেননা, পশ্চিম দুনিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রের মতো সোবিয়েৎ রাশিয়া একমাত্র 'ভারতীয় কুস্তি' আয়ত্ত করবার জন্য বদ্ধপরিকর নয়। সোবিয়েতের জনসাধারণ এ ধরনের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করেনা ; এবং এর কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট।

ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর মতো সোবিয়েৎ দেশে শোষণ ব্যবস্থার অস্তিত্ব নেই বলে সুখী ও শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় সে দেশের মানুষ জীবন-যাত্রার মূল্যমান নির্ণয় করে ফেলেছে। সেখানে মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার ব্যাপারে অ-সমতা কিংবা দুর্ব্যবস্থা নেই, অধিকন্তু শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা থাকার ফলে সে দেশের মানুষ সর্বরকম বিয়য়ের সংগে সংগে শরীর-চর্চা ও কুস্তি-বিজ্ঞানেও অভাবনীয়রকম অগ্রগতির প্রমাণ দিয়ে চলেছে। একথা সকলেই জেনেছেন যে, ১৯৫২ অব্দে হেলসিংকি অলিম্পিকে রাশিয়ান মল্লরা 'গ্রীকো-রোমান' এবং 'ফ্রী স্টাইল' অর্থাৎ 'ক্যাচ্চ-অ্যাজ ক্যাচ্চ-ক্যান্'—উভয় ধারার কুস্তিতে মোট ৫৭৪'৪০ পয়েন্ট পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। তাছাড়া, জিম্‌নাস্টিক্‌সের ক্ষেত্রে রাশিয়ার কী দুর্জয় উন্নতি ঘটেছে, তা-তো এদেশের বহু লোকই প্রত্যক্ষ করেছেন, যখন গত ফেব্রুয়ারি—এপ্রিল মাসে ছয় সপ্তাহের 'শুভেচ্ছা সফরে' এসে রাশিয়ার ৫টি তরুণ ও ৫টি তরুণী ব্যায়ামবিদ্ বম্বে, বাংলা, মাদ্রাজ প্রদেশে এবং দিল্লীতে

তাঁদের চমকপ্রদ জিম্‌নাস্টিক্‌স্‌ দেখিয়ে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সবাইকেই বিস্ময়াভিভূত করেছিলেন !

অবশ্য ইতিমধ্যে নয়া চীনের অভ্যুত্থান ঘটায় এবং পূর্ব ইওরোপে আরো কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হওয়ায় রাশিয়ার কিছু কিছু প্রতিদ্বন্দ্বীও দাঁড়িয়ে গেছে। আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হলে আমরাও নিশ্চয়ই সর্বক্ষেত্রে নয়া চীন, রাশিয়া এবং পূর্ব ইওরোপের ঐ সমস্ত দেশের সংগে পাল্লা দিতে পারতাম। কেননা জীবনের অগ্রগতির ক্ষেত্রে শোষণমুক্ত দেশের সংগে শোষিত দেশের মানুষ কখনো লড়তে পারেনা, এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা।

পরিশিষ্ট

অত্যন্ত সংকীর্ণ সময়ে অত্যাধিক ত্রস্ততায় পুস্তকের গোড়ার দিকে আলোচিত দুই একটি ঘটনার প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করা প্রয়োজন। অন্য রকম বিষয়ও দু একটি উল্লেখ করছি।

প্রথম অধ্যায় (জাগরণ)

২। **ভারতে প্রথম বিদেশী দিগ্বিজয়ী মল্লের পরাজয়।**—কৈলাস বাঘার সংগে ইরাণী পালোয়ানের লড়াই সম্পর্কিত বিবরণ পড়ে আমার এক বন্ধু, কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের ব্যায়াম-শিক্ষক শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রমোহন সেন, ঐ প্রসংগে রাজা জগতকিশোর আচার্য চৌধুরীর নামোল্লেখ করা হয়নি বলে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

ঠিকই। কৈলাস বাঘা জগতকিশোরের অত্যন্ত অন্তরংগ বন্ধু ছিলেন; এমন কি, ১৮৮২ থেকে ১৮৮৫ অব্দ পর্যন্ত তিনি বহু রকমে তাঁর প্রত্যক্ষ সাহায্য ও পেয়েছিলেন। ১৮৮৭, ১৩ই ফেব্রুয়ারির ঐ লড়াই সম্পর্কে জগতকিশোরের উৎসাহ ছিল অসীম এবং লড়াইর বেশীর ভাগ বন্দোবস্তই তাঁর দ্বারা হয়েছিল। তাছাড়া লড়াইর সময়ও তিনি উপস্থিত ছিলেন।

৩। **টম্ ক্যাননের ভারত সফর।**—বইটির শেষ ফর্মা ছাপা হবার সময়ে গত ২৩এ মে তারিখে বিশ্ববিজয়ী মল্ল শ্রদ্ধেয় গোবর বাবুর সংগে টম্ ক্যানন সম্পর্কে আমার সামান্য আলাপ হয়। তিনি বল্লেন যে, আমি ভুল সংবাদ পরিবেশন করছি। তিনি অত্যন্ত

জোরের সংগে বললেন যে, ক্যানন নিশ্চয়ই কলিকাতা এসেছিলেন এবং করিম বখ্‌শের কাছে হেরেওছিলেন। আমি এ-কথার সমর্থনে কি প্রমাণ আছে, জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন যে, তাঁর জ্যেঠা মহাশয় প্রসিদ্ধ মল্ল ক্ষেত্রচরণ গুহ এবং তাঁর নিজের কুস্তি শিক্ষদাতা নিত্যলাল রায় সেই কুস্তি দেখেছিলেন। তিনি আণ্টন্ পীড়ির বিবরণকে 'মিথ্যা উক্তি' পর্যন্ত বলেছেন এবং তিনি আমাকে তাঁর এই কথাগুলি আমার পুস্তকে উল্লেখ করতেও বলেছেন।

বলা বাহুল্য, আমি গোবর বাবুকে খুবই শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম করি। অতএব তাঁর মতামতকে আমি বিনা বাক্য ব্যয়ে পুস্তকের পরিশিষ্টে উল্লেখ করলাম। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ এই সম্পর্কে যথাযথ আলোকপাত করতে পারলে ভবিষ্যতে সকলেরই উপকার হ'তে পারে। কেননা জ্ঞানত কারুই কখনো অসত্যকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

৪। **'পাঞ্জা-বীর' বোস ঠাকুর**।—এই অংশে একটি ভুল হয়ে গেছে। দু তিন হাজার বছর পূর্বে গ্রীস দেশে প্রচলিত 'সমান্তরাল কুস্তি' পাঞ্জা-যুদ্ধের মতো ছিল না। 'পাঞ্জা-যুদ্ধ' স্বতন্ত্র রকমেরই ছিল এবং তা-ও তখন 'কুস্তি' নামেই চল্‌ত। সিসিয়নের লোস্ট্রাটাস্ এবং মেশিনার লিয়নটাস্ এই যুদ্ধে গ্রীস দেশে তখন শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায় (শীর্ষস্থানাধিকার)

২২। **ব্যায়াম-বীর রামমূর্তি**।—১৯৫৬ অব্দের ১৫ই এপ্রিল 'যুগান্তর সাময়িকী'তে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধ 'বাংলাদেশে রামমূর্তির পরাজয়' সম্পর্কে গোবর বাবু অভিযোগ করেছিলেন যে,

রামমূর্তির বিলাতের ঘটনা নিয়ে আমার ও-রকম লেখা ঠিক হয়নি। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থেও যে আমি রামমূর্তির বিলাতের ঘটনা উল্লেখ করেছি, সেকথা তাঁর তখনো জানা ছিল না। আমি তাঁকে সেই কথা বললাম। তিনি বললেন যে, সমগ্র এশিয়ায় রামমূর্তির চেয়ে বড় 'শো-ম্যান্' আর কেউ জন্মাননি এবং লণ্ডন প্যালাডিয়ামে যখন তিনি 'প্রথম শো' দেন, তখন কন্টিনেণ্টের বাঘা বাঘা যতো জোয়ান ছিলেন, সবাই তা দেখে 'থ' হ'য়ে গিয়েছিলেন!

আমি নিজেও এই কথা অস্বীকার করিনি ; বরং 'যুগান্তরে' পরিস্কার বলেছিলাম—"বিলাতের মতো জায়গায়ও 'প্রিন্স' রামমূর্তি 'শক্তির বিস্ময়' নামে গোড়ার দিকে আসর জমিয়েছিলেন।" এই বইতেও সে-কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

গোবর বাবু আরো বলেছেন যে, বিলাতের একটি 'শো'তে হাতী নেবার সময় হঠাৎ 'চোট' পেয়ে রামমূর্তি হাঁসপাতালে যেতে বাধ্য হন। তা নইলে তিনি বিলাতী জোয়ানদের আরো স্তম্ভিত করতে পারতেন।

এই প্রসংগে আমার কথা এই যে, রামমূর্তির সৌভাগ্যক্রমেই তিনি 'চোট' পেয়েছিলেন এবং এমন চোট তিনি পাননি যার জন্য তাঁকে দুমাস কাল হাঁসপাতালে থাকতে হয়েছিল। আমি বলতে চাই যে, হাঁসপাতালে তিনি ছিলেন বলেই তাঁর মান তবু কিছুটা রক্ষা পেয়েছিল। তা নইলে আমার বিশ্বাস, আরো 'চ্যালেঞ্জ' তাঁর বিরুদ্ধে আসত এবং ফ্রান্সের আপোলো, জার্মানির আর্থার সাক্সন, বিলাতের টমাস ইঞ্চ ইত্যাদির কাছে তাঁকে নিশ্চয়ই সাংঘাতিকভাবে অপমানিত হতে হত।

এই বইখানা কুস্তির শুধু একটি বিশেষ দিক সম্পর্কেই লেখা। অতএব রামমূর্তির কথা প্রসংগক্রমে বলা হয়েছে মাত্র। আমার পরবর্তী কোনো বইতে এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা যেতে পারে।

গোবর বাবু আর একটি কথাও বলেছেন যে, আমার লেখা এই ধরনের একটি মূল্যবান পুস্তকে প্রসিদ্ধ মল্লদের কথা আলোচনা করতে করতে সময়ে সময়ে আমি বাজে কুস্তিগীরদের কথাও কেন উল্লেখ করেছি, যাঁরা যথার্থভাবে 'মল্ল' নামেরও উপযুক্ত ছিলেন না!

বলাই বাহুল্য, এই বইখানা ইতিহাসমূলক। অতএব, ঘটনাগুলিকে আমি শুধু সময়ানুক্রমিকভাবে সাজিয়ে দিয়েছি; সেইসব পালোয়ানদের মধ্যে কে বড়, কে ছোট সেই কথা বলা আমার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। এই জন্যই ঘটনার গতিপথে অনেক সাধারণ ব্যক্তির নামও উল্লেখিত হয়েছে,— যেমন গ্রুপ ফটোতে বড় বড় লোকের সংগে অনেক সময় বাজে লোকের মূর্তিও উঁকি দিয়ে থাকে।

চতুর্থ অধ্যায় (বিপর্যয়)

৩৭। ক্রেমারের ভারত অভিযান।—১২১ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের ৬ষ্ঠ লাইনে 'পরের পরের' জায়গায় 'পরের বছর' পড়তে হবে।

৪৪। কোসিসের পরাজয়।—১২৯ পৃষ্ঠায় নীচে থেকে দ্বিতীয় লাইনে 'না' শব্দটির জায়গায় 'যা' পড়তে হবে।

পঞ্চম অধ্যায় (পরাজয়)

৬৪। কেলেংকারির এক শেষ।—২১০ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের ৩য় লাইনে 'অবসান' এর পরিবর্তে 'সত্যতা প্রমাণিত' পড়তে হবে।

অন্যান্য মুদ্রাকর প্রমাদ অর্থের ব্যতিক্রম ঘটায়নি ব'লে সেগুলির উল্লেখ করলাম না।

সমর বোস

২৫এ মে, ১৯৫৬

=প্রকাশ প্রতীক্ষায়=

সমর বোসের

:)(: পরবর্তী বই :)(:

১। কুস্তির ইতিহাস

কুস্তির উৎপত্তি থেকে বর্তমান পরিণতি পর্যন্ত পৃথিবীর নানা দেশে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের কুস্তির বৈচিত্র্যপূর্ণ সচিত্র ইতিহাস। ভারতীয় বা ইংরেজি ভাষায় আজো এ ধরনের বই প্রকাশিত হয়নি।

২। ব্যায়ামে বিস্ময়

ব্যায়াম ও শক্তি-জগতের স্বভাবত অবিশ্বাস্য, অথচ চমকপ্রদ, বিস্ময়কর ও চিত্তাকর্ষক নানা ধরণের অসংখ্য অদ্ভুত অদ্ভুত বাস্তব ঘটনার চুম্বক তালিকা। পৃথিবীতে এরূপ বই আজো ছাপা হয়নি।

৩। শক্তির পরীক্ষা

দৈহিক শক্তির কেন্দ্র কি কি, কি কি ধরনের শক্তির কাজ কোন্ কোন্ কেন্দ্রপ্রধান, এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বলীরা তাঁদের শক্তির শেষ পরীক্ষা কিভাবে কতদূর পর্যন্ত দিয়েছেন, তার সচিত্র 'কীর্তি' (Record) আলোচনা। ভারতবর্ষে এরূপ বই এই প্রথম।

৪। শক্তির খেলা

দেশী ও বিদেশী, পেশাদার ও অপেশাদার—সুপ্রসিদ্ধ শক্তিবীর ও 'শো-ম্যান্দের' প্রদর্শিত বহুবিধ জমকালো ও চমকপ্রদ শক্তির কাজ ও খেলার চিত্তাকর্ষক সচিত্র বিবরণ। ভারতে এরূপ বই এই প্রথম।

৫। বাংলায় শরীর-চর্চার ইতিহাস

ছোট-বড়ো সকল বয়সের পাঠকদের উপযোগী ক'রে লেখা স্মরণাতীত যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বাংলার সামাজিক অবস্থানুযায়ী বিভিন্ন সময়ে প্রচলিত নানা ধরনের শরীর-চর্চা ও তার ক্রম-পরিণতির সংক্ষিপ্ত সচিত্র ইতিহাস। বাংলাদেশে এরূপ বই এই প্রথম।

৬। বাংলার বিস্মৃত বলী

সপ্তম শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলার প্রসিদ্ধ বলীদের প্রবাদবর্জিত সংক্ষিপ্ত ও সচিত্র ঐতাহাসিক পরিচয়। বাংলাদেশে এরূপ বই এই প্রথম।

৭। বাংলার ব্যায়ামী

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বাংলার লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যায়ামীদের বৃহত্তম সচিত্র জীবনী-সংগ্রহ।

৮। ভারতীয় মল্ল-মিছিল

শতাব্দীকালের মধ্যে অভ্যুত্থিত ভারতবর্ষের অবিস্মরনীয়, শ্রেষ্ঠ ও দক্ষ মল্লবীরদের সংক্ষিপ্ত সচিত্র জীবন পরিচয়।

৯। 'স্বাধীন' ভারতে

সাময়িক ঘটনা ও পরিস্থিতির ওপর রাজনৈতিক দৃষ্টি-ভংগীতে লেখা নিজস্ব মতামতবর্জিত ছোট ছোট রস-রচনা ও কবিতার সমাবেশ।

১০। ঈশ্বর

বিশ্বাসী আর অবিশ্বাসী—সকল শ্রেণীর মানুষকে ভাবিয়ে তুলবার মতো স্বাধীন চিন্তার বলিষ্ঠ ভাষায় রচিত কবিতা পুস্তিকা।